হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা

আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস

৩৫২/৪৩

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন ঃ
একটি তুলনামূলক আলোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

১২।২০০০
গবেষক

আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
ডিসেম্বর, ২০০০

পরীক্ষার রোল নং ০১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম. ফিল.
নিবন্ধন নং ১৪১
শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৫-৯৬

১২/১২/২০০০
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ কাজী নূরুল ইসলাম
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স
প্রাক্তন প্রফেসর, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382745

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করতেছি যে, অত্র অভিসন্দর্ভে যে সব পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি তা অধ্যায় শেষে তথ্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছি । নির্দেশিত অংশ ব্যতীত বাকী অংশ গবেষকের নিজের । এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের এম. ফিল. বা পি. এইচ. ডি. বা উচ্চতর কোন ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি ।

তত্ত্বাবধায়ক

১২/১২/২০০০

ডঃ কাজী নূরুল ইসলাম
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
প্রাক্তন প্রফেসর, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১২/১২/২০০০

আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস
এম. ফিল. গবেষক
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

২৪২৭৪৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা-কর্মের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক এবং ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্সের বর্তমান চেয়ারম্যান ডঃ কাজী নূরুল ইসলামের নিকট সর্বান্তকরণে ঋণ স্বীকার করছি। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ নির্দেশনা এবং আন্তরিক তত্ত্বাবধানের ফলে এই অভিসন্দর্ভ রচনা সম্ভব হয়েছে। কেবল গবেষণার জন্যই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়নে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্যও আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। দর্শন বিভাগের প্রফেসর আজিজুন্নাহার ইসলাম তুলনামূলক ধর্ম অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং পাণ্ডুলিপি দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন আমি তাঁর নিকটও কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বছরের এম. ফিল. কোর্সের প্রথম বর্ষে বিভাগীয় পাঠ্যসূচী অনুযায়ী অধ্যয়ন করতে হয়। তাই আমাকে প্রথম বর্ষে দুইটি কোর্সের অধীনে পাঁচটি টেক্সট বই পড়তে হয়েছে। এই টেক্সটগুলো পড়িয়েছেন বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর ডঃ নীরু কুমার চাকমা, ডঃ কাজী নূরুল ইসলাম, ডঃ কাওসার মুস্তাফা এবং ডঃ এ কে এম সালাহ উদ্দীন। তাঁরা প্রত্যেকে নির্ধারিত টেক্সট বইয়ের প্রতিটা অধ্যায় (অনেক সময় অতিরিক্ত সময় নিয়েও) আমাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সে সুবাদে আমি ভালভাবে প্রথম বর্ষে উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার সুযোগ পেয়েছি। এতদ্ব্যতীত তাঁরা আমার গবেষণা কর্মে বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়েছেন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের জন্য আমি বিভিন্ন জনের নিকট থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য পেয়েছি। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস ডঃ সিরাজুল হক এবং পূর্ব গুদিঘাটা কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের নিকট থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমি তাঁদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যাপক কাজলেন্দু দে এবং সুভাষ চন্দ্র দাস বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। একই কলেজের অধ্যাপক খন্দকার জহিরুল হক তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়ে পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

দর্শন বিভাগের প্রবীন এবং খ্যাতনামা প্রফেসর ডঃ আবদুল মতীন এবং ডঃ আমিনুল ইসলামের লেখা, বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত পরামর্শ ও নির্দেশনা আমাকে এই গবেষণা কর্মে উৎসাহ যুগিয়েছে। প্রফেসর আমিনুল ইসলামের মানবতাবাদী, প্রয়োগিক ও বাস্তবমুখী দর্শন রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করছি। এই সুযোগে আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিভাগের চেয়ারম্যান মিসেস আয়েশা সুলতানা গবেষণা-কর্মের প্রতিনিয়ত খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, সযত্নে টাইপ করার জন্য জনাব মোঃ আখতার ফারুককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
ডিসেম্বর, ২০০০

আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিন্যাস

		পৃষ্ঠাঙ্ক
ঘোষণা পত্র		তিন
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		চার
প্রথম অধ্যায়		
ভূমিকা ঃ বর্তমান অভিসন্দর্ভের গুরুত্ব ও তাৎপর্য		১-৯
তথ্য নির্দেশিকা		৯
দ্বিতীয় অধ্যায়		
হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য		১১-৪৭
পার্থিব জগৎ সম্পর্কে হিন্দু ধর্ম		১২-২৭
১।	জগতের সৃষ্টি	১২-১৫
১ঃ১।	বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব	১২
১ঃ২।	উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্ব	১৩
১ঃ৩।	পুরাণ, মহাভারত ও গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব	১৪
১ঃ৪।	হিন্দু ষড় দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব	১৫
২।	জগতের প্রকৃতি	১৫-২৩
২ঃ১।	জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে বেদ	১৫
২ঃ২।	জগতের প্রকৃতি সম্পকে উপনিষদ	১৬
২ঃ৩।	জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে গীতা	১৭

Dhaka University Institutional Repository

২ঃ৪ ।	জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে হিন্দু ষড় দর্শন	১৮-২৩
২ঃ৪ঃ১ ।	ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন	১৮
২ঃ৪ঃ২ ।	সাংখ্য দর্শন	১৮
২ঃ৪ঃ৩ ।	মীমাংসা দর্শন	১৯
২ঃ৪ঃ৪ ।	বেদান্ত দর্শন	১৯
৩ ।	জগতের প্রলয়	২৩-২৭
৩ঃ১ ।	চারিটি যুগ	২৩-২৬
৩ঃ২ ।	সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ	২৫
৩ঃ৩ ।	মহাযুগ ও কল্প	২৫
	ছকে চারটি যুগ	২৬
৩ঃ৪ ।	লয়, প্রলয় ও মহাপ্রলয়	২৭
পার্থিব জগৎ সম্পর্কে ইসলাম		২৭-৩৮
৪।	জগতের সৃষ্টি	২৮-৩১
৪ঃ১ ।	কুরআন ও হাদীসে সৃষ্টিতত্ত্ব	২৮
৪ঃ২ ।	মুসলিম দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব	৩০
৫ ।	জগতের প্রকৃতি	৩১-৩৬
৫ঃ১ ।	জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআন	৩১
৫ঃ২ ।	মুসলিম দর্শনে জগতের প্রকৃতি	৩৪
৬ ।	কিয়ামত (মহাপ্রলয়)	৩৬-৩৮
৭ ।	হিন্দু ধর্মে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য	৩৮
✓৮ ।	ইসলামে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য	৪০
	তথ্য নির্দেশিকা	৪২-৪৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন ৪৯-১১৮

মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু ধর্ম ৫১-৮৩

১। মানব জীবনের তাৎপর্য ৫২

২। মৃত্যুর তাৎপর্য ৫৫

৩। মানুষের সারসত্তা ৫৭-৬৫

৩ঃ১। আত্মার স্বরূপ ৫৭

ব্যবহারিক আত্মা ৫৯

৩ঃ১ঃ১। দৈহিক বৈশিষ্ট্য ৫৯

৩ঃ১ঃ২। মানসিক বৈশিষ্ট্য ৫৯

৩ঃ১ঃ৩। নৈতিক বৈশিষ্ট্য ৬০

৩ঃ২। বিশুদ্ধ আত্মা ৬০

৩ঃ৩ঃ১। উপনিষদে ব্রহ্ম অর্থে ৬১

৩ঃ৩ঃ২। উপনিষদে জীবাত্মা অর্থে ৬১

৩ঃ৪। ষড় দর্শনে আত্মা ৬৩

৩ঃ৫। জৈনধর্মে আত্মা ৬৪

৩ঃ৬। আত্মা সম্পর্কে বৌদ্ধ মত ৬৪

৪। আত্মার অমরত্ব ৬৬

৫। মরণোত্তর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ৬৮-৮৩

৫ঃ১। মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায় ৬৮

৫ঃ২। পুনর্জন্মবাদ ৭০

৫ঃ২ঃ১। কর্মবাদ ৭৪

৫ঃ২ঃ২। পুনর্জন্মবাদের বিচার ৭৭

৫ঃ২ঃ৩। কর্মবাদের মূল্য ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৫ঃ৩ ।	স্বর্গ ও নরক	৮০
৫ঃ৪ ।	ব্রহ্মের সাথে একীভূত হওয়া	৮১
মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে ইসলাম		৮৪-১১২
৬ ।	মানব জীবনের তাৎপর্য	৮৪
৭ ।	মৃত্যুর তাৎপর্য	৮৭
৮ ।	মানুষের সারসত্তা	৮৮-৯২
৮ঃ১ ।	আত্মার স্বরূপ	৮৮
৮ঃ১ঃ১ ।	কুরআনে নফস শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার	৮৯
৮ঃ১ঃ২ ।	নফসের তিনটি বৈশিষ্ট্য	৮৯
৮ঃ১ঃ৩ ।	কুরআনে রূহ শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার	৯১
৮ঃ১ঃ৪ ।	রূহ এবং নফস	৯১
৮ঃ১ঃ৫ ।	আত্মা বস্তুগত দ্রব্য না আধ্যাত্মিক দ্রব্য	৯২
৯ ।	আত্মার অমরত্ব	৯৩
১০ ।	মরণোত্তর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা	৯৩-১১২
১০ঃ১ ।	আত্মা কোথায় যায়	৯৩
১০ঃ২ ।	কবরে শান্তি বা শাস্তি	৯৫
১০ঃ৩ ।	কবরের সাথে রূহের সংশ্লিষ্টতা	৯৬
১০ঃ৪ ।	পুনরুত্থান	৯৭
১০ঃ৪ঃ১ ।	পুনরুত্থান দৈহিক কি না	৯৯
১০ঃ৫ ।	পাপ-পুণ্যের বিচার	১০৪
১০ঃ৬ ।	পুলসিরাত	১০৬
১০ঃ৭ ।	জান্নাত ও জাহান্নাম	১০৬-১০৯
১০ঃ৭ঃ১ ।	জান্নাত	১০৬
১০ঃ৭ঃ২ ।	জাহান্নাম	১০৭
১০ঃ৭ঃ৩ ।	জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে অস্তিত্বশীল কি না	১০৮

Dhaka University Institutional Repository

১০ঃ৮ । আল্লাহর সাথে মিলন ১০৯
তথ্য নির্দেশিকা ১১২-১১৮

চতুর্থ অধ্যায়

মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী মতের তুলনা ও বিচারমূলক পর্যালোচনা ১২০-১৪৩

১ । পার্থিব জগৎ প্রসঙ্গে ১২০
২ । জীবনের তাৎপর্য প্রসঙ্গে ১২২
৩ । মৃত্যুর তাৎপর্য প্রসঙ্গে ১২৪
৪ । মানুষের সারসত্তা প্রসঙ্গে ১২৫
৪ঃ১ । আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে ১২৬
৫ । আত্মার অমরত্ব প্রসঙ্গে ১২৯
৬ । মরণোত্তর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা প্রসঙ্গে ১৩২-১৪০
৬ ঃ১ । আত্মা কোথায় যায় প্রসঙ্গে ১৩৩
৬ ঃ২ । কবরে শান্তি বা শাস্তি প্রসঙ্গে ১৩৪
৬ ঃ৩ । পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থান প্রসঙ্গে ১৩৪
৬ ঃ৪ । স্বর্গ ও নরক প্রসঙ্গে ১৩৬
৬ ঃ৫ । পরমাত্মার সাথে মিলন প্রসঙ্গে ১৩৮
৭ । এক নজরে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মরণোত্তর জীবন ১৪০
তথ্য নির্দেশিকা ১৪১-১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার ঃ ১৪৫-১৫৯

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন ; এর প্রায়োগিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ১৪৫-১৫৮

তথ্য নির্দেশিকা ১৫৮-১৫৯

গ্রন্থ পঞ্জী ১৬১-১৬৮

মৌলিক উৎস ১৬১-১৬২

গৌণ উৎস ১৬২-১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ বর্তমান অভিসন্দর্ভের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ বর্তমান অভিসন্দর্ভের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ধর্ম মানব জীবনের মতোই প্রাচীন । মানুষ যখন থেকে তার কর্তব্য সম্পর্কে ভাবতে শিখেছে, ঔচিত্য-অনৌচিত্য, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ যখন থেকে ভেবেছে তখন থেকেই বোধ হয় মানুষের মধ্যে ধর্ম দেখা দিয়েছে । হতাশা, দুঃখ, ভয়ে মানুষ আশ্রয় খুঁজেছে ধর্মের মধ্যে । পরমাত্মাব আরাধনা করে মানুষ তৃপ্তি পেয়েছে । পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করে মানুষ সান্ত্বনা পেয়েছে । এভাবে ধর্ম ও পরমাত্মায় বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ দিশা পেয়েছে । এবং ধর্ম হয়ে উঠেছে মানব জীবনের বিধান । যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও সমাজের মধ্যে যখন অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, অসততা ইত্যাদি দেখা দিয়েছে তখন সে জাতি বা সমাজে ধর্ম প্রবর্তক বা প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছে । প্রবর্তক ও প্রচারকেরা মানব জাতিকে ধর্মের দিকে, ন্যায়ের দিকে আহবান করেছেন, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন । মানুষেব সামনে উপস্থাপন করেছেন একটি জীবন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি । এই জীবন ব্যবস্থা অনুসারে ধার্মিক জীবন পরিচালনা করে আসছে । ধর্মীয় মূল্যবোধ, আদর্শ, নিয়ম-নীতি তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে ।

ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহের মধ্যে মরণোত্তর জীবনের বিশ্বাস অন্যতম । অবশ্য মরণোত্তর জীবনের প্রকৃতি, অবস্থা, পরিণতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসে পার্থক্য রয়েছে । যাই হোক, মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাস ধার্মিকেব গোটা পার্থিব জীবনে পরিচালকের ভূমিকা পালন করে । মরণোত্তর জীবনকে লক্ষ করে ধার্মিক তার পার্থিব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে । মরণোত্তর জীবনে তার পরিণতি কী হবে — এ ভাবনা তাকে পেয়ে বসে । মরণোত্তর জীবনে মানুষের জন্য রয়েছে শুভ অথবা অশুভ পরিণতি । পরমাত্মাব আনুগত্য, আরাধনা, আচার-অনুষ্ঠান পালন, সৎকর্মের সাধনা, এক কথায় পরামাত্মার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হলে মরণোত্তর জীবনে শুভ পরিণতি ঘটে । অন্যথায় অশুভ পরিণতির শিকার হতে হয় । তাই ধার্মিক সর্বদা চেষ্টা করে যাতে শুভ পরিণতি লাভ করা যায় । এ জন্য ধার্মিক স্বীয় কামনা-বাসনা লোভ-লালসা, মোহ, ধনাসক্তিকে, নিয়ন্ত্রণ করে । যশ-খ্যাতি ও ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করে । সে

Dhaka University Institutional Repository

সংযত, শৃংখলিত ও নিয়মনিষ্ঠ পার্থিব জীবন-যাপন করে । সর্বদা সে আত্মশুদ্ধির সাধনায় নিয়োজিত থাকে । আত্মশুদ্ধির মধ্যেই তার ইহ-জাগতিক ও পরজাগতিক সুখ-শান্তি ও সার্থকতা নিহিত ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মরণোত্তর জীবনকে প্রকৃত জীবন বলা যায় কি-না । অনেকেই মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাস করে না । এদের মধ্যে প্রকৃতিবাদী ও জড়বাদীরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাঁরা মনে করেন মানবের মধ্যে জড়াতিরিক্ত কোন সত্তা নেই । আত্মা বলে কোন সত্তা মানবের মধ্যে নেই, যা তার মৃত্যুর পর অমর থাকে এবং মরণোত্তর জীবন মোকাবিলা করে । মৃত্যুতে মানুষ বিনাশ হয়ে যায় । তাঁরা এ কথা বলেন যে, মানুষ মস্তিষ্কের ক্রিয়াবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । এবং মস্তিষ্ক জড় নিয়মের অধীন । এক কথায় মানুষ ভৌত-রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয় । মানব দেহে ভৌত-রাসায়নিক ক্রিয়া যখন ব্যর্থ হয় তখনই মানুষের মৃত্যু ঘটে । প্রকৃতিবাদ ও জড়বাদ মানুষকে যন্ত্রবৎ মনে করে । কিন্তু মানুষ যন্ত্রবৎ নয় । যন্ত্র থেকে মানুষের নানা দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে । যন্ত্র পরিচালিত হয় বাইরের শক্তি দ্বারা । তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বশাসনের ক্ষমতা নেই । কিন্তু মানুষ পরিচালিত হয় অন্তস্থ শক্তি দ্বারা । তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বশাসনের ক্ষমতা আছে । মানুষকে ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উন্নততর সংগঠন বললেই তার সকল গুণ ও ক্ষমতার ব্যাখ্যা দেয়া হয় না । মানুষের রয়েছে স্বাধীনতা, নান্দনিক বোধ, মূল্যবোধ ও আদর্শ । তার কল্পনাশক্তি তীক্ষ্ম, মেধাশক্তি প্রখর । তাই মানুষের মধ্যে ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে কোন সত্তা রয়েছে । ধর্মতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা এ সত্তাকে আত্মা বলে অভিহিত করেছে । এ আত্মা মৃত্যুতে ধ্বংস হয় না । এ আত্মা মরণোত্তর জীবনে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয় । এ আত্মা মরণোত্তর জীবনে সুখ বা দুঃখ, শান্তি বা শাস্তি ভোগ করে, এ আত্মা স্বর্গ বা নরকে গমন করে । যেহেতু মৃত্যুর পর সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনার উপলব্ধি-উপভোগ আছে, সেহেতু ধর্ম একে জীবন বলে অভিহিত করে । অবশ্য পার্থিব জীবনের সাথে মরণোত্তর জীবনের পার্থক্য আছে । পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী, মরণোত্তর জীবন স্থায়ী । পার্থিব জীবন হচ্ছে কর্মক্ষেত্র আর মরণোত্তর জীবন হচ্ছে কর্ম ফলভোগের ক্ষেত্র । পার্থিব জীবনে মানুষের নৈতিক দায়-দায়িত্ব আছে কিন্তু মরণোত্তর জীবনে সাংসারিক ও সামাজিক দায়িত্বের বিষয় নেই । সেখানে কেবল পার্থিব জীবনের কর্মের জন্য মানুষ সুখ-শান্তি বা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে । কিন্তু পর্যবেক্ষণ ও পদার্থিক মানদণ্ডে মরণোত্তর জীবনকে প্রতিপাদন করা যায় না । আর এ কারণেই জড়বাদী ও প্রকৃতিবাদীরা মরণোত্তর জীবনকে অস্বীকার করেন । পক্ষান্তরে, ধর্ম হচ্ছে মূলত বিশ্বাসের বিষয় । ধর্ম মরণোত্তর জীবন ও তার বিভিন্ন অবস্থায় বিশ্বাস করে । এ বিশ্বাসই তার পার্থিব জীবনের নৈতিক ও ধর্মীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে, তার জীবন ও জগৎ দৃষ্টিকে নির্মাণ করে ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম একটি জীবন ব্যবস্থা (code of life), একটি জীবন দর্শন। ধর্ম জগৎ-জীবনের ব্যাখ্যা দেয়। মানুষকে কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ নির্দেশ করে, নৈতিকতার পথ দেখায়। আত্ম-পরিশুদ্ধির সাধনা বাতলে দেয়। সকল ধর্ম কতিপয় সার্বিক সত্য, আদর্শ, মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়। সকল ধর্মই বিনয়, নম্রতা, পরার্থপরতা, সহানুভূতি ইত্যাদি অর্জন এবং হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা ইত্যাদি বর্জন করতে শেখায়। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ, শাসক ধর্মকে হীন-স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করে আসছে। এরা ধর্মীয় নীতি, আদর্শ, শিক্ষার অপব্যাখ্যা দেয় ধর্মের মুখোশ পরে, ভ্রান্ত সাধনার পথ নির্দেশ করে ধর্ম-গুরু হয়ে। শাসক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অজস্র নজির রয়েছে ধর্মকে অত্যাচার ও নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার। লক্ষ করা গেছে জ্ঞান-চর্চা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে কঠোর হাতে দমনের প্রয়াস। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চার্চ কর্তৃক গ্যালিলিওর বিচার ব্যবস্থার উল্লেখ করা যায়।[১] একইভাবে, তথাকথিত মুসলিমদের দ্বারা ইসলামকে বিকৃত করার অসংখ্য নজিরও পাওয়া যায়। যেমন, উমাইয়াদের বংশসম্ভূত ইয়াজিদের অথবা উমাইয়াদের তথাকথিত খলিফা ওয়ালিদের, এবং পরবর্তীকালে আরো অনেক রাষ্ট্র নায়কের নানাবিধ কর্ম অমুসলিমদের কাজ কর্ম থেকেও অধিকতর নিন্দনীয়।[২] ধর্ম অতীন্দ্রিয় সত্তা ও বিধি নিষেধে বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের বিচার-বিবেকসম্মত প্রতিপালন, অনুকরণ, অনুশাসন মানব জীবনকে নৈতিক, সুশৃঙ্খল, উদার, সাম্য ও মানবতাবাদী করে তুলতে পারে। কিন্তু এর অন্ধ অনুকরণ মানবতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। স্বীয় ও অন্য ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা, অন্ধতা, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা পারস্পরিক বিরোধ ও শত্রুতার অন্যতম কারণ। বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের মধ্যে সমঝোতা, ঐক্য, সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও মমত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ সমাজ ও জীবন-যাপন সম্ভব নয়। তাই সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ও জীবনের জন্য ধর্মের তুলনা ও বিচারমূলক অধ্যয়ন প্রয়োজন। ধর্মের তুলনা ও বিচারমূলক অধ্যয়নের ফলে পারস্পরিক বিশ্বাস ও ধর্মানুসারীদের মধ্যে অন্ধতা ও সংকীর্ণতার প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে সম্প্রীতি, সহানুভূতি এবং অপরকে আপন করে নেয়ার উপলব্ধি সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই সমঝোতা ও মমত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস, শিক্ষা, আদর্শ ও নীতির তুলনা ও বিচারমূলক আলোচনা প্রভূত ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে দু'টি ধর্ম, যথা — হিন্দু ও ইসলামের মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে সম্ভবত হিন্দুধর্ম সবচেয়ে প্রাচীন। এর উদ্ভবের নির্দিষ্ট কোন সন-তারিখ নেই। অনন্ত কাল ধরে এ ধর্ম চলে আসছে। তাই এ ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলে অভিহিত করা হয়। এ ধর্মের নির্দিষ্ট কোন

Dhaka University Institutional Repository

প্রবর্তক নেই। এর শিক্ষা প্রচারের জন্য আদি কোন নেতা নেই, যাকে জরথুস্ট্র, ঈসা বা মুহাম্মদ (সঃ) প্রমুখের সাথে তুলনা করা যায়।[৩] সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনের সাথে সাথে হিন্দুধর্মও ক্রমবর্ধিত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির দ্বারা এ ধর্ম প্রভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন সাধক ও দ্রষ্টা এ ধর্মের শিক্ষা, আদর্শ ও নীতি গঠনে অবদান রেখেছেন। এ কারণেই হয়তো হিন্দুধর্ম বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এ ধর্মে রয়েছে বহুঈশ্বরবাদী, একেশ্বরবাদী, নাস্তিক প্রমুখের সমাবেশ। হিন্দুদের মধ্যে একক গ্রন্থও অনুসৃত হয় না। হিন্দুধর্মে রয়েছে একাধিক পবিত্র গ্রন্থ। এ সবের মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্র, রামায়ন, মহাভারত, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে আরেকটি প্রধান ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। হিন্দুধর্ম থেকে ইসলামের অনেক দিক থেকেই পার্থক্য রয়েছে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে ইসলামের সূচনা হয়। এর প্রচারক হচ্ছেন মুহাম্মদ (সঃ)। তিনি আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি এবং আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী।[৪] ইসলামের মূলনীতি, শিক্ষা, আদর্শ আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। এ অবতীর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে আল কুরআন। আল কুরআন মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ। মুহাম্মাদ (সঃ) এর হাদীসও মুসলিমদের নিকট অনুকরণীয় শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়।

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের মধ্যে মরণোত্তর জীবন অন্যতম। জৈন, শিখ, জরথুস্ট্র, ইহুদি এবং খ্রিস্ট ধর্মেও মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাস রয়েছে। দর্শনেও মরণোত্তর জীবন এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়াবলী গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়ে আসছে। পার্থিব জগৎ-জীবনের সাথে মরণোত্তর জগৎ-জীবনের অনেক বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন — পার্থিব জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা রয়েছে। মরণোত্তর জীবনেও সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা রয়েছে। আবার পার্থিব জগৎ-জীবনের সাথে মরণোত্তর জীবনের অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। পাথিব জীবন শিশু অবস্থা থেকে বার্ধক্যে গিয়ে শেষ হয়। এখানে ভ্রূণ, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি ক্রম পরিবর্তন আছে। কিন্তু মরণোত্তর জীবনে শৈশব, কৈশোর, বাধক্য ইত্যাদি ক্রম পরিবর্তন নেই। পার্থিব জীবনে মানুষ ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে, সাধনা করে আর মরণোত্তর জীবনে এর ফল ভোগ করে।[৫] অবশ্য হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। হিন্দুধর্মে একই জীবনকে পার্থিব ও মরণোত্তর জীবন মনে করা হয়। মোক্ষ অর্জন ব্যতীত কারো মৃত্যু হলে সে পুনরায় আবার জন্ম গ্রহণ করে এ পৃথিবীতে ফিরে আসে।[৬] পৃথিবীতে ফিরে এসে সে পূর্ব-জীবনেব কর্মের ফল ভোগ করে। পূর্ব-জীবনের কর্ম অনুযায়ী সে বিভিন্ন মানবেতর প্রাণী বা কীট পতঙ্গ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করে।[৭] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এই পার্থিব জীবন একজন হিন্দুর নিকট তার মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, যেখানে

Dhaka University Institutional Repository

সে পূর্বের জীবনের কর্মের জন্য সুখ, সম্মান, স্বাচ্ছন্দ্য বা দুঃখ-কষ্ট, বেদনা ও মানবেতর জীবন যাপন করে। একই সময়ে সে পার্থিব কষ্ট, শ্রম, সংগ্রাম, সাংসারিক, সামাজিক ও নৈতিক দায়-দায়িত্বের মধ্যে জীবন যাপন করে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে এ রকম একই সময়ে দুই জীবনের সমন্বয় নেই। ইসলাম অনুসারে মরণোত্তর জীবন সম্পূর্ণরূপে অতীন্দ্রিয়। মরণোত্তর জীবনে যে প্রবেশ করবে সে এ ধরায় আর ফিরে আসবে না। সেখানে সে অনন্তকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে।[৮] এভাবে মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী বিশ্বাস ও ধারণার মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য রয়েছে। আবার অনেক বিষয়ে এদের বিশ্বাস ও ধারণার মধ্যে সাদৃশ্যও রয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে উভয় ধর্মের বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্যের বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এদের বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্যের বিষয়ে তুলনা করা হয়েছে। দু'টা ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে ঐক্য, নৈকট্য বিদ্যমান থাকে। কখনো এ নৈকট্য প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। আবার কখনো এ নৈকট্য পরোক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন শার্ট এবং একজন পাঞ্জাবী পরিধান করে। শার্ট ও পাঞ্জাবীর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। পরিহিত দু'জনের মধ্যে রুচি-বোধেরও পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু শার্ট ও পাঞ্জাবী একই উদ্দেশ্য সাধন করে। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন পার্থক্যের মধ্যেও ঐক্য, সমঝোতা ও নৈকট্য রয়েছে। এ ঐক্য ও নৈকট্য উপলব্ধি করা বর্তমান অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের মূল অধ্যায়সমূহ হচ্ছে ঃ হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন, মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী মতের তুলনা ও বিচারমূলক পর্যালোচনা এবং উপসংহার ঃ হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন ; এর প্রায়োগিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব।

'হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে পার্থিব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী মত আলোচনা করা হয়েছে। মরণোত্তর জীবনের পূর্ব স্তর হচ্ছে পার্থিব জগৎ ও জীবন। পার্থিব জীবনের সাধনা ও কর্মানুশীলনের উপর মরণোত্তর জীবনের পরিণতি নির্ভর করে। আবার মরণোত্তর জীবনের বিশ্বাসের আলোকে ধার্মিক জন পার্থিব জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করে। তার পার্থিব সকল কাজ-কর্ম, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা মরণোত্তর জীবনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একজন ধার্মিকের পার্থিব জগৎ-জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মপদ্ধতি যেমন মরণোত্তর জীবনের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তেমনি মরণোত্তর পরিণতি পার্থিব কর্ম, জীবনাচরণ ও নৈতিক উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। নৈতিক উৎকর্ষের সাধনা করতে হয় পার্থিব জীবনে। মরণোত্তর

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে নৈতিক কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। সুতরাং পার্থিব জীবন হচ্ছে মরণোত্তর জীবন ও পরিণতির ভিত্তি। এ কারণে পার্থিব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। পার্থিব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। পার্থিব জগৎ সম্পর্কে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ এ পার্থিব জগতের উদ্ভব বা সৃষ্টি কী করে হল, দ্বিতীয়ত ঃ এ জগতের প্রকৃতি বা স্বরূপ কী, তৃতীয়ত ঃ এ জগতের পরিণতি কী। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ ও সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পার্থিব জগৎ সম্পর্কে উক্ত বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও উক্ত বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব, জগতের প্রকৃতি, প্রলয় ইত্যাদি শিরোনামে বিভিন্ন গ্রন্থ ও সম্প্রদায়ের মত এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই জগতে জীবনের অর্থ সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী মত এ অধ্যায়ের শেষাংশে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়, 'হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন' শিরোনামে উভয় ধর্মে মরণোত্তর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। দেহ মানুষের সারসত্তা নয়। মানুষের সারসত্তা হচ্ছে তার আত্মা। মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটে কিন্তু আত্মা অক্ষয়, অমর থাকে। এ অক্ষয় অমর আত্মা মরণোত্তর জীবনে বিভিন্ন অবস্থা ও পরিণতির শিকার হয়।আত্মার এ পরিণতি সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী বিশ্বাস ও ধারণা অভিন্ন নয়। তবে হিন্দু ও ইসলাম উভয় মতে মৃত্যুর পর আত্মা সকল অবস্থার সাথে জড়িত থাকে। তাই এ অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপ, অমরত্বের স্বরূপ, মৃত্যুর তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী পুনর্জন্মবাদ, কর্মবাদ, স্বর্গ, নরক, ব্রহ্মের সাথে একীভূত হওয়ার অর্থ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপ, ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী কবর জগৎ, মরণোত্তর জীবনের সুখ-দুঃখ, পুনরুত্থান, আল্লাহর সাথে মিলন ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

'মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী মতের তুলনা ও বিচারমূলক পর্যালোচনা' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে মরণোত্তর জীবনের বিভিন্ন বিশ্বাস, ধারণা ও অবস্থা সম্পর্কে উভয় ধর্মের তুলনা করা হয়েছে। মরণোত্তর জীবনের তাৎপর্য সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী মতে পার্থক্য রয়েছে। হিন্দুধর্ম পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করে, পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস নেই। ইসলামে আলমে বরযখ[৩] বা কবর জগতের বিশ্বাস আছে কিন্তু হিন্দু ধর্মে কবর জগতের

---

[৩] বরযখ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। আলমে বরযখ বলতে মৃত্যুর পর হতে পুনরুত্থানের সময় পর্যন্ত সময় ও অবস্থাকে বুঝায়।

Dhaka University Institutional Repository

কোন বিশ্বাস নেই। হিন্দুধর্ম যেখানে ক্ষণস্থায়ী স্বর্গ-নরকে[৩] বিশ্বাস করে ইসলাম সেখানে চিরস্থায়ী স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস করে। এভাবে মরণোত্তর জীবনের নানা বিষয়ে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। আবার অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও রয়েছে। উভয় ধর্ম আত্মার ঐশী উৎস, অমরত্ব, পার্থিব জীবনের কর্মের উপর মরণোত্তর জীবনের সুখ-দুঃখ, বা আনন্দ ও বেদনা নির্ভর করে বলে বিশ্বাস করে। অত্র অধ্যায়ে উভয় ধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়েছে এবং মরণোত্তর জীবনের বিভিন্ন ধারণা ও বিশ্বাসের বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় — উপসংহার। এখানে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবনের বিশ্বাস ও ধারণাসমূহের প্রায়োগিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব দেখানো হয়েছে। হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মে মরণোত্তর জীবনের বিশ্বাসে বৈসাদৃশ্যের মধ্যেও সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। ভিন্নতার মধ্যেও ঐক্য, সমঝোতা ও সম্প্রীতির বহু উপাদান রয়েছে। এ সব উপাদান দু'ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে থাকবে। ব্যবহারিক আচার-আচরণের অনেক বিষয়ে উভয় ধর্মে পার্থক্য রয়েছে। যেমন হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করে না কিন্তু মুসলিমরা গো মাংস ভক্ষণ করে। হিন্দুরা প্রতিমা পূজা করে কিন্তু মুসলিমরা প্রতিমা পূজাকে অন্যায় মনে করে। দু'টি ধর্মে এরূপ পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এসব মৌলিক পার্থক্য নয়। এ অধ্যায়ে মরণোত্তর জীবনের বিশ্বাসে উভয় ধর্মের ঐক্যের বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো পারস্পরিক হৃদ্যতা, ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী, সাম্য, সমঝোতা, সহযোগিতা ও অসাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে। ঐক্যের এ বিষয়গুলো নৈতিক দিক থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি অসৎ গুণাবলী থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে। এবং মানুষকে পরার্থপর, সহানুভূতিশীল এবং প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। একইভাবে ঐক্যের বিষয়সমূহ মানুষকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি দান করে। মানুষকে অন্য মানুষ ও মানবেতর প্রাণী এমনকি সকল বস্তুতে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি দান করে। মানুষসহ জগতের সবকিছু পরমাত্মা থেকে এসেছে, পরমাত্মা সব কিছুর উৎস, পরমাত্মা সব কিছুতে জ্ঞাত ইত্যাদি উপলব্ধি মানুষকে সকল হিংসা, ঘৃণা ও শত্রুতার উর্ধ্বে স্থান দেয়। মানুষ হয়ে যায় প্রকৃত মানুষ। মরণোত্তর জীবনে মুক্তি এবং পার্থিব জীবনে প্রকৃত ও পূর্ণ মানুষ তৈরী করা হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মের উদ্দেশ্য।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে ঐতিহাসিক, বিশ্লেষণাত্মক এবং বিচারমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্ম ঐতিহাসিক সত্য। উভয় ধর্মের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উভয়ের সত্যতা

---

[৩] অবশ্য বেদ ও কোন কোন সম্প্রদায় স্বর্গ-নরককে স্থায়ী আবাস বলে মনে করে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবং যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে উভয়ের তুলনা করা হয়েছে। উভয় ধর্মের মুখ্য ও গৌণ গ্রন্থ অধ্যয়নের ভিত্তিতে মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গ ক্রমে অন্যান্য ধর্ম এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের মত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটা অধ্যায় শেষে তথ্য নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে এবং সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জী উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১। Maurice bucaille, *The Bible, the Quran and Science,* trans., Alastair D. pannell and the author, Delhi : Crescent Publishing Co., 1985, p. 115.

২। মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে,* ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃঃ সাত।

৩। Archer, Clark, "Hinduism" in *the Great Religion of the Modern World,* ed., Jurji, Edward J., New Jersey : Princeton University Press, 1967, p. 44.

৪। *আল কুরআন,* ৩৩ ঃ ৪০।

৫। Lari, S. Mujtaba Musavi, *Resurrection Judgement and the Hereafter,* Trans., Hamid Algar, Iran : Qum ; Foundation of Islamic Cultural Propagation in the World, 1992, p. 148.

৬। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ,* ৪/২/৩ — ৪।

৭। *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ৫/১০/৭, *কৌষীতকী,* ১ — ২।

৮। *আল কুরআন,* ২১ঃ৯৫, ৯৯, ১০২;২৩ঃ৯৯ —১০৩, ৩৫ঃ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য

এ ধরাধামে মানুষের জন্ম হয়, আবার তার মৃত্যু ঘটে। সে এ জগতে একটা নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তার মনে প্রশ্ন জাগে — সে কোত্থেকে এসেছে, কোথায় যাবে, কী তার কর্তব্য, জীবনের অর্থ ও লক্ষ কী, মৃত্যুতেই কি জীবনের অবসান, নাকি মৃত্যুর পরেও জীবন আছে, যদি থাকে তাহলে সে জীবনের প্রকৃতি কী, দৃশ্যমান এ জগতের অর্থ ও প্রকৃতি কী, এ জগতের শুরু ও শেষ কোথায়, কীভাবে এর উৎপত্তি হয়েছে, এর কি কোন স্রষ্টা আছে, নাকি এটি স্বয়ম্ভু, নশ্বর না চিরন্তন, সসীম না অসীম এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন তার চিন্তার রাজ্যে ভিড় করে অহরহ।

এ সব চিন্তার মধ্যে মানুষের স্বাধীন, বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক চিন্তার সূচনায় জগতের উৎপত্তি, উপাদান, গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচীন পাশ্চাত্য দর্শনের জনক থেলিস (খ্রিঃপূর্ব আনুমানিক ৬২৪-৫৪৬) জগতের উপাদান সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে খ্যাত হয়েছেন। একইভাবে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এনাক্সিম্যান্ডার, এনাক্সিমিনিস, পিথাগোরাস, হিরাক্লিটাস, জেনোফ্যানিস, পারমেনাইদিস প্রমুখ বিশ্বতাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রেখেছেন। তবে এ কথা সত্য যে, তাঁরা জগৎ সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বাধীন চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করলেও তাঁদের বহু পূর্বে বিভিন্ন ধর্মে জগতের উৎপত্তি, গঠন প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ঋগবেদের বহুসংখ্যক স্তুতি বিশ্বতাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাপৃত। এ ছাড়া টাওবাদ (Taoism), কনফুসীয় ধর্ম (Confucianism), জরথুষ্ট্রবাদ (Zoroastrianism) প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মে বিশ্বতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য আলোচনা রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রচলিত ধর্মসমূহের প্রত্যেকটিতেই জগতের উৎপত্তি, প্রকৃতি, গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম এবং হিন্দু সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শন ব্যতীত প্রায় সব ধর্মেই মনে করা হয় যে, জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। এ সত্ত্বেও জগতের উৎপত্তি, প্রকৃতি, মূল্য প্রভৃতি সম্পর্কে ধর্মসমূহের পারস্পরিক বক্তব্যে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য প্রচুর। এমনকি একই ধর্মের ব্যাখ্যাতা ও দার্শনিকদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মত পরিলক্ষিত হয়। আবার এসব ধর্মে বিজ্ঞান ও দর্শনেরও অনেক মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন ধর্মে 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' (Big Bang Theory), 'কোনটিতে স্টিডি স্টেট তত্ত্ব' (Steady State Theory), কোনটিতে আকস্মিক সৃষ্টিবাদ, আবার কোনটিতে বিবর্তনবাদের প্রচার রয়েছে। এমনকি একই ধর্মে ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সৃষ্টিবাদ ও বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত হিন্দু ধর্মে বৈচিত্র্যের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। এ ধর্মে রয়েছে এক ব্রহ্মে বিশ্বাস, আবার ব্রহ্মে বিশ্বাসহীন সম্প্রদায়ও এ ধর্মে রয়েছে। অদ্বৈতবাদ (Non-Dualism), দ্বৈতবাদ (Dualism)র ব্যাখ্যাও এ ধর্মে রয়েছে। মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও নানা তারতম্য রয়েছে। অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতের তাৎপর্য সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে বিভিন্নমুখী বক্তব্য রয়েছে। এখানে জগতের উৎপত্তি, প্রকৃতি, প্রলয় প্রভৃতি সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বক্তব্য আলোচনা করা যাক।

পার্থিব জগৎ সম্পর্কে হিন্দু ধর্ম ঃ

জগৎ-জীবনের উৎপত্তি, উপাদান, প্রকৃতি, প্রলয় প্রভৃতি সম্পর্কে হিন্দু ধর্মের বক্তব্য বহুমুখী। "এ ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বে যেমন রয়েছে বৈচিত্র্য তেমনি রয়েছে বিরোধিতা।"[১] এ বিরোধিতা ধর্মগ্রন্থসমূহ এবং দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে নানাভাবে বিদ্যমান।

১। জগতের সৃষ্টি ঃ

১ ঃ১। বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ

ঋগবেদে জগতের উপাদান হিসেবে তপস্যা, পানি, বায়ু প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। ঋগবেদের ভাষায় ঃ "প্রজ্বলিত তপস্যা হতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করল। পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র। জলপূর্ণ সমুদ্র হতে সংবৎসর জন্মিল। তিনি দিন রাত্রি সৃষ্টি করলেন, সকল লোকে দেখছে। সৃষ্টিকর্তা যথাসময়ে সূর্য ও

Dhaka University Institutional Repository

চন্দ্রকে সৃষ্টি করলেন এবং পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করলেন ।''[২] সৃষ্টিকর্তাকে হিন্দু ধর্মে ব্রহ্ম, প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা , পুরুষ, পরমাত্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে । ব্রহ্ম বা বিশ্বকর্মা তাঁর সর্বময় ক্ষমতা বলে এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন । ''সে এক প্রভু, তাঁর সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ, ইনি দু'হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্বক নির্মাণ করেন, তাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয় ।''[৩] তবে তিনি শূণ্য হতে কিছু সৃষ্টি করেন না । শূণ্য হতে জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে এমন ধারণা ঋগবেদে নেই ।[৪] তাহলে তিনি উপাদান কোথায় পেলেন ? হয় তিনি স্বীয় প্রকৃতি হতে জগৎ সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তিনিই জগতের উপাদান কারণ, না হয় তিনি নিমিত্ত কারণ হিসেবে পূর্বঃস্থিত উপাদান দিয়ে জগৎ নির্মাণ করেছেন । এ দ্বিবিধ মতই বেদে রয়েছে ।[৫] ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হয় তাহলে তিনি জগতের সাথে অভিন্ন কি না, আবার নিমিত্ত কারণ হলেইবা জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক কী ইত্যাদি বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ।

ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টির জন্য বৃক্ষ, কাঠ ইত্যাদি উপাদান কোথায় পেলেন, এ প্রশ্ন স্বয়ং বেদেই করা হয়েছে।[৬] তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে । ব্রহ্মই স্বয়ং কাঠ যা দিয়ে দ্যুলোক ও ভূলোক নির্মাণ করা হয়েছে ।[৭] আবার পূর্বঃস্থিত উপাদান থেকে জগতের সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা বেদে রয়েছে এভাবে ঃ সর্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল । সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল । অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা তিনি সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন । তপস্যার প্রভাবে এক বস্তু জন্মিলো । সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের অবির্ভাব হল, তা হতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল । বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করলেন ।[৮] এখানে অবিদ্যমান বস্তু থেকে বিদ্যমান বস্তুর উদ্ভব মানে এ নয় যে, শূন্য হতে বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে, বা অসত্তা থেকে সত্তা বা অনস্তিত্বশীল থেকে অস্তিত্বশীল বস্তুর উদ্ভব হয়েছে, বরং এর অর্থ হল অস্পষ্ট সত্তা থেকে স্পষ্ট সত্তার উদ্ভব হয়েছে ।[৯]

১ ঃ ২। উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ

উপনিষদ 'পূর্বঃস্থিত বস্তু থেকে জগতের সৃষ্টি'—এ বক্তব্যের বিরোধিতা করে । উপনিষদ মতে, অস্তিত্বশীল বিশৃঙ্খল উপাদানকে বিন্যস্ত করে ব্রহ্ম জগৎ নির্মাণ করেননি । বরং ব্রহ্ম থেকেই জগতের সৃষ্টি । ব্রহ্ম চিরন্তন বিরাজমান ছিলেন । এক সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ব্রহ্ম থেকে জগতের প্রকাশ ঘটল । এ প্রকাশের কারণ হল ব্রহ্মের উচ্ছ্বাস ।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভাসই জগতের শুরু এবং পরিণতি, কারণ এবং কার্য, মূল বা অঙ্কুর ।[১০] এ কারণে জাগতিক প্রতিটা বস্তু তার উৎস পরমাত্মা বা ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য বহন করে, যেমনিভাব পুত্রের মধ্যে পিতার বৈশিষ্ট্য বিরাজমান থাকে ।

আবার উপনিষদে ব্রহ্মের তপস্যা বা সংকল্পকে বহুরোজি ও জীবসমূহের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে । ''প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে তপস্যা করলেন এবং তপস্যা করে তিনি রয়ি (Matter) ও প্রাণ (Living force) এবং মিথুন উৎপাদন করলেন ।'' তিনি মনে করলেন—''এরাই আমার বহু প্রকারের প্রজা উৎপাদন করবে ।''[১১] উপনিষদ একক আধিবিদ্যক সত্তা বা ব্রহ্মের সাহায্যে নিখিল জগৎ (Macrocosm) ও মানুষ (Microcosm) এর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে । ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ । উপাদান ও নিমিত্ত কারণ । তাই জাগতিক প্রতিটা বস্তুই আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত । উপনিষদ চরমভাবে জড়বাদ (Materialism) ও প্রাণবাদ (Vitalism) এর বিরোধিতা করে । জড় হতে বাহ্যজগৎ ও জীবনের উদ্ভব হতে পারে না । ''জড় (রয়িং) ও প্রাণ (প্রাণং) এর দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বস্তুনিচয় ও জীবসমূহের উদ্ভব ঘটে । আর এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটির (মিথুনম্) উৎপাদন বা সূত্রপাত করে দেন পরমাত্মা বা প্রজাপতি ।''[১২]

১ঃ৩। পুরাণ, মহাভারত ও গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ

পুরাণে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর সৃষ্টির জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করলেন এবং সচেষ্ট হয়ে উঠলেন, এতেই আকাশের সৃষ্টি হল, অতঃপর আকাশ হতে বায়ু, বায়ু হতে আলোক, আলোক হতে পানি এবং পানি হতে পৃথিবী উৎপন্ন হল । কালক্রমে পৃথিবীতে বিভিন্ন জীব ও মানবের উৎপত্তি হল ।

জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে উপনিষদের ন্যায় মহাভারতেও বর্ণিত হয়েছে যে, জগৎ ব্রহ্ম থেকে বিকশিত হয়েছে । ব্রহ্ম ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন এবং ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ (Golden egg) দিয়ে নির্মিত । এই ব্রহ্মাই সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন । জগতের তাবৎ বস্তুতে রয়েছে পুরুষ ও প্রকৃতি নামক দু'ধরনের সত্তা । পুরুষ হচ্ছে চেতন সত্তা আর প্রকৃতি হচ্ছে অচেতন জড় । এই পুরুষ ও প্রকৃতি একই ব্রহ্মের দু'টি দিক মাত্র । ''সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এ ত্রিগুণের সমন্বয়েই প্রকৃতি গঠিত, আর এ ত্রিবিধ গুণ মাত্রাভেদে সকল বস্তুতে বিদ্যমান রয়েছে ।''[১৩]

ভগবৎ গীতাও ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকে জগতের কারণ বলে মনে করে । পরমেশ্বরই জগতের সকল উপাদান সৃষ্টি করেছেন । এবং এসব উপাদানের মধ্যে তাঁর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে । ''ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ (জল), তেজ (অগ্নি),

Dhaka University Institutional Repository

মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ), মন, বুদ্ধি ও অহংকার — এই আটভাগে আমার প্রকৃতি বিভক্ত। এ সমুদয় আমার অপরা [জড়] প্রকৃতি। ইহা ভিন্ন আমার আর একটি প্রকৃতি আছে তা আমার পরা [চেতন] প্রকৃতি। এই পরা প্রকৃতি হতেই জীবের উৎপত্তি হয়েছে এবং এ পরা প্রকৃতিই এ জগতকে ধরে আছে।''[১৪]

১ঃ৪। হিন্দু ষড় দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ

জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থের ন্যায় হিন্দু দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহের বক্তব্যও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের কাছাকাছি। যদিও সম্প্রদায়সমূহের বক্তব্য ও ব্যাখ্যায় ভিন্নতা আছে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নয়। বৈশেষিক দর্শন জগতের সবকিছুকে এমনকি মনকেও পারমাণবিক বলে মনে করে। পরমাণুই জগতের উপাদান কারণ। পরমাণু পূর্ব থেকেই অস্তিত্বশীল ছিল। পরমেশ্বর এ পরমাণুগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দেন। ঈশ্বর কর্তৃক সংযোগ স্থাপনের পূর্বে পরমাণুগুলো নিষ্ক্রিয় ও গতিহীন থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ক্ষিতির পরমাণুর সঙ্গে তেজের পরমাণু মিশ্রিত হয়ে প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। অতঃপর এ ব্রহ্মাণ্ড হতে কালক্রমে জাগতিক বিষয়সমূহের উদ্ভব ঘটে। বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় মীমাংসা দর্শনও পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। পরমাণু দিয়েই জগৎ গঠিত। পরমাণু ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট কিংবা নিয়ন্ত্রিত হয় না। 'অপূর্ব' বা 'কর্মতত্ত্ব' পরমাণুকে চালিত করে। অপরদিকে সাংখ্য দর্শন বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। এ দর্শন মতে, ব্রহ্ম জগতের কারণ নয়, বরং জগতের কারণ হচ্ছে অচেতন প্রকৃতি। জগতের অভিব্যক্তির পূর্বে জগৎ তার কারণ প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রকৃতি গতিশীল জড় সত্তা। এ জড় সত্তা থেকে পরিবর্তন ও বিবর্তনের নিয়ম অনুসারে জগতের উদ্ভব বা প্রকাশ ঘটেছে। আবার বেদান্ত দর্শন শংকর ভাষ্যে আমরা পাই যে, ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্ম হচ্ছে জগতের উপাদান কারণ। এ কারণে জগৎ ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জগতের স্বাধীন কোন অস্তিত্ব নেই।[১৫] জগৎ ব্রহ্মের অবভাস মাত্র।

২। জগতের প্রকৃতি ঃ

২ঃ১। জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে বেদ ঃ

জগতের আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা প্রাচীন কাল থেকেই ভেবে আসছেন। জগৎ সসীম না অসীম, শাশ্বত না ক্ষণস্থায়ী, অনড় না পরিবর্তনশীল, এর আদি আছে না নেই, দৃশ্যমান

Dhaka University Institutional Repository

জগতই কি প্রকৃত সত্তা না অবভাস — এসব প্রশ্নের দ্বারা তাঁরা তাড়িত হয়ে আসছেন। প্রাচীনকালে হিরাক্লিটাস তাঁর 'ভবনতত্ত্বে' (Theory of Becoming) এবং আধুনিককালে আইনস্টাইন তাঁর 'আপেক্ষিক তত্ত্বে' জগৎ পরিবর্তনশীল মতটি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। জগৎ পরিবর্তনশীল এ ধারণা হিন্দু ধর্মের অতি প্রাচীন ঐশী গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঋগবেদের ১০ম মন্ডলের ১২৯ (৪) সূক্তে বর্ণিত হয়েছে যে, ''সর্ব প্রথমে মনের উপর কালের আবির্ভাব হল, তা হতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল, বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করলেন।'' উৎপত্তির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। নতুন নতুন বস্তুর উৎপত্তি হতে থাকে। ভবনের (Becoming) ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। সুতরাং জগৎ অবিরত, অস্থির ও পরিবর্তনশীল।

জগৎ ব্রহ্ম থেকে বিকশিত হয়েছে। এ কারণে জগৎ উদ্দেশ্যহীন বা কোন অলীক মূর্তি নয়। ব্রহ্মের উদ্দেশ্য, ইচ্ছা ও কামনাই জগতের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জগৎ অবাস্তব এমন ধারণাও বেদে পাওয়া যায় না। বস্তুকে যেভাবে চাক্ষুষ করি বস্তু সেভাবেই অস্তিত্বশীল। বস্তু তার অস্তিত্বের জন্য মন বা ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়। লৌকিকভাবে বস্তুকে যে রকম স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্বশীল বলে প্রতীয়মান হয়, বস্তু সেভাবেই অস্তিত্বশীল। এককথায় জগতের বাস্তবতা সম্পর্কে ঋগবেদ সরল বাস্তববাদী (Naive realistic) মতই ধারণ করে থাকে।[১৬]

বেদ ত্রিতলবিশিষ্ট (Three decker) বিশ্বের কথা বলে। সর্বোচ্চে রয়েছে স্বর্গ (Heaven), এখানে স্বর্গীয় দেবতারা বাস করেন। এর নীচে রয়েছে বায়ুমন্ডলীয় স্তর। এখানে বায়ু দেবতারা (ইন্দ্র, বায়ু প্রমুখ) বাস করেন। এবং এর নিম্নে রয়েছে পৃথিবী (Earth) এটি হচ্ছে সমতল ও বৃত্তাকার। এখানে দেবতারা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার প্রাণী বাস করে। এ ত্রিতলের বিশ্ব আবার ২১টি অঞ্চলে বিভক্ত। পৃথিবীর নিম্নে রয়েছে ৭টি পাতাল, আর এ পাতালের নিম্নে রয়েছে ৭টি নরক। এ নরকগুলো হচ্ছে নিম্নাত্মাদের প্রায়শ্চিত্তমূলক আবাস স্থল।[১৭]

২ঃ২। জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে উপনিষদ ঃ

দার্শনিকদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে যে, বৈচিত্র্য, বিরোধ ও ভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান করা। বৈচিত্র্য ও বিরোধের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান মিললে বিশৃঙ্খলার মধ্যে যেন শৃঙ্খলার নির্দেশ পাওয়া যায়, বিষমসাত্ত্বিকের মধ্যে যেন সমসাত্ত্বিকের নির্দেশ পাওয়া যায়, অসামঞ্জস্যের মধ্যে যেন সামঞ্জস্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের

Dhaka University Institutional Repository

একটি সুন্দর ব্যাখ্যা রয়েছে উপনিষদে । জগৎ বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও ভিন্ন ঘটনাবলীতে ভরপুর । এসব বৈচিত্র্যের ভিত্তি হচ্ছে একটি মাত্র সত্তা আর তা হচ্ছে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম । অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম থেকে বৈচিত্র্য ও বহুত্বের উদ্ভব হয়েছে ।তাই বৈচিত্র্য পরমাত্মারই প্রকাশ । উপাদান কারণ, আকার কারণ ও নিমিত্ত কারণ সবই ব্রহ্ম । উপাদান হচ্ছে নিষ্ক্রিয় এবং অচেতন । উপাদান চেতনমন্ডিত হয়ে নির্দিষ্টরূপ লাভ করে । এ নির্দিষ্টরূপ লাভ করা হচ্ছে তার আকার । জাগতিক প্রতিটা বস্তুতে রয়েছে উপাদান ও আকার । আর উপাদান ও আকার হচ্ছে একই সত্তার দু'টো দিকমাত্র ।'[১৮] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, জগৎ হচ্ছে পরমাত্মার প্রকাশ আর এ প্রকাশটি হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ।

জগতের মধ্য দিয়েই ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করে । তাই ''সসীম জগৎ অসীম পরমাত্মার মধ্যেই থাকে। অসীম পরমাত্মাই সমস্ত জগৎ ।''[১৯] তাই বলে '' পরমাত্মা বা ব্রহ্মের মধ্যে নানাত্ব কিংবা বহুত্ব নেই ।''[২০] সবকিছুকেই পরমাত্মা পরিব্যাপ্ত করে আছেন । জগতের প্রতিটা বস্তুতেই পরমাত্মা বিরাজমান । এমনকি সূক্ষ্ম ধূলিকণায়ও ব্রহ্ম বর্তমান থাকে ।[২১] বস্তুসমূহের মধ্যে ব্রহ্ম এমনভাবে একীভূত থাকে যেমনভাবে দ্রবীভূত পানিতে লবন বা চিনি একীভূত থাকে ।[২২] এভাবে উপনিষদে বহুসংখ্যক সূক্তিতে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, জগৎ ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন । তবে এর মানে এই নয় যে, ব্রহ্ম জগতের উপর নির্ভরশীল । ব্রহ্ম জগতের সাথে কোন প্রকার নির্ভরতা ব্যতীত অস্তিত্বশীল থাকতে পারে এবং থেকে থাকে ।

২ঃ৩। জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে গীতা ঃ

ব্রহ্মের সাথে জগতের অভিন্নতা ও অদ্বৈততার কথা গীতায়ও বর্ণিত হয়েছে । ''আমিই নিত্য সৎ পদার্থ, আবার আমিই অনিত্য পরিবর্তনশীল বস্তু জগৎ ।''[২৩] তবে ব্রহ্ম যে অর্থে বাস্তব সত্তা জগৎ সে অর্থে বাস্তব নয় । ব্রহ্ম ও জগতের বাস্তবতা একই রকম নয় । ব্রহ্ম হচ্ছে কারণ আর জগৎ হচ্ছে তাঁর কার্য । যদিও কারণ ও কার্য একটি সাপেক্ষ বিষয় এবং কারণের মধ্যে যে শক্তি ও প্রকৃতি বিদ্যমান থাকে কার্যের মধ্যেও সেই শক্তি ও প্রকৃতি বিদ্যমান থাকবে । এ সত্ত্বেও কারণের বাস্তবতা কার্যের বাস্তবতার চেয়ে বেশি হবে । কারণ থেকে কার্য উদ্ভূত হয় । যিনি উদ্ভব ঘটান তার গুণগতমান উদ্ভবের মানের চেয়ে বেশি হওয়া স্বাভাবিক । এভাবে জগতের কারণ হিসেবে ব্রহ্মের বাস্তবতা তাঁর কার্য জগৎ থেকে অধিকতর ।

Dhaka University Institutional Repository

২ঃ৪। জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে হিন্দু ষড় দর্শন ঃ

২ঃ৪ঃ১। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন ঃ

উপনিষদ ও গীতা কারণ ও কার্যকে তথা ব্রহ্ম ও জগতকে অভিন্ন মনে করলেও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন কারণ ও কার্যকে অভিন্ন মনে করে না। তাদের মতে কার্য একটি নতুন অবস্থা। কার্যের সৃষ্টির পূর্বে তা কারণের মধ্যে অব্যক্তরূপে থাকে না। তাঁদের এ মতবাদের নাম অসৎকার্যবাদ। তাঁদের মতে ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। নিমিত্ত কারণ কার্যের কারণ থেকে নতুন ও পৃথক অবস্থার নির্দেশ করে। সুতা দিয়ে কাপড় তৈরী হয়। সুতা হচ্ছে উপাদান কারণ আর কার্য হচ্ছে কাপড় এবং নিমিত্ত কারণ হচ্ছে তাঁতী। তাঁতী থেকে কাপড় অবশ্যই স্বতন্ত্র। ঠিক তেমনিভাবে পরমাণু হচ্ছে জগতের উপাদান কারণ এবং জগৎ হচ্ছে কার্য আর ঈশ্বর হচ্ছে নিমিত্ত কারণ। ন্যায়-বৈশেষিকদের মত যোগদর্শনও ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ মনে করে। আর ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ বলেই জগৎ ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র। ন্যায়-বৈশেষিক ও যোগদর্শন ব্রহ্মকে নিমিত্ত কারণ বললেও উপনিষদ ব্রহ্মকে স্বতন্ত্রভাবে নিমিত্ত কারণ হিসেবে অনুমোদন করে না। উপনিষদ মতে, ব্রহ্ম স্বয়ং উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ ''ব্রহ্ম স্বয়ং স্রষ্টা — নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন।''[২৪]

২ঃ৪ঃ২। সাংখ্য দর্শন ঃ

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, কারণ থেকে কার্য নতুন অবস্থা হলেও সাংখ্য দর্শন মতে কারণ কার্য থেকে নতুন কোন অবস্থা নয়। কার্য কারণে অব্যক্ত থাকা অবস্থারই ব্যক্তরূপ, অর্থাৎ কার্য হচ্ছে কারণের পরিণাম। এ জগৎ প্রকৃতিরই পরিণাম। শূন্য ও অবাস্তব থেকে কিছুর উদ্ভব সম্ভব নয়। আর বাস্তব হতে বাস্তবেরই উদ্ভব ঘটে। কারণ একটি বাস্তব সত্য। কারণের মধ্যে কার্য সৎরূপে বিরাজমান থাকে। কার্য যখন ব্যক্ত হয় তখন তা সৎ হিসেবেই ব্যক্ত হয়। কেননা সৎ হতে অসৎ এর উদ্ভব হয় না। সুতরাং প্রকৃতি হতে উদ্ভূত জগৎ বাস্তব ও সত্য।[২৫]

শংকরাচার্য ''জগৎ প্রকৃতিরই পরিণাম'' সাংখ্য দর্শনের এ মতের সমালোচনা করেছেন। শংকরাচার্য বলেন, প্রকৃতি অচেতন, এ অচেতন প্রকৃতি কোন বুদ্ধিমান ও চেতনসত্তার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা ব্যতিরেকে জগতের উপর ক্রিয়া করতে পারে না বা জগৎ এর থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। যেমন কোন কুমারের হস্তক্ষেপ ও ক্রিয়া ব্যতিরেকে

Dhaka University Institutional Repository

মাটি থেকে ঘট বা পাত্র উদ্ভূত হতে পারে না । তাই প্রকৃতি থেকে জগৎ উদ্ভূত হওয়ার পশ্চাতে কোন বুদ্ধিমান সত্তাকে মেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয় ।[২৬]

২ঃ৪ঃ৩। মীমাংসা দর্শন ঃ

সাংখ্য দর্শনের ন্যায় মীমাংসা দর্শনও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না । আবার সাংখ্য দর্শনের ন্যায় মীমাংসা দর্শনও মনে করে যে, জগৎ সত্য । তবে সাংখ্য দর্শন যেভাবে কারণের সত্যতার নিরিখে কার্যের সত্যতা দাবী করে মীমাংসা দর্শনের দাবীটি সে রকম নয় । জগৎ কর্মের স্থল, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি জগতেই সম্পন্ন হয় । জীবন ও জীবিকা সবকিছুই অর্থবহ । জগৎ জ্ঞাতার মনের উপর নির্ভরশীল নয় বা এ জগৎ কোন পরমাত্মার ক্রীড়নকও নয় । এ জগতের প্রত্যক্ষসিদ্ধ অস্তিত্ব রয়েছে । সুতরাং জগৎ সৎ ও বাস্তব ।

২ঃ৪ঃ৪ । বেদান্ত দর্শন ঃ

ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন উপনিষদের এ বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বেদান্ত দার্শনিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে । এটা সন্দেহাতীত যে, ব্রহ্ম সত্য ও বাস্তব, কিন্তু জগৎ সত্য ও বাস্তব কি-না এ ব্যাপারে দার্শনিকেরা সন্দেহাতীতভাবে ঐক্যে পৌছতে পারেননি । এ প্রসঙ্গে বেদান্ত দার্শনিকদের মধ্যে গৌড়পাদ, শংকরাচার্য, রামানুজ, মধ্ব প্রমুখের মত উল্লেখযোগ্য ।

গৌড়পাদ ঃ গৌড়পাদের মতে, অদ্বৈত আত্মাই প্রকৃত ও একমাত্র সত্তা । জগৎ প্রকৃত সত্তা নয় । বৈচিত্র্যময় জগৎ হচ্ছে অধ্যাসমূলক অবভাস যা মায়ার প্রভাবে উৎপন্ন হয়েছে ।[২৭] গৌড়পাদ জগতকে অনস্তিত্বশীল মনে করেন । তাঁর মতে, 'অস্তিত্ব' শব্দটি কেবল তার উপরই আরোপ করা যায় যার প্রকৃত সত্তা আছে, যার প্রকৃত সত্তা নেই তাকে অস্তিত্বশীল বলা যায় না । জগতের প্রকৃত সত্তা নেই । সুতরাং জগতকে প্রকৃত পক্ষে অস্তিত্বশীল বলা যায় না । যদিও জগতকে দৃশ্যতঃ বাস্তব বলে মনে হয় । আবার জগতকে অবাস্তবও বলা যায় না । এটা প্রকৃত সত্তা থেকে বিচ্ছেদ্য নয় আবার অবিচ্ছেদ্যও নয় । বস্তুত জগতের প্রকৃতি অনির্বচনীয় । এ অনির্বচনীয় জগতকেই বেদান্ত দর্শনে মায়া বলে অভিহিত করা হয়েছে ।

আচার্য শংকর ঃ শংকরের মতে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ । ব্রহ্ম থেকে জগতের পৃথক ও স্বাধীন কোন অস্তিত্ব নেই ।[২৮] ব্রহ্ম এবং জগৎ এক ও অভিন্ন । শংকরাচার্যের এ মত অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত । এখন ব্রহ্ম ও জগৎ

Dhaka University Institutional Repository

অভিন্ন হলে জগতের প্রতিটা বস্তুকে ব্রহ্ম বলে মেনে নিতে হয়, এতে ব্রহ্ম অসংখ্য হয়ে পড়ে । আবার জগতের বস্তুসমূহ ধ্বংস ও পরিবর্তনের অধীন, বস্তুসমূহ ব্রহ্ম হওয়ায় ব্রহ্মও ধ্বংস ও পরিবর্তনের অধীন হয়ে পড়ে । জগতের বস্তুনিচয় নানাবিধ গুণের অধিকারী, বস্তুনিচয় ব্রহ্ম হওয়ায় ব্রহ্ম নানাবিধ গুণের অধিকারী হয়ে পড়ে । কিন্তু শংকরের মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, শাশ্বত, চিরন্তন ও নির্গুণ । তাহলে নিরপেক্ষ ব্রহ্মকে আপেক্ষিক জগতের সাথে অভিন্ন বলার অর্থ কী ? স্বয়ং শংকরই এর উত্তর দিয়েছেন ।

শংকর ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্ককে দু'টো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন ঃ (ক) পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ (খ) ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ ।

পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে কার্য তার কারণ থেকে 'অনন্য' অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম থেকে অনন্য (পৃথক নয়) । আর ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে কার্য তার কারণ থেকে অন্য অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম থেকে অন্য (পৃথক)। জাগতিক বস্তুসমূহকে আমরা ফেভাবে দেখি, তাতে সেগুলোকে তাদের কারণ থেকে পৃথক প্রতীয়মান হয় । যেমন, কাঁদামাটিকে রূপান্তরিত করা হয় মৃৎপিণ্ডে, আর মৃৎপিণ্ডকে রূপান্তরিত করা হয় ঘট বা পাত্রে । এখানে ঘট বা পাত্রের উপাদান কারণ হচ্ছে মৃত্তিকা বা কাঁদামাটি আর এর কার্য হচ্ছে ঘট বা পাত্র । ঘট বা পাত্র অবশ্য তার কারণ থেকে পৃথক । কেউ ঘট বা পাত্রকে কাঁদামাটি আর কাঁদামাটিকে ঘট বা পাত্র বলে অভিহিত করবে না । এরা পরস্পর পৃথক । ঠিক এমনিভাবে জগৎ তার উপাদান কারণ ব্রহ্ম থেকে পৃথক । ব্রহ্মের সাথে জগতের এ অবস্থাটিকে শংকর ব্যবহারিক দিক থেকে 'অন্য' বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে, কাঁদামাটি থেকে মৃৎপিণ্ড এবং মৃৎপিণ্ড থেকে ঘট বা পাত্র রূপান্তরিত হলেও এবং এরা পরস্পর পৃথক হলেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এদের মধ্যে মৃত্তিকা নিহিত রয়েছে । এদের রূপ পৃথক কিন্তু সত্তাগতভাবে এরা একই উপাদান (মৃত্তিকা) ধারণ করে । এভাবে ঘট বা পাত্র তার কারণ মৃত্তিকা থেকে পৃথক নয় । অনুরূপভাবে, জগৎ তার কারণ ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয় । জগতের সত্তায় নিহিত রয়েছে ব্রহ্ম । সত্তাগতভাবে জগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয় । ব্রহ্মের সাথে জগতের এ সম্পর্ককে শংকর পারমার্থিক বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'অনন্য' বলে অভিহিত করেছেন ।[২৯]

পল ডয়সেনসহ অনেকেই অনন্য শব্দটিকে 'একত্ব' অর্থে গ্রহণ করেছেন । প্রকৃতপক্ষে এরূপ অর্থে শংকর অনন্য শব্দটি ব্যবহার করেননি । কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে 'অনন্য শব্দটিকে একত্ব অর্থে গ্রহণ করার ফলে শংকরের মতবাদটির বিরোধিতা করা হয়'।[৩০] শংকর অনন্য শব্দটি দ্বারা কারণ ও কার্যের একত্বকে নির্দেশ

Dhaka University Institutional Repository

করেন না যেভাবে সাংখ্য দর্শন কারণ ও কার্যকে একই এবং কার্যকে কারণের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থার ব্যক্তরূপ বোঝে থাকেন। আবার ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মত শংকর কার্যকে কারণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলেও নির্দেশ করেন না। কার্য কারণ থেকে অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথকও নয় আবার অপৃথকও নয়। এ অবস্থাটিকেই তিনি 'অনন্য' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে, অনন্য পদটি অব্যাখ্যেয় ও অনির্বচনীয়। ''শংকর পরবর্তী কোন অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিকই এ পদটিকে একত্ব অর্থে ব্যবহার করেননি। বরং তাঁরা একে অব্যাখ্যেয় ও অনির্বচনীয় অর্থে ব্যবহার করেছেন।''[৩১] তাঁরা বা শংকর আক্ষরিক অর্থে অনির্বচনীয় বলতে অবর্ণনীয়, অনির্ণেয়, অসংজ্ঞেয় ইত্যাদিকে বুঝাননি। বরং বিশেষ এক অর্থে তিনি অনির্বচনীয় পদটি ব্যবহার করেছেন। যখন কোন কিছুকে সুনির্দিষ্ট করে বাস্তব বা অবাস্তব কোনটাই বলা যায় না, তখন তাকে নির্দেশ করার জন্য তিনি অনির্বচনীয় শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে শংকরের মতে, জগৎ বাস্তব নয়, আবার অবাস্তবও নয়। তিনি 'জগৎ বাস্তব নয়' এর পক্ষে যেমন যুক্তি দিয়েছেন তেমনি 'জগৎ অবাস্তব নয়' এর পক্ষেও যুক্তি দিয়েছেন।

জগৎ বাস্তব নয় ঃ

প্রথমত ঃ শংকরের মতে, যা সৎ বা বাস্তব হবে তা অপরিবর্তনীয়, স্বয়ম্ভূ এবং শাশ্বত হবে। যা পরিবর্তনশীল হবে না, আপেক্ষিক হবে না তাই বাস্তব। আর যার মধ্যে এ সব বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে অর্থাৎ যা পরিবর্তনশীল, স্বয়ম্ভূ নয়, শাশ্বত নয়, তাকে বাস্তব বলা যাবে না।[৩২] পরিদৃশ্যমান জগৎ অপরিবর্তনীয় নয়, স্বয়ম্ভূ নয় এবং শাশ্বতও নয়। সুতরাং এ জগৎ বাস্তব নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ শংকরের মতে, যা সসীম তা বাস্তব নয়। যা দৃষ্টিগোচর হয় বা যাকে এটা বা ওটা বলে জানা যায় তা সসীম। আর সসীম বস্তু স্বয়ম্ভূ নয়। ইহা নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। আর যা অন্যের উপর নির্ভরশীল তা বাস্তব নয়। জগৎ সসীম, কারণ জগৎ দৃশ্যমান। আর সসীম বলে জগৎ স্বয়ম্ভূ নয়, তার অস্তিত্বের জন্য অন্যের উপর নিভরশীল। আর নির্ভরশীল বলে জগৎ বাস্তব নয়।

তৃতীয়ত ঃ শংকরের মতে, যা অদেশীয় এবং অকালিক তা বাস্তব। ব্রহ্ম বাস্তব, কারণ ব্রহ্ম দেশ ও কালের অধীন নয়। কিন্তু জগৎ বাস্তব নয়। কারণ জগৎ দেশ ও কালের অধীন। দেশ ও কাল ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব নয়। জগৎ ভৌত, ইহা ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং জগতের বাস্তবতা নেই।[৩৩] এভাবে শংকর বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, জগৎ 'বাস্তব নয়'।

জগৎ অবাস্তব নয় ঃ

প্রথমত ঃ জগৎ যদি অবাস্তব হত তাহলে আমরা জগতের ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না। অবাস্তব বস্তুকে কখনই প্রত্যক্ষ করা যায় না অথবা অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। যেমন খরগোশের শিং বা বন্ধ্যা মহিলার পুত্র সন্তান কখনই প্রত্যক্ষ করা যায় না বা অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ অবাস্তব বিষয়ের কোন অস্তিত্বই নেই। জগতের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং তার ঘটনাবলীর জ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং জগতের অস্তিত্ব আছে এবং ইহা অবাস্তব নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ শংকর বারংবার এ কথা বলেছেন যে, জগৎ হচ্ছে ব্রহ্মের কার্য। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের অন্য কোন উপাদান কারণ নেই। এবং এ দিক থেকে জগৎ ব্রহ্মের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। ব্রহ্ম যেহেতু বাস্তব সেহেতু তার কার্য এবং তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত জগৎ অবাস্তব হতে পারে না। জগতকে অবাস্তব বললে প্রকারান্তরে তা ব্রহ্মের বাস্তবতায় সন্দেহের নামান্তর হবে।

এতদ্ভিন্ন নিষ্কামের সার্থকতা, মোক্ষের অর্থপূর্ণতার জন্যও শংকর জগতের অবাস্তবতাকে অস্বীকার করেন। জগতকে অবাস্তব বললে নিষ্কামের সাধনা অবাস্তব হয়ে পড়ে, জগতে মোক্ষ লাভও অবাস্তব, অলীক হয়ে পড়ে।

জগৎ অধ্যাস নয় ঃ

শংকরের অনেক ভাষ্যকার মনে করেন যে, শংকরের মতে জগৎ একটি অধ্যাস। কিন্তু তাঁদের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। জগৎ যদি অধ্যাস হয় তাহলে রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস দেখার জন্য যেমন একজন প্রত্যক্ষকারী প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনি ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস দেখার জন্য একজন প্রত্যক্ষকারীর প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের অধীন হতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই জগৎ একটি অধ্যাস এটা বলা যায় না। জগতকে একটি অধ্যাস বলে যাঁরা শংকরের ভাষ্য প্রদান করেন তারা প্রকৃতপক্ষে শংকরের প্রতি অবিচারই করে থাকেন।[৩৪]

বস্তুত শংকরের মতে জগৎ বাস্তব নয়, আবার জগৎ অবাস্তবও নয়, এবং জগৎ অধ্যাসও নয়। জগৎ হচ্ছে অনির্বচনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

রামানুজ ও মধ্বের মতে জগৎ বাস্তব ঃ

শংকর জগৎ অনির্বচনীয় বললেও বেদান্ত দার্শনিক রামানুজ ও মধ্বসহ অনেকে জগতকে বাস্তব ও সত্য বলে অভিহিত করেছেন। বৈষ্ণব বৈদান্তিক রামানুজের (১০১৭-১১৩৭) মতে, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। জগৎ ব্রহ্মের অংশ বিশেষ, সত্তাগতভাবে জগতের মধ্যে ব্রহ্ম বিদ্যমান রয়েছে। তাই জগৎ বাস্তব ও সত্য। অন্য আরেকজন বৈষ্ণব বৈদান্তিক মধ্বের মতেও জগৎ বাস্তব ও সত্য। জগৎ ব্রহ্মের কার্য। এবং ব্রহ্মের সাথে জগতের ভেদও রয়েছে। জগতের সত্তা রয়েছে। জগতের জ্ঞান লাভ হয় এবং জগৎ দৃশ্য হয় বলেই জগৎ সত্য।

৩। জগতের প্রলয় ঃ

জগতের যেমন উৎপত্তি আছে তেমনি বিনাশ আছে।জগৎ ব্রহ্ম হতে উদ্ভূত হয় আবার জগৎ ব্রহ্মেই বিলীন হয়। ভগবৎ গীতায় ব্রহ্মের উক্তি ''আমি এই নিখিল জগতের উৎপত্তি স্থল এবং আমাতেই উহার লয় হয়।''[৩৫] জগতের সবকিছুই ধ্বংসের অধীন, দেবতাদেরও ধ্বংস আছে। কেবল ব্রহ্মই চিরন্তন। তবে জগৎ চূড়ান্তরূপে ধ্বংস হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের পরে জগতের ধ্বংস হয় আবার নির্দিষ্ট বিরতির পরে জগতের নবজন্ম ঘটে। দেবতাদেরও ধ্বংসের পরে নির্দিষ্ট সময়ের পর আবার জন্ম ঘটে। সৃষ্টি ও ধ্বংস এ ধারা অন্তহীনভাবে চলতে থাকে।

৩ঃ১। চারিটি যুগ ঃ

এ পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তার বস্তুসমূহ একটা বৃহৎ সময় পর্যন্ত অস্তিত্বশীল থাকে। এ বৃহৎ সময়কে হিন্দু-ধর্মে চারিটি যুগে বিভক্ত করা হয়। এ যুগ চারিটি হল ঃ (ক) কৃত যুগ বা সত্য যুগ (খ) ত্রেতা যুগ (গ) দ্বাপর যুগ এবং (ঘ) কলি যুগ।

ক) কৃত যুগের বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল ঃ

এ যুগ হচ্ছে সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার যুগ। তাই এ যুগকে সত্য যুগ বলে অভিহিত করা হয়। এ যুগে পরস্পর শত্রুতা, প্রবঞ্চনা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, দুঃখ, আত্মঅহংকার, ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি নেই। এ কারণে এ যুগকে 'স্বর্ণ যুগ' বলা হয়ে থাকে। এ যুগে বর্ণভেদ নেই। সকলে একই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। এ যুগে একটি মাত্র বেদ,

Dhaka University Institutional Repository

একই ধর্ম এবং সকলে একই দেবতার অর্চনা করে থাকে । এ যুগের রঙ হচ্ছে সাদা । এ যুগ ৪,০০০ দেব বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয় ।

খ) ত্রেতা যুগের বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল ঃ

কৃত যুগের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে । হ্রাস পেতে পেতে যখন কৃত যুগের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা তিন চতুর্থাংশ বিদ্যমান থাকে, তখন ত্রেতা যুগের শুরু হয় । এ যুগের রঙ হচ্ছে লাল । এবং প্রধান সদ্‌গুণ হচ্ছে জ্ঞান । এ যুগে কৃত যুগের একটি বেদের পরিবর্তে চারিটি বেদ গ্রহণ করা হয় । এ যুগ ৩,০০০ দেব বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয় ।

গ) দ্বাপর যুগের বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল ঃ

কৃত যুগের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা যখন অর্ধেক বিদ্যমান থাকে, তখন এ যুগের শুরু হয় । এ যুগের প্রধান সদ্‌গুণ হচ্ছে যজ্ঞ । এ যুগের রঙ হচ্ছে হলুদ । এ যুগে রোগব্যাধি, দুঃখ এবং বিভিন্ন প্রকার বর্ণের উদয় ঘটে । পুরাণ ধর্মগ্রন্থ হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে । এ যুগ ২,০০০ দেব বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয় ।

ঘ) কলি যুগের বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল ঃ

মানবতা বর্তমানে যে যুগ অতিবাহিত করছে এ যুগকেই কলি যুগ বলে অভিহিত করা হয় । এ যুগে কৃত যুগের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা এক দশমাংশ বাকী থাকে । প্রকৃত উপাসনা ও যজ্ঞ বিলুপ্ত হয় । বিভিন্ন তন্ত্র এ যুগের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে । এ যুগের রঙ হচ্ছে কাল । এ যুগে পরস্পর শত্রুতা, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, পরশ্রীকাতরতা সর্বত্র লেগেই থাকে । অপরাধপ্রবণতা সার্বজনীন হয়ে পড়ে । মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে । মূল্যবোধ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে না । সমকামিতা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় । বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের মধ্যে মানুষ তৃপ্তি খোঁজে । এ যুগ ১,০০০ দেব বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয় । এ সময় বিষ্ণু কল্কি অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়ে জগতকে অগ্নি ও বন্যা দ্বারা ধ্বংস করে দেন ।

Dhaka University Institutional Repository

৩ ঃ ২ । সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ঃ

এ চারিটি যুগের প্রতিটা যুগের পূর্বে নির্দিষ্ট একটা সময় থাকে, এ সময়কে 'সন্ধ্যা' বা Morning Twilight বলে অভিহিত করা হয় । আবার এ সবযুগের প্রতিটা যুগের পরে একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে, এ সময়কে 'সন্ধ্যাংশ' বলে অভিহিত করা হয় ।[৩৬] শেষ সন্ধ্যাংশের পরে অর্থাৎ কলিযুগের সন্ধ্যাংশের পরে জগতের ধ্বংস হয় এবং একটা বিরতির পরে চার যুগের আবার পর্যায়ক্রমে সূত্রপাত ঘটে ।

৩ ঃ ৩। মহাযুগ ও কল্প ঃ

চার যুগের সমষ্টিকে এক মহাযুগ বলে অভিহিত করা হয় । এক মহাযুগ সমান হচ্ছে ১২,০০০ দেব বছর বা ৪,৩২০,০০০ সৌর বছর । আর এক হাজার মহাযুগের সমান হচ্ছে এক অর্ধকল্প বা ৪,৩২০,০০০,০০০ সৌর বছর । এ অর্ধকল্প সমান ব্রহ্মার একদিন বা একরাত্রি । দু'টি অর্ধকল্প নিয়ে হয় একটি কল্প বা ৮,৬৪০,০০০,০০০ সৌর বছর । একটি কল্প বা ৮,৬৪০,০০০,০০০ সৌর বছর ব্রহ্মার ১ দিন (১ রাত্রি+১দিন) ।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের ছকে চারিটি যুগ বা এক মহাযুগের সময়কাল দেখানো হলো ✪

	চারিটি যুগ ও তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের নাম	দেব বছর (এক দেব বছর সমান ৩৬০ সৌর বছর)	সৌর বছর	মোট বছর
প্রথম যুগ	কৃত যুগ সন্ধ্যা =	৪০০	(৪০০X৩৬০)= ১৪৪,০০০	১,৭২৮,০০০
	কৃত যুগ =	৪০০০	(৪০০০X৩৬০)= ১,৪৪০,০০০	
	কৃত যুগ সন্ধ্যাংশ=	৪০০	(৪০০X৩৬০)= ১৪৪,০০০	
দ্বিতীয় যুগ	ত্রেতা যুগ সন্ধ্যা=	৩০০	(৩০০X৩৬০)= ১০৮,০০০	১,২৯৬,০০০
	ত্রেতা যুগ =	৩০০০	(৩০০০X৩৬০)= ১,০৮০,০০০	
	ত্রেতা-যুগ সন্ধ্যাংশ=	৩০০	(৩০০X৩৬০) ১০৮,০০০	
তৃতীয় যুগ	দ্বাপর যুগ সন্ধ্যা=	২০০	(২০০X৩৬০)= ৭২,০০০	৮,৬৪,০০০
	দ্বাপর যুগ=	২০০০	(২০০০X৩৬০)= ৭২০,০০০	
	দ্বাপর যুগ সন্ধ্যাংশ=	২০০	(২০০X৩৬০)= ৭২,০০০	
চতুর্থ যুগ	কলি যুগ সন্ধ্যা=	১০০	(১০০X৩৬০)= ৩৬,০০০	৪৩২,০০০
	কলি যুগ=	১,০০০	(১০০০X৩৬০)= ৩৬০,০০০	
	কলি যুগ সন্ধ্যাংশ=	১০০	(১০০X৩৬০)= ৩৬,০০০	
	এক মহাযুগ=	১২,০০০	(১২,০০০X৩৬০)= ৪,৩২০,০০০	৪,৩২০,০০০

✪এই ছকটি Benjamin Walker (ed.), *Hindu World*, VOL. 1, London, 1968, p.8. অবলম্বনে দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

৩ ঃ ৪। লয়, প্রলয় ও মহাপ্রলয় ঃ

এক মহাযুগের পরে জগৎ অগ্নি ও বন্যার দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাবে। জাগতিক সকল বস্তু ও ঘটনাসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ পর্যায়কে লয় বলে অভিহিত করা হয়। লয় সংঘটিত হওয়ার পরে কিছুকাল বিরতির পর আবার জগতের সৃষ্টি হবে এবং এক মহাযুগ পরে এ জগতের আবার লয় হবে। এভাবে লয় ও সৃষ্টি প্রক্রিয়া এক অর্ধকল্প অর্থাৎ এক হাজার মহাযুগ পর্যন্ত চলতে থাকে। একহাজার মহাযুগ পরে যখন জাগতিক বস্তু ও ঘটনাবলী ধ্বংস হয় তখন ছোট খাট দেবতাদেরও মৃত্যু ঘটে। এ সময় ব্রহ্মা জীবিত থাকেন। এ পর্যায়ের ধ্বংসকে প্রলয় বলে অভিহিত করা হয়। কিছুকাল বিরতির পর জগতের আবার সৃষ্টি হয়। দেবতাদেরও সৃষ্টি হয় এবং জগতের লয় প্রক্রিয়াও চলতে থাকে।

ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হলে জগতের আবার একটি ধ্বংস হয়। ব্রহ্মার পরমায়ু হচ্ছে এক শত দেব বছর। ব্রহ্মার শত বর্ষ পূর্ণ হলে জগতের সবকিছুর সাথে ব্রহ্মার নিজেরও ধ্বংস হয়, কোন দেবতা, দুষ্টশক্তি কোন কিছুরই তখন অস্তিত্ব থাকে না। এ ধ্বংসকে মহাপ্রলয় বলে অভিহিত করা হয়। কিছুকাল পরে আবার নতুন জগৎ, দেবতা ও নতুন ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়।

এভাবে জগতের সৃষ্টি, লয়, প্রলয় ও মহাপ্রলয় চক্রাকারে অন্তহীনভাবে ঘটতে থাকে। জগতের ধ্বংস হবে কিন্তু জগতের আর সৃষ্টি হবে না এমনটি কখনও ঘটে না। জগতের লয় আছে আবার সৃষ্টিও আছে। সৃষ্টি ও লয়, লয় ও সৃষ্টি চক্রাকারে ঘটতেই থাকবে। এ প্রক্রিয়ার কখনও শেষ হবে না।

পার্থিব জগৎ সম্পর্কে ইসলাম ঃ

জগৎ জীবনের উৎপত্তি, উপাদান, প্রকৃতি, ধ্বংস বা প্রলয় সম্পর্কে আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। মুহাম্মাদ (সঃ)ও তাঁর বাণীতে, উপমা-উদাহরণের সাহায্যে জগৎ জীবনের ধারণা দিয়েছেন। এ ছাড়া মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহও জগৎ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। জগতের সৃষ্টি ঃ

৪ঃ১ । কুরআন ও হাদীসে সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ

কুরআন অনুযায়ী আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা । আল্লাহই সব কারণের কারণ । আল্লাহই একমাত্র চিরন্তন ও শাশ্বত সত্তা । ''তিনিই আদি এবং তিনিই অন্ত, তিনিহ প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত ।''[৩৭] তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী । তিনি তাঁর ইচ্ছার দ্বারা এ নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেছেন । ''তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক । যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদন করতে চান, তখন এ কথা বলেন, 'কুন' — হয়ে যাও 'ফাইয়াকুন' — তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায় ।''[৩৮] এককথায় জগৎ হচ্ছে আল্লাহর ঐচ্ছিক প্রকাশ । আর তাঁর ইচ্ছাই সমস্ত কার্য কারণের মূল ।

আল্লাহ জগতের উপাদান কারণ নয় । আবার এমন নয় যে আল্লাহ পূর্বঃস্থিত উপাদান থেকে জগতকে সৃষ্টি করেছেন বা তিনি বিক্ষিপ্ত কোন আকারহীন বস্তুকে আকার দিয়েছেন । বরং আল্লাহ শূণ্য হতে জগতকে সৃষ্টি করেছেন । তিনি শূণ্য হতে জগৎ এবং জাগতিক বস্তুরাজি অস্তিত্বে এনেছেন । আর এ সৃষ্টি তিনি সম্পন্ন করেছেন স্বীয় শক্তি দিয়ে । তিনি বলেন, ''আমি স্বীয় শক্তি দিয়ে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক শক্তিশালী । আমি পৃথিবীকে বিছিয়েছি, আমি কত সুন্দরভাবেইনা বিছাতে সক্ষম ।''[৩৯] আল্লাহর কোন কিছু করার ইচ্ছা হলেই তা সৃষ্টি হয়ে যায় । তাঁর ইচ্ছার মধ্যে এমন শক্তি নিহিত থাকে, যা ঐ বস্তু সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত হয় । তাঁর ইচ্ছার মধ্যে মূলত তাঁর অসীম শক্তিই কার্যকর হয় ।

বিজ্ঞানও আজ এ কথা বলে যে, শক্তি হতেই জগতের উদ্ভব । এক প্রচণ্ড শক্তির মহাবিস্ফোরণে জগতের উদ্ভব হয়েছে । এ মতকে আমরা 'মহাবিস্ফোরণতত্ত্ব' বলে জানি । এ তত্ত্ব অনুসারে আদি অগ্নি গোলক বা 'Primordial fire-ball' এ শক্তিপুঞ্জের সমাবেশের ফলে যে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয় তা হতেই জগতের অস্তিত্বের সূচনা হয় । কিন্তু এই আদি গোলক কোত্থেকে এল ? ডেভিড আতকাজ (David Atkaz) এবং হেইনজ প্যাজেল (Heinz Pazel) বলেন, ''বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কেবল হতাশার বাণী শোনায় এবং বলে এটা এমন প্রশ্ন যার উত্তর আমাদের জানা নেই ।''[৪০] কেউ কেউ এ হতাশার বিষয়টিকে এক অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকারের মাধ্যমে বোধগম্য করার প্রয়াস পেয়েছেন । যেমন জন গ্রিবিন (John Gribbin) তাঁর *To the Edge of Eternity* গ্রন্থে বলেন — ''এ সূচনার পশ্চাতে ঈশ্বরকে ধরে নিয়েই কেবল এর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব ।''[৪১] 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' অনুযায়ী এক মহাবিস্ফোরণের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সাথে সৃষ্টির সূচণা হয় । শূণ্য সময় আকস্মিকভাবেই এই বিস্ফোরণ ঘটে । এই বিস্ফোরণের আগে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না । তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের দ্বারা দু'টো সত্য প্রকাশিত হয়েছে । (১) আদি বস্তু মূলতঃ শূণ্য হতে সৃষ্টি হয়েছে, (২) শূণ্য হতে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা অতীন্দ্রিয় কোন মহাশক্তিশালী মহাবিজ্ঞতাকে কারণস্থলে দাঁড় করিয়েই কেবল সম্ভবপর ।[৪২]

শক্তিকে পদার্থ হিসেবে রূপান্তর সম্ভব —— এটা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে । এটা প্রমাণিত হয়েছে গামা রশ্মি থেকে পজিট্রণ-ইলেকট্রণ জোড় উৎপত্তির ঘটনায় । আলো, এক্স-রে ইত্যাদির ন্যায় গামা রশ্মি এক ধরনের শক্তি । পদার্থের সঙ্গে গামা রশ্মির সংঘাত ঘটিয়ে দেখা গিয়েছে যে, গামা রশ্মির শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে, আর একই সাথে ইলেক্ট্রণ-পজিট্রণের জোড় জন্ম নিয়েছে । এ ছাড়া শক্তি হতে প্রোট্রণ, এন্টিপ্রোটন, ডয়টেরণ-এন্টি ডয়টেরণ জোড় উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে । অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শক্তি হতে বস্তুর উদ্ভব সম্ভব । আর এ কারণেই কুরআনের ঘোষণা —— ''আমি শক্তি দিয়ে আকাশ নির্মাণ করেছি . . .''(৫১ ঃ ৪৭ - ৪৮) যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক হওয়ার দাবি রাখে । কুরআনের দাবি হচ্ছে বস্তুগত অস্তিত্ব হিসেবে শূণ্য এবং শক্তিগত অস্তিত্ব হিসেবে বিপুল শক্তি হতে জগতের উদ্ভব । ''তিনি ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান ।''[৪৩] তিনি শূণ্য হতে তাঁর শক্তি দিয়ে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন । তিনি পরাক্রমশালী ও শক্তিমান । এ জগতের সবকিছুর স্রষ্টা তিনি কিন্তু তাঁর কোন স্রষ্টা নেই ।[৪৪] তিনি জগতের কারণ, কিন্তু তিনি কোন কারণের কার্য নয় ।

আল্লাহ এ বিশাল জগৎ ৬টি পর্যায়কালে সৃষ্টি করেছেন । ''তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এই উভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ৬টি পর্যায়কালে বা দিবসে সৃষ্টি করেছেন ।''[৪৫] উল্লেখ্য যে, কোন কোন হাদীসে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং উভয়ের মধ্যবর্তী আসবাবনিচয়ের সৃষ্টি ৭দিনে বা পর্যায়কালে করা হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে ।[৪৬] এসব বর্ণনাকে ইবনে কাসীর, মাযহারী, প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে গরীব (দুর্বল সূত্র পরম্পরা) ও ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বলে অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং কুরআনের বক্তব্যকেই নিশ্চিত ও অকাট্য বলে প্রচার করা হয়েছে ।

আল্লাহ এ বিশাল জগৎ এবং এর বস্তুনিচয়কে বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্টি করেছেন । ''আর আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি ।''[৪৭] ''আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন ।''[৪৮] এভাবে বিভিন্ন উপাদানে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হলেও সকল বস্তুর পশ্চাতে রয়েছে নূরে মুহাম্মদী । হাদীস শরীফে আছে যে, ''. . . অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নূরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন . . . অতঃপর আল্লাহ তা'লা সে নূরে মুহাম্মদী (সঃ)

Dhaka University Institutional Repository

এর দিকে তাকালেন । ফলে সে নূর লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে যায় । সর্ব শরীর হতে অজস্র ঘাম বের হয় । অতঃপর আল্লাহ তার মাথার ঘাম হতে ফেরেশতা জাতিকে সৃষ্টি করেন এবং তার চেহারার ঘাম হতে আরশ, কুরছী, লৌহ, কলম, চন্দ্র, সূর্য, পর্দা, নক্ষত্ররাজি এবং আকাশে যতকিছু আছে তা সৃষ্টি করেন । . . . আর উভয় পায়ের ঘাম হতে সৃষ্টি করেছেন পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত ভূমন্ডল ও এতে অবস্থিত সবকিছু ।''[৪৯] হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সব বস্তুর আদি উপাদান হচ্ছে নূর । মুহাম্মদ (সঃ)র নূর ।

৪ঃ২। মুসলিম দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ

মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনে জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে । বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দার্শনিকের ব্যাখ্যায় ভিন্নতা রয়েছে । এ সব সম্প্রদায় ও দর্শন অনেক সময় কুরআন ও হাদীসের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়েছে । আবার কোন কোন সম্প্রদায় গ্রীক দর্শনের বিশেষ করে এরিস্টটলের দর্শনের সাথে কুরআনের মতের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছে ।

এ প্রসঙ্গে মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যায় । মু'তাজিলারা কুরআনের সঙ্গে এরিস্টটলীয় মতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন । তাঁদের মতে, জগৎ অনন্ত ও সৃষ্ট উভয় । অনন্তকাল ধরে জগৎ সারসত্তা (Essence) হিসেবে অপূর্ণ অবস্থায় ছিল । এক সময়ে আল্লাহ যখন তাতে গতি সঞ্চালন করেন, তখন তাতে দেহ ও প্রাণের উদ্ভব ঘটে । কুরআনে যখন সৃষ্টির কথা বলা হয়, তখন সেই অনাদি স্থবির সারসত্তায় গতিসঞ্চালনের কথাই বলা হয় । আবার যখন এরিস্টটলের মতে জগতের অনাদিত্বের কথা বলা হয়, তখন আল্লাহ কর্তৃক গতিসঞ্চালনের পূর্ববর্তী অবস্থারই নির্দেশ করা হয় । সুতরাং কুরআন ও এরিস্টটল উভয়ের বক্তব্যই সঠিক, দু'টিই একই জগৎ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের নির্দেশক ।[৫০]

ফালাসিফা সম্প্রদায় বিশেষ করে আল ফারাবি (৮৭০-৯৫০), ইবনে সিনা (৯০০-১০৩৭) প্রমুখ মনে করেন যে, বিশ্বজগৎ একটি ক্রমধারায় নির্গত হয়েছে । তাঁদের মতে, জগতের সৃষ্টি একটি অনন্ত বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া । আল্লাহ নিজের সৃজনী শক্তি সম্পর্কে চিন্তা করে প্রথম চিদাত্মা বা বিশ্বাত্মা সৃষ্টি করেন । এই বিশ্বাত্মাই বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের কারণ । বিশ্বাত্মা নিজের কারণ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে সৃষ্টি করলো এমন এক তৃতীয় চিদাত্মার যা গোটা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পরিচালক । এই তৃতীয় চিদাত্মা স্বীয় কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে সৃষ্টি হয় আত্মা । এ ভাবে সৃষ্টি প্রক্রিয়া জড়জগৎ পর্যন্ত চলতে থাকে । এবং জগতের সব কিছু কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ । প্রতিটা ঘটনার পশ্চাতে

Dhaka University Institutional Repository

কোন না কোন কারণ রয়েছে। অনিবার্যভাবেই কারণ থেকে কার্য উদ্ভূত হয়। তবে আদি কারণ হচ্ছে আল্লাহ। আল্লাহ অনিবার্য সত্তা এবং তাঁর কোন কারণ নেই।

ইমাম গাযালী (১০৫৮-১১১১) তাঁর '*তহাফুতুল ফালাসিফা*' গ্রন্থে মু'তাজিলা ও দার্শনিকদের উক্ত মত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুসলিম দার্শনিকেরা মূলত এরিস্টটলের মতকে গ্রহণ করেছেন। এরিস্টটল পরমাত্মা বা আল্লাহকে চিন্তন হিসেবে দেখেছেন, যিনি নিজের সম্বন্ধে নিজেই চিন্তা করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন চিন্তার চিন্তা। আল কুরআন 'আল্লাহর চিন্তা থেকে জগতের সৃষ্টি' এ মতকে অনুমোদন করে না। বরং জগৎ হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছার পরিণতি। তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেনঃ 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।[৫১] কুরআনের এ ভাবধারাটি আশারিয়া সম্প্রদায় গ্রহণ করেছে। এ সম্প্রদায় মনে করে যে, জগৎ আল্লাহর ইচ্ছার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। আর জগতের উপাদান হচ্ছে পরমাণু। আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে নতুন পরমাণু সৃষ্টি করেন। এতে জগতে রূপান্তর সাধিত হয়। তবে আল্লাহ জাগতিক ঘটনাকে বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করেন না। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তিনি জগতকে উপস্থাপন করেন। ফলে প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা নীতির উদ্ভব ঘটে। আর কার্যকারণ ঘটনার পারম্পর্য বৈ কিছু নয়। দার্শনিকদের বিরোধিতা করে ইমাম গাযালী বলেন ঃ কার্যকারণের মধ্যে কোন বাধ্যতামূলক অনিবার্য সম্পর্ক নেই।[৫২] অগ্নির দহন, পানির তৃষ্ণা নিবারণ ইত্যাদি অনিবার্য নয়। বরং আল্লাহর ইচ্ছার উপরই এদের ক্রিয়া নির্ভরশীল। আমি বললাম ঃ ''হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।''[৫৩] অগ্নি, শীতল ও নিরাপদ হয়ে গেল। ''আমি ইচ্ছা করলে তাকে [পানিকে] লোহা করে দিতে পারি।''[৫৪] সুতরাং কারণ-কার্য সম্পর্ক অনিবার্য নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছা কার্য সৃষ্টির আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত কারণ।

৫। জগতের প্রকৃতি ঃ

৫ঃ১। জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআন ঃ

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের মধ্যে পরকাল অন্যতম। পরকালের পূর্ব স্তর হিসেবে এ পার্থিব জগতে মানুষকে কালাতিপাত করতে হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই এ জগতের প্রকৃতি, স্থায়িত্ব, সীমা প্রভৃতি সম্বন্ধে তার মনে প্রশ্ন জাগে। কুরআন এবং হাদীসে এ সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিশাল জগৎ সৃষ্ট, আল্লাহ এ জগতকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এ জগতের স্বয়ম্ভূতা নেই। জগৎ তার অস্তিত্বের জন্য অন্য সত্তার উপর নির্ভরশীল। ''আমরা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এই উভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু যথাযথভাবে এবং নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি।''[৫৫] এর সৃষ্টি কর্তা নির্দিষ্ট সময় পরে এর ধ্বংস সাধন করবেন। ''কুল্লু শাইয়িন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাহু'' অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংস বা নিঃশেষ হয়ে যাবে।[৫৬]

আল্লাহ এ জগতকে বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত করেছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রয়েছে সাতটি স্তর। ''আল্লাহ সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।''[৫৭] এখন সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী কোথায়-কীভাবে আছে, উপরে নীচে স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক আকাশ বা পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে, আবার একটি অপরটির চেয়ে ছোট বড় কি-না ইত্যাদি ব্যাপারে কুরআন নিরব। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে হয়ত এ সপ্ত স্তর ব্যাখ্যাত হয়ে থাকবে।

কোন বস্তু নির্মাণের পশ্চাতে নির্মাতার যেমন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে, ঠিক তেমনি এ জগৎ সৃষ্টির পশ্চাতে সৃষ্টি কর্তার উদ্দেশ্য রয়েছে। ''আমি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি ; আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি।''[৫৮] এখানে কুরআন যন্ত্রবাদের (Mechanism) বিরোধিতা করে। যন্ত্রবাদ যেখানে জগতের পশ্চাতে কোন বুদ্ধিমান কর্তাকে অস্বীকার করে, কুরআন সেখানে এক বুদ্ধিমান কর্তা ও চেতন শক্তিকে স্বীকার করে। যন্ত্রবাদ যেখানে জড়, শক্তি, গতি, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, কার্য-কারণ, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতির সাহায্যে জাগতিক ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করে, কুরআন সেখানে এক বুদ্ধিময় ও অধ্যাত্মশক্তির পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে।

এ বিশ্ব জগৎ স্থির না চলমান, জগৎ আকার-আয়তনের দিক থেকে আদিতে যে রকম ছিল আজ সে রকম আছে কি-না, এর পরিণতি কী ইত্যাদি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিভিন্ন সময়ে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বিশ দশক পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ জগৎ স্থির বলেই মনে করতেন। আবার ১৯৪৮ সালে থমাস গোল্ড, হরম্যান বন্ডি প্রমুখের প্রস্তাবিত 'স্টেডি স্টেট তত্ত্বে' দাবি করা হয় যে, এ জগতের কোন আরম্ভ নেই। এ জগৎ অনাদিকাল হতে অস্তিত্ববান থেকে আসছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে এর আকৃতি-আয়তনে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভের পর 'স্টেডি স্টেট তত্ত্ব' প্রত্যাখ্যাত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এক মহাবিস্ফোরণের ফলে বিশ্বজগতের উদ্ভব এবং তখন থেকে জগৎ প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এটা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মূল কথা। শূণ্য সময়ে যে আদি ক্ষুদে বিশ্বের জন্ম হয় তা ছিল সূক্ষ্মতর পরমাণুর মধ্যস্থিত সূক্ষ্মতম প্রোটণ কণার চেয়ে শত সহস্র মহাপদ্ম গুণ ক্ষুদ্র। এ সময় বিশ্বের ব্যাস ছিল 10^{-33}cm, মতান্তরে 10^{-28}cm, অস্তিত্ববান হতে সময় লেগেছিল 10^{-43}sec, এবং এ সময় সৃষ্টি হয়েছিল প্রচন্ড উত্তাপ যার পরিমাপ ছিল 10^{32}k বা ১০,০০০ কোটি কোটি কোটি কোটি ডিগ্রী কেলভিন।[৫৯] এ সময় থেকেই সম্প্রসারণ শুরু হয়। এবং সম্প্রসারণ অনবরত চলমান রয়েছে। কুরআন এ সম্প্রসারণের কথা ব্যক্ত করেছে এভাবে ঃ ''আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি শক্তি বলে ; আমি উহাকে সম্প্রসারিত করতেছি।''[৬০] এ সম্প্রসারণের গতিবেগ খুবই প্রবল। এ গতি এতই দ্রুত যে তা দেখা যায় না। ''(তাদের শপথ) যারা প্রবাহমান হয় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়।''[৬১] প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ইডুইন হাবেল এ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। তিনি ১৯২৯ সালে বর্ণালীবীক্ষণের (Spectroscopy) সাহায্যে কয়েকটি গ্যালাক্সির ''রেড ও ব্লু শিফট'' পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখতে পেলেন যে, প্রত্যেক দূরবর্তী গ্যালাক্সি অপ্রত্যাশিতভাবে রেড শিফট প্রদর্শন করে যাচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে দূরবর্তী অঞ্চলের দিকে গ্যালাক্সিসমূহ ক্রমাগত সরে যাচ্ছে। তিনি আরো দেখতে পেলেন যে, অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী গ্যালাক্সি অধিকতর দ্রুতগতির সাথে উড়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কিত হাবেলের তত্ত্বটি 'হাবেলের আইন' (Habble's Law) নামে পরিচিত। এ আইনটির মূল কথা হলোঃ ''যত দূরে সরে যায়, গ্যালাক্সি গুলোর গতি ততই বৃদ্ধি পায়।'' হাবেল দেখান যে, ১ মেগাপারসেক দূরত্বের (৩.২৬ মিলিয়ন আলোক বর্ষ) পর প্রতি সেকেন্ডে গ্যালাক্সিসমূহের গতিবেগ ৫০ মাইল হারে বৃদ্ধি পায়। সে সূত্র ধরে ২,৭০০ মিলিয়ন আলোক বছর দূরের কোন গ্যালাক্সি প্রতি সেকেন্ডে ৪৫,০০০ মাইল গতিতে ছুটে চলে। 3c-295 গ্যালাক্সিটি প্রতি মুহূর্তে ৯০,০০০ মাইল গতিতে সরে যাচ্ছে।[৬২] এ ভাবে মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত প্রবাহমান হয় এবং অদৃশ্য হয়।

আল্লাহ এ বিশ্বজগতের সৃষ্টি, বিকাশ, প্রবাহমানতা ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট আকার, সঠিক পরিমাপ ও ধর্ম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণেই বিশ্বের গতি প্রকৃতি সুশৃংখলভাবে বজায় থাকে। ''আল্লাহ আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন যথাযথ পরিমাপে সঠিক অনুপাতে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।''[৬৩] জগতের বিকাশের সঠিকতাকে অনেক বিজ্ঞানী তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেছেন। স্টিফেন হকিং তাঁর বিখ্যাত "*A Brief History of Time*" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, আদি অগ্নি গোলকের সম্প্রসারণ যদি অযুত কোটি ভাগের একভাগ বেশি হত, তবে মহাবিশ্বের সমুদয় বস্তু এতদিনে অদৃশ্য হয়ে যেত। আর বৃহৎ বিস্ফোরণের এক সেকেন্ড পর যদি

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রসারণের হার এক লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়ন (১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০) ভাগও কম হোত তাহলে মহাবিশ্ব বর্তমান আয়তনে পৌছানোর আগেই চুপসে যেত।[৬৪]

আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বিশ্বজগতে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অগ্নি, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ, ফল, শস্য, বাগান, সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়-পর্বত, দিন-রাত্রি প্রভৃতিতে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে।[৬৫] এ জগৎ আল্লাহর প্রকাশ। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে রয়েছে আল্লাহর নূর বা জ্যোতি।[৬৬] অতএব জগৎ, জড়, প্রকৃতি, বস্তু, ব্যক্তি বা চেতন শক্তি প্রভৃতিতে আল কুরআন আধ্যাত্মিকতা দাবি করে।

৫ঃ২। মুসলিম দর্শনে জগতের প্রকৃতি ঃ

মুসলিম দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। মুতাজিলাদের মতে, জগৎ অনন্ত ও সৃষ্ট উভয়ই। এদের ন্যায় ফালাসিফা সম্প্রদায় বিশেষ করে আল ফারাবী, ইবনে সিনা প্রমুখ জগতকে চিরন্তন ও সৃষ্ট মনে করেন। ইমাম গাযালী তাঁর *তহাফুতুল ফালাসিফা* গ্রন্থে মু'তাজিলা ও দার্শনিকদের উক্ত মত অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গতভাবে খন্ডন করেছেন। উক্ত মতের একটি সহজ উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, জগৎ সৃষ্ট ও চিরন্তন বা অনাদি এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ চিরন্তন ও সৃষ্টির ধারণা হচ্ছে স্ববিরোধী ধারণা। 'এখন বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে এবং হচ্ছে না'—এ বচনটি বিরোধ নিয়মে (Law of Contradiction) যেভাবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, তেমনিভাবে যা চিরন্তন, যা শাশ্বত তাকে আবার সৃষ্ট বলা ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

জগৎ সম্পর্কে দার্শনিকদের কুরআন বিরোধী আরেকটি বক্তব্য হচ্ছে যে, জগতের ঘটনাবলী অনিবার্যভাবে কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আজ যে ঘটনাকে কোন কারণ হতে সৃষ্টি হতে দেখা যায় ভবিষ্যতে সে কারণ হতে অনুরূপ কার্য অনিবার্যভাবে উৎপন্ন হতে দেখা যাবে। কুরআন এ মত স্বীকার করে না। কুরআন মতে আল্লাহ যে কোন ঘটনায় যে কোন ব্যতিক্রম সাধন করতে সক্ষম। আল্লাহর আদেশেই কার্য সম্পাদিত হয়। ইমাম গাযালী এবং ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) কার্যকারণ সম্পর্কের অনিবার্যতা অস্বীকার করেন। কার্য-কারণের অনিবার্য সম্পর্কের ধারণাকে তাঁরা মনস্তাত্ত্বিক বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য তাঁদের যুক্তি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

আশারিয়াদের মতে, জগৎ আল্লাহর ইচ্ছার প্রকাশ। তাই এ জগৎ নিশ্চল ও চিরন্তন নয়, বরং জগৎ পরিবর্তন ও ধ্বংসের অধীন। প্রতি মুহূর্তে নিত্যনতুন পরমাণুর জন্ম হচ্ছে। ফলে বস্তুর মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

সাধিত হচ্ছে। আর এ পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। আল্লাহ যখন যেভাবে খুশি, সেভাবে এ জগতে পরমাণুর মধ্যে পরিবর্তন ঘটান। সূফী দর্শনে জগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে এ বিষয়ে সূফীরা একমত যে, জগৎ অবাস্তব এবং জগৎ হচ্ছে একটি অধ্যাস। একমাত্র আল্লাহরই বাস্তব সত্তা রয়েছে এবং অস্তিত্ব বলতে একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বকেই বুঝায়। জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। এখানে সূফীদের সাথে দার্শনিক ইকবালের মতের বিরোধিতা রয়েছে। আল্লামা ইকবাল জগতকে অনস্তিত্ব, অবাস্তব ও অধ্যাস মনে করেন না। তাঁর মতে, জগতের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে।[৬৭] বাহ্য জগতের সত্তা সম্পর্কে সূফীদের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথাঃ ক) ইজালিয়া খ) শুহুদিয়া এবং গ) ওজুদিয়া সম্প্রদায়। ইজালিয়া মতবাদ অনুসারে বাহ্য জগতের সত্তা আল্লাহর সত্তা বহির্ভূত বা আল্লাহ থেকে ভিন্ন। তবে বাহ্য জগতের সত্তা আল্লাহর সত্তা হতেই উদ্ভূত হয়েছে। আবার, পরিসমাপ্তিতে এ জগৎ আল্লাহর সত্তায় মিলে যাবে। শুহুদিয়া মতবাদ অনুসারে আল্লাহ মূল সত্তা আর জগৎ তাঁর প্রতিচ্ছবি বা অবভাস। জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এ মতবাদ আল্লাহ ও জগতের দ্বৈততা প্রচার করে। একজন মরমী সাধক সাধনার উচ্চতর স্তরে এ দ্বৈততা উপলব্ধি করেন। এ মতবাদের প্রবর্তক মুজাদ্দিদ আলফেসানী শায়খ আহমাদ শিরহিন্দী (১৫৬৩-১৬২৪) মনে করেন, মরমী অভিজ্ঞতার প্রথম স্তরে আল্লাহ ও জগতকে অভিন্ন বলে ভুল হতে পারে। তাঁর মতে, ওয়াহদাতুল ওজুদ মতবাদ এ ভুলটি প্রচার করে থাকে। ওজুদিয়া মতবাদ অনুসারে আল্লাহ একমাত্র প্রকৃত সত্তা, বিশ্বজগৎ তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রকাশ। আল্লাহ ও জগতের মধ্যে কোন ভেদ নেই। আল্লাহ ও জগৎ অভিন্ন। এ মতবাদ অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ নামে পরিচিত। স্পেনের বিখ্যাত সূফী দার্শনিক ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪৩) এ মতবাদের প্রবর্তক। শুহুদিয়া ও ওজুদিয়া মতবাদে আল্লাহ ও জগতের মধ্যে দ্বৈততা ও অদ্বৈতার যে বিরোধ, তা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (১৫৯২-১৬৫৮) "*ফায়সালাতু ওয়াহদাতুল ওজুদ ওয়া ওয়াহদাতুশ শুহুদ*" গ্রন্থে নিরসনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে এ দু'টি মতবাদ একই সত্যের দু'টি দিকের প্রকাশ করে। তিনি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। মোমদিয়া একটি ঘোড়া, গাধা ও মানুষ তৈরী করা হল। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই মোম আছে। এই দিক দিয়ে তারা অভিন্ন। কিন্তু তাদের আকৃতি এক একটির একেক রকম। তাই তারা ভিন্ন। অর্থাৎ আল্লাহ ও জগৎ সত্তাগতভাবে অভিন্ন, আকৃতিগত দিক থেকে ভিন্ন। এ উদাহরণটির একটি দুর্বলতা রয়েছে। এটা আল্লাহ ও জগতকে উপাদানগতভাবে অভিন্ন হওয়ার দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ ও জগতের মধ্যে পার্থক্য আছে। শিল্পী ও তার শিল্পকর্মের মধ্যে ভিন্নতা আছে। যদিও শিল্পকর্মের মধ্যে শিল্পী তাঁর ছাঁপ বা নিদর্শন বা তার অন্তর অবস্থার প্রকাশ ঘটাতে পারেন। শিল্পকর্মের মধ্যে শিল্পীকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, তাঁর নিপুণতা ধরা পড়তে

Dhaka University Institutional Repository

পারে, ভক্ত এর মধ্যে অভিন্নতা খুঁজে পেলেও বিষয় দু'টিই । শিল্পীর তুলিতে শিল্পকর্ম জন্ম নেয়ার পর সেখানে দুটো বস্তুরই অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায় ঃ নির্মাতা ও নির্মিত বস্তু । অতএব, স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টবস্তু হিসেবে জগৎ দু'টো ভিন্ন সত্তা ।

৬। কিয়ামত (মহাপ্রলয়) ঃ

এ জগৎ শূণ্য হতে সৃষ্টি হয়ে নিতান্ত ক্ষুদ্রতর অবস্থা হতে সম্প্রসারিত হয়ে এ বিশালাকৃতি লাভ করেছে । এ বিশ্ব আজও সম্প্রসারিত হচ্ছে । কিন্তু একদিন এ জগৎ এবং তার মধ্যস্থিত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, বিশাল আকাশ ধ্বংস হয়ে যাবে । ভূমণ্ডল অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে । তেজোদীপ্ত সূর্য, জ্যোতির্ময় চন্দ্র ম্লান হয়ে যাবে । সুদৃঢ় পর্বতরাজি, প্রবাহমান মহাসমুদ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । মানুষ হারাবে তার জৈবিক ও বৌদ্ধিক অস্তিত্ব । বৃহদ্ভম প্রাণী থেকে ক্ষুদ্রতম কীট পর্যন্ত বিলীন হয়ে যাবে । সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে আল্লাহর ইচ্ছায় । কেবল আল্লাহর সত্তা অবশিষ্ট থাকবে ।[৩৮] কুরআনে এ ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা রয়েছে । কুরআন এ ধ্বংসযজ্ঞকে 'কিয়ামত' বলে অভিহিত করেছে । কিয়ামত বা ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে নিম্নে কুরআনের কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হলোঃ

''সে দিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র ।'' (২১ঃ ১০৮)

''সে দিন আকাশ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা চলমান হবে ।'' (৫২ঃ ৯-১০)

''সে দিন আকাশ হবে গলিত তামার মত এবং পর্বতসমূহ হবে রঙিন পশমের মত''। (৭০ঃ ৯-১০)

''চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে ।'' (৭৫ঃ৮-৯)

''এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত ।'' (১০১ঃ৫)

''যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে একটিমাত্র ফুৎকার । এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে । সে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে ।'' ৬৯ঃ১৩-১৫)

কিয়ামত শুরু হওয়ার পর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ধ্বংস হতে থাকবে, মানুষ নিদারুণ কষ্ট ক্লেশের সম্মুখীন হবে । পরিশেষে মানুষেরও বিলুপ্তি ঘটবে । এ অবস্থা কুরআনে বিবৃত হয়েছে এভাবে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

''হে লোক সকল ঃ তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর । কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার । যে দিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সে দিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল ।'' (২২ঃ ১-২)

''যে দিন বালককে বৃদ্ধে পরিণত করবে ।'' (৭৩ঃ১৭)

''তখন তারা ওছিয়ত করতেও সক্ষম হবে না । এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না ।'' [যে যেখানে থাকবে সেখানেই তার মৃত্যু হবে] (৩৬ঃ ৫০)

ইবনে আরাবীর মতে, শিঙ্গায় তিনটি ফুৎকার দেয়া হবে । প্রথম ফুৎকার হবে ত্রাসের ফুৎকার । এ ফুৎকারে আকাশ ও পৃথিবীর ভাঙন শুরু হবে এবং সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে । দ্বিতীয় ফুৎকার হবে বজ্রের ফুৎকার । এ ফুৎকারে অন্যান্য সবকিছুর সাথে মানুষ মারা যাবে এবং এ বিশ্ব সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । তৃতীয় ফুৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুৎকার । এতে মৃত মানুষেরা জীবিত হয়ে উত্থিত হবে ।[৬৯]

আল কুরআনে কিয়ামত দিবসের স্থায়িত্ব কাল সম্পর্কে এক আয়াতে এক হাজার বছর (৩২ঃ৫) এবং অন্য আরেক আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছর (৭০ঃ৪) বলে উল্লেখ করা হয়েছে । তাফসীরবিদদের মতে, এ আয়াত দ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । মূলত কিয়ামত দিবসের স্থায়িত্ব আপেক্ষিক হবে । কাফেরদের নিকট ঐদিন কঠোরতা ও ভয়াবহতার কারণে খুবই দীর্ঘ মনে হবে । আর মুমিনদের নিকট কাফেরদের চেয়ে কম দীর্ঘ মনে হবে । হযরত আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, সাহাবারা মুহাম্মাদ (সঃ)কে কেয়ামত দিবসের স্থায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ ''আমার প্রাণ যে সত্তার করায়ত্ত, তাঁর শপথ করে বলছি ঐ দিনটির স্থায়িত্ব মুমিনের জন্য একটি ফরয নামাজ পড়ার চেয়েও কম হবে ।''[৭০]

কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে — এ ব্যাপারে আল কুরআন নির্দিষ্ট কোন সময়ের উল্লেখ করেনি । এ বিষয়টি সম্পর্কে কেবল আল্লাহর জ্ঞান রয়েছে । ''এর জ্ঞানতো আপনার পালনকর্তার নিকটই রয়েছে । তিনি তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে । নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয় । তোমাদের অজান্তেই তা উপস্থিত হবে ।''[৭১] কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একটি হাদীসে বলেন ঃ ''মানুষ নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকবে । বিক্রেতা ক্রেতাকে কাপড়ের থান খুলে দেখাবে, ক্রেতা এ বিষয়টি সাব্যস্ত করতে পারবে না । এর

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে কিয়ামত এসে যাবে । এক লোক তার উটনীর দুধ দোহন করে নিয়ে যেতে থাকবে, কিন্তু তা ব্যবহার করতে পারবে না এর মধ্যেই কিয়ামত এসে যাবে । কেউ নিজের ঘর মেরামত করতে থাকবে, তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত এসে যাবে । কেউ খাবার লোকমা হাতে তুলে নিবে, তা মুখে দেবার পূর্বেই কিয়ামত এসে যাবে ।'' (বুখারী ও মুসলিম) তবে কুরআন এবং হাদীসে কিয়ামতকে নিকটবর্তী বলে ঘোষণা করা হয়েছে । ''কিয়ামতের ব্যাপারটিতো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী ।''[৭২] ''কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে ।''[৭৩] চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে । তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এরূপ — আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, ''আমরা নবী (সঃ) এর সঙ্গে মিনায় অবস্থান করতে ছিলাম । এ সময় চন্দ্র বিদীর্ণ হলো এবং তার একটি টুকরা পর্বতের দিকে চলে গেল । নবী (সঃ) বললেন ঃ তোমরা দেখ এবং সাক্ষী থাক ।''(বুখারী ও মুসলিম) হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)র আঙ্গুলের ইঙ্গিতে মো'জেযাস্বরূপ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে বলে ইসলামে বিশ্বাস রয়েছে ।

হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)ও কোন হাদীসে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন ক্ষণ সম্পর্কে কিছু বলেননি । এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁকেও আল্লাহ এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান প্রদান করেননি । তবে কিয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি তাঁর সামনে প্রকাশ করা অস্বাভাবিক নয় । এ লক্ষণ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) মন্তব্য করেছেন যে, ''আমার আবির্ভাব এবং কিয়ামত এমনভাবে মিশে আছে । যেমন মিশে থাকে হাতের দু'টি আঙ্গুল ।''(তিরমিযী)

এক কথায় ইসলামের বিশ্বাস হচ্ছে কিয়ামত আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হবে । সে দিন জগতের সব কিছু বিলীন হয়ে যাবে । এবং আল্লাহ এ জগতের অবসান ঘটিয়ে আরেকটি জগতের উন্মোচন ঘটাবেন ।

৭। হিন্দু ধর্মে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য ঃ

যদি বলা হয় যে, হিন্দু ধর্মে একাধিক পার্থিব জীবন যাপন করতে হয়, তাহলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না । এ ধর্ম মতে, যারা মোক্ষ অর্জন করতে সক্ষম হয় না, তাদের কাম-তাড়িত কাজের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয় । এ জন্মে মোক্ষ লাভের পুনঃচেষ্টা চলে, অর্জিত না হলে সে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে । এভাবে সে একাধিক পার্থিব জীবনের সম্মুখ হয়ে পড়ে । আর বার বার পার্থিব জীবনে দুঃখ, ক্লেশ, তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে গ্রহণ করতে হয় । আর মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম হলে তাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না, পার্থিব দুঃখ, কষ্ট-ক্লেশ থেকে সে নিস্তার লাভ করে, পরমাত্মায় সে লীন হয়ে যায়, উপভোগ করে পরম সুখ । এ সুখ অর্জনের বা মোক্ষ লাভের

Dhaka University Institutional Repository

সাধনা করতে হয় পার্থিব জীবনে, ইহলৌকিক জগতে। তাই পার্থিব জগৎ ও জীবন মানুষের জন্য গভীর তাৎপর্য বহন করে।

হিন্দুধর্ম মানব জীবনের চারিটি মূল্য স্বীকার করে। অর্থ (সম্পদ), কাম (ভোগ), ধর্ম (সদ্‌গুণ) এবং মোক্ষ (মুক্তি)। মানুষের জৈবিক ও সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজন অর্থ। অর্থ ব্যতীত জীবিকা নির্বাহ করা এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব। তাই হিন্দুধর্ম অর্থকে মানবজীবনের একটি অন্যতম মূল্য হিসেবে স্বীকার করে। আবার দেহের রয়েছে নানারকম চাহিদা, দেহ তার উপযোগী বস্তু কামনা করে। ভোগের বস্তু তাকে তৃপ্তি দেয়। তাই হিন্দুধর্ম কাম বা ভোগকে স্বীকার করে। অর্থ উপার্জন হওয়া চাই পরিমিত, ভোগ হওয়া চাই সংযত। তাই হিন্দুধর্ম এসবের সাথে আদর্শ, সদ্‌গুণ বা ধর্মকে স্বীকার করে। জগৎ সংসারের দুঃখ-কষ্ট, বেদনা থেকে মুক্তির জন্য মানবের প্রাণান্তকর চেষ্টা চলে। এ চেষ্টাকে হিন্দুধর্ম খুবই মূল্যবান মনে করে। সাধনা দ্বারা জাগতিক দুঃখ ও পুনর্জন্ম থেকে যখন মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করা যায় তখন জীবনের লক্ষ অর্জিত হয়। মোক্ষ অর্জনকেই হিন্দুধর্ম জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ বলে বিবেচনা করে।

হিন্দুধর্মে মানুষকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাতা মানুষকে ঈশ্বরের মর্যাদায় আসীন করেন। নর-নারায়ণের (Man-God) ধারণা মানুষকে ঈশ্বরের সমতুল্য করে। শংকরাচার্য মানবাত্মাকে ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন মনে করেন। তাঁর এ মত মানুষকে ঈশ্বরের মর্যাদায় উপনীত করে। যাহ্যতঃ মানুষ ভৌত-রাসায়নিক অবকাঠামোর হলেও তার মধ্যে রয়েছে একটি আত্মা, এ আত্মা ব্রহ্মের অংশ বিশেষ। অতএব, মানুষ স্বভাবত ঐশী সত্তা সম্পন্ন।

এ সত্ত্বেও এ জগতে মানুষেব দুঃখের অন্ত নেই। জীবনটাই বিষাদময়। দুঃখ-কষ্ট, জরা মৃত্যু প্রভৃতি মানুষকে অষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। কিন্তু কেন এমন হয় ? বিভিন্ন গ্রন্থ এর নানা কারণ উল্লেখ করেছে। বেদ অনুসারে মানুষ নিজেই তার দুঃখের কারণ। তার অন্তস্থ কামনা, বাসনা, লোভ-লালসা, ক্রোধ ইত্যাদি তার দুঃখের কারণ।[৭৪] ভগবৎ গীতা অনুসারে অজ্ঞতা দুঃখের কারণ। জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বীয় আত্মা সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বীয় আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতা সম্পর্কে অজ্ঞতা তাবৎ দুঃখ, জরা ও পুনর্জন্মের কারণ। পার্থিব জীবনে দুঃখ একটি অবিচ্ছেদ্য ব্যাপাব উপনিষদ অন্যান্য শিক্ষার সাথে এটাও শিক্ষা দিয়ে থাকে। দুঃখ, দৈন্য, অসুস্থতা, ধ্বংস, ক্ষয়, মৃত্যু ইত্যাদি জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে। অবিদ্যাই এ দুঃখের কারণ। আত্মা এবং ব্রহ্মের মধ্যে ভিন্নতা নেই, এ বিদ্যা যার নেই, এ

Dhaka University Institutional Repository

উপলব্ধি ও অনুভব যার নেই, সে দুঃখে নিমজ্জিত থাকে । আর যে ব্রহ্মকে জানে, ব্রহ্মের সাথে আত্মার অভিন্নতা সম্পর্কে যার বিদ্যা বা উপলব্ধি আছে, সে দুঃখ-দৈন্য ও জাগতিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে ।

বৌদ্ধধর্মও জগৎ ও জীবনকে দুঃখময় বলে প্রচার করে । জগতে কেবল দুঃখ আর দুঃখ, দুঃখে জগৎ পরিপূর্ণ । গৌতম বুদ্ধের সাধনাই ছিল এ দুঃখ থেকে কি করে মানুষ মুক্তি অর্জন করতে পারে । গৌতম বুদ্ধের ন্যায় জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০)ও মনে করেন যে, জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ, জগতে দুঃখ ভিন্ন কিছু নেই । এঁরা উভয়েই মনে করেন এ দুঃখের কারণ মানুষের অন্তস্থ । শোপেনহাওয়ার মনে করেন, মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছাই তার দুঃখের কারণ । মহামতি বুদ্ধ মনে করেন মানুষের প্রবৃত্তিই তার দুঃখের কারণ । তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, শোপেনহাওয়ার মনে করেন দুঃখ থেকে মুক্তির আশা নিতান্তই একটি দুরাশা । কিন্তু বুদ্ধ মনে করেন যে, দুঃখ থেকে মুক্তি অর্জন করা সম্ভব । এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সথে হিন্দুধর্মের একটি পার্থক্য হচ্ছে যে, হিন্দুধর্ম ব্রহ্মের সাথে 'আত্মার অভিন্নতা' উপলব্ধির অভাবকে দুঃখের অন্যতম কারণ মনে করে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অভাবের প্রশ্ন তোলে না ।

জীবনে যেমন দুঃখ আছে, তেমন দুঃখ থেকে মুক্তিও আছে । এ মুক্তিতেই মানব জীবন সার্থক হয়ে ওঠে । হিন্দুধর্ম মতে, মানুষ তার সাধনার দ্বারা মুক্তি বা মোক্ষ অর্জন করতে সক্ষম হয় । এ সার্থকতা বা মুক্তি পরজীবনে নয়, ইহজীবনেই অর্জন করা সম্ভব । উপনিষদ একে 'জীবন্মুক্তি' বলে অভিহিত করেছে । 'এ পৃথিবীতে থেকেই আমরা আত্মাকে জানতে পারি । যদি না পারি, তবে আমাদের সত্তা বিনাশ ঘটে । যাঁরা আত্মাকে জানেন, তাঁরা অমর হন । কিন্তু অন্যরা দুঃখই পান ।''[৭৫] ''ব্রহ্মকে আত্মারূপে দর্শন করলে হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাজনিত অহংজ্ঞান) বিনষ্ট হয়ে সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়, ফলে দ্রষ্টার মোক্ষবিরোধী কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।''[৭৬] পার্থিব জীবনে সাধনার দ্বারা এ মুক্তি অর্জন করতে হয় । তাই হিন্দুধর্ম পার্থিব জীবনকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপন করে ।

৮। ইসলামে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য ঃ

মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা ও ধীশক্তি দিয়ে এ জগতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে । প্রকৃতির সব কিছুকেই সে নিজের কাজে লাগিয়ে যাচ্ছে । নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, পাহাড় , সাগর , ভূমণ্ডল এবং তার অন্তস্থ খনিজ সব কিছুই যেন মানুষের সেবা দাস । সাপের বিষকেও সে নিজের কল্যাণে ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছে । আল কুরআন এ

Dhaka University Institutional Repository

সত্যটিকে ধারণ করেছে এভাবে ঃ ''ওয়া খালাকা লাকুম মাফিল আরদি জামিয়া'' অর্থাৎ ভূমণ্ডলের সমস্ত কিছুকে তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এ জগতে মানুষের স্থায়ী হওয়ার উপায় নেই। তার স্রষ্টা তাকে এ জগৎ ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন। স্রষ্টা তার কিতাবে মানুষকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন ''কুল্লু নাফছিন জায়িকাতুল মাউত'' অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আবার হাদীসে কুদসীতে বলে দেয়া হয়েছে। ''ইন্নাদ্দুনিয়া খুলেকা লাকুম, ওয়া আনতুম খুলেকতুম লিল আখিরাহ'' অর্থাৎ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরজীবনের জন্য। তাই ইসলাম অনুসারে মানবের লক্ষ হচ্ছে পরজীবন। তাই বলে পার্থিব জীবন মানুষের নিকট তাৎপর্যহীন নয়। এ জগতের আবশ্যকীয় বিষয়াবলীকে গ্রহণ করে এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলীকে ত্যাগ করে তার পরজীবনকে সার্থক করতে হয়। তাই পার্থিব জীবন তার নিকট সংগ্রামের, নিয়মতান্ত্রিকতা ও শৃঙ্খলের।

জগতের সব কিছুতে আল্লাহর পরিকল্পনা রয়েছে। এ জগৎ আল্লাহ স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেছেন আবার এক সময় এর ধ্বংস সাধন করবেন। এ জগতের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কোন উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে চান। তাই প্রতিটা বস্তু সৃষ্টিতেই তাঁর উদ্দেশ্য রয়েছে। ''নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এই উভয়ের মধ্যে যা আছে তা আমি ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য সৃষ্টি করিনি।''[৭৭] এ জগৎ এবং তার বস্তুসমূহকে আল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। এ সবের মধ্য দিয়ে তিনি তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন করতে চান।

এ সত্ত্বেও পার্থিব জগতে ছলনা, প্রতারণা, মোহ ও লালসার নানা উপায়-উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। এ সব বস্তুতে মানুষের মোহগ্রস্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কুরআন বলছে ঃ ''মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু।''[৭৮] স্বীয় প্রবৃত্তি ও ভোগ্য বস্তু সম্বন্ধে মানুষের সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। জগতের স্রষ্টা স্বয়ং একে ছলনাময় বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, ''পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছু নয়। আর পার্থিব জীবনে প্রাচুর্য্যের প্রতিযোগিতাই মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।''[৭৯] কিন্তু কেন ? কেন আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট বস্তু জগতকে ছলনাময় করেছেন ? কেন এমন করে সৃষ্টি করেছেন যা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে ? এর মধ্যে স্রষ্টার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। এ উদ্দেশ্যের কথা কুরআন বিবৃত করেছে এভাবে ঃ ''আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পার্থিব জীবনের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি, যাতে মানবকুলকে পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে।''[৮০] ''পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও

Dhaka University Institutional Repository

জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ ?''[৮১] আল্লাহ পার্থিব জগতে ভাল ও মন্দ উভয় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে অসংখ্য বিকল্প। এবং এ বিকল্প থেকে পছন্দ, নির্বাচন ও কর্মের স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে। আর ইচ্ছা, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে বলেই মানুষকে তার কর্মের জন্য দায়ী করা চলে। পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করা যায়।

অতএব, ইসলাম মতে, পার্থিব জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষার স্থল। মুহাম্মাদ (সঃ) বলেন ঃ ''আদ্দুনিয়া মাজরি'আতুল আখিরাহ্''অর্থাৎ পার্থিব জীবন হচ্ছে পরজীবনের শস্যক্ষেত্র। মানুষ এ জীবনে যে রকম কর্ম করবে পরজীবনে সে রকম ফল ভোগ করবে। মানুষের কাজ হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বন করা। আল্লাহর আনুগত্য করার জন্যই মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৮২] পার্থিব জীবন এ আনুগত্যের পরীক্ষা ক্ষেত্র। এ আনুগত্যের সফলতা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে পরকালীন সুখ-দুঃখ। পরজীবনই প্রকৃত জীবন। ''আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরজীবনের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং পার্থিব জীবন থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়োনা।''[৮৩] পরজীবনের সার্থকতা অর্জনের উপায় হিসেবে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের গ্রহণ দূষণীয় নয়।

সুতরাং ইসলাম মতে, পরজীবনের সম্বল সংগ্রহের জন্যই পার্থিব জীবনের আবশ্যকতা। পার্থিব জীবনের প্রতি উদাসীন হতেও ইসলাম শিক্ষা দেয় না। মুহাম্মদ (সঃ) এর উক্তি ''লা রাহবানিয়াতা ফিল ইসলাম'' — ইসলামে বৈরাগ্য নেই। বিবাহ, পানাহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা পরিমাণমত ও পরজীবনের আবশ্যক অনুযায়ী ব্যবহার ইসলাম অনুমোদন করে। তবে এ সবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)র আনুগত্য বজায় রেখে পার্থিব জীবনকে পরজীবনের জন্য অর্থবহ করার কথা ইসলাম বলে।

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১। Eliot, Sir Charles, *Hinduism and Buddhism*, Bk II, London, 1891, p.43.

২। *ঋগবেদ সংহিতা*, ১০/১৯০, অনুবাদ, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৭৬।

৩। *ঋগবেদ সংহিতা*, ১০/৮১ অনুবাদ, প্রাগুক্ত।

৪। Wallis, H.W., *The Cosmology of the Rigveda, An Essay*, London, 1887, p.17.

Dhaka University Institutional Repository

৫। Radhakrishnan, S., *Indian Philosophy,* 2nd ed., London, 1929, p.100.

৬। *ঋগবেদ সংহিতা,* ১০।৩১।৭ ;১০।৮১।৪ ।

৭। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ,* ২।৮।৯।৬ ।

৮। *ঋগবেদ সংহিতা,* ১০।১২৯ অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৯। Radhakrishnan, S., op. cit., p.104.

১০। *ঐতরেয় আরণ্যক,* ২।১।৮।১ ।

১১। *প্রশ্ন উপনিষদ* ১;২ অনুবাদ, অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য, *উপনিষদ,* অখণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্রষ্টব্য,ঃ *তৈত্তিরীয় উপনিষদ,* ২।৬।৩ ।

১২। *প্রশ্ন উপনিষদ,* ১।৪ অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

১৩। *Anugita,* 14. 36-38, qd., *Indian Philosophy* by Radhakrishnan, s., op. cit., p. 502.

১৪। *গীতা,*৭।৪ - ৫, অনুবাদ, অতুল চন্দ্র সেন, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ।

১৫। *Brahma-Sutra Sankara Bhasya*, II. 1.14, qd., *A Crititique of Sankara's Philsophy of Appearance* by Kazi Nurul Islam, India : Allahabad, 1988. p. 129.

১৬। Radhakrishnan, S., op. cit., pp. 103-104.

১৭। Brandon, S.G.F., (ed.), *A Dictionary of Comparative Religion*, London, 1971, P.87.

১৮। *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ৬।৮।৪-৬ ।

১৯। ঐ, ২।৪।২৬ ।

২০। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ,* ২।৪।৯৯ ।

২১। *মুণ্ডক উপনিষদ,* ২।২।১১ ; *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* ৩।১ ; *ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৩।২৪।১ ; ২।১৪।২-৪ ; ৬।৯।১ ; *বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ২।৪।৬ ; ৪।৫।৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

২২। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৬।১৩।১-৩ ।

২৩। *গীতা*, ৯।১৯ ।

২৪। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ১১ । ৭ ।১ ।

২৫। *ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা*, কারিকা -৯ ।

২৬। *Brahma- Sutra Sankara Bhasya*, II. 2. I and II. 2. 2. qd., *A Critique of Sankara's Philosophy of Appearance* op. cit., p. 138.

২৭। Mahadevan, T.M.P., *Gaudapada,* India : Madras University, 1975, p. 153.

২৮। *Brahmasutra Sankara Bhasya*, II. 1. 14. qd., *A Critique of Sankara's Philosophy of Appearance*, op. cit., p. 129.

২৯। *Brhadaranyaka Upanisad Sankara Bhasya*, 2. 4. 11; qd., *A Critique of Sankara's Philosophy of Appearance*, op. cit., p. 148.

৩০। Kokileswar Sastri, *An Introduction to Advaita Philosophy*, India : Calcutta University, 1924, p. 101.

৩১। Kazi Nurul Islam, *A Critique of Sankara's Philosophy of Appearance*, op. cit., P.148.

৩২। *Chandogya Upanisad Sankara Bhasya*, Vii. 3.2., qd., *A Critique of Sankara's Philosophy of Appearance*, op. cit., p. 176.

৩৩। *Katha Upanisad. Sankara Bhasya*, 1.2.14., qd., *A Critique of Sankara's Philosophy of Appearance*, op. cit., p. 178.

৩৪। Kazi Nurul Islam, op. cit.,pp. 188-89.

৩৫। *গীতা*, ৭।৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। Benjamin Walker, *Hindu World, An Encyclopedic Survey of Hinduism*, Vol. I, London, 1968, P. 7.

৩৭। *আল কুরআন,* ৫৭ ঃ ৩, অনুবাদ, মুহাম্মদ শাফী, বঙ্গানুবাদ, মুহিউদ্দীন খান, সউদী আরব ঃ বাদশাহ ফাহাদ মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী।

৩৮। ঐ, ২ ঃ ১১৭, অনুবাদ, ঐ, দ্রষ্টব্য, ৬ ঃ ৭৩, ১৬ ঃ ৪০, ৩৬ ঃ ৮২, ৪০ ঃ ৬৮ প্রভৃতি।

৩৯। ঐ, ৫১ ঃ ৪৭ - ৪৮, অনুবাদ, ঐ।

৪০। Alan Mac Robert, 'Sky Telescope', Mar 1983, কাজী জাহান মিয়া, *আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব-১)* ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা ঃ নসীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭, পৃ. ২৮৩ থেকে উদ্ধৃত।

৪১। কাজী জাহান মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪।

৪২। কাজী জাহান মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ২৮০।

৪৩। *আল কুরআন,* ৩০ ঃ ৫৪, অনুবাদ, প্রাগুক্ত।

৪৪। ঐ, ১১২ঃ১-৪, অনুবাদ, প্রাগুক্ত।

৪৫। ঐ, ২৫ ঃ ৫৯, অনুবাদ, প্রাগুক্ত।

৪৬। Brandon, S.G.F., ed., op. cit. p. 209.

৪৭। *আল কুরআন,* ২৩ ঃ ১২, অনুবাদ, প্রাগুক্ত।

৪৮। ঐ; ২৪ ঃ ৪৫, অনুবাদ, প্রাগুক্ত।

৪৯। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, *দাকায়েকুল হাকায়েক,* অনুবাদ, মোহাম্মাদ আব্দুস সোবহান, ঢাকা ঃ আল এহছাক প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃঃ ১৩ - ১৪।

৫০। সাইদুর রহমান, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি,* ২য় সংস্করণ, অনুবাদ ও সম্পাদনা, আমিনুল ইসলাম, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১, পৃঃ ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

৫১। *আল কুরআন*, ৩৬ ঃ ৮২, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৫২। Imam Ghazali, *Tahafut al-Falasifa*, trans., *S.A Kemali*, Lahore, 1958, P. 185.

৫৩। *আল কুরআন*, ২১ ঃ ৬৯, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৫৪। ঐ, ৫৬ ঃ ৭০, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৫৫। ঐ, ৪৬ ঃ ৩, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৫৬। ঐ, ২৮ ঃ ৮৮, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৫৭। ঐ, ৬৫ ঃ ১২, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৫৮। ঐ, ৪৪ ঃ ৩৮ - ৩৯, অনুবাদ, প্রাগুক্ত, দ্রষ্টব্য ১৫ ঃ ৮৫, ২১ ঃ ১৬, ৩৮ঃ ২৭ ।

৫৯। কাজী জাহান মিয়া, প্রগুক্ত, পৃঃ ২৭৭ ।

৬০। *আল কুরআন*, ৫১ ঃ ৪৭, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৬১। ঐ, ৮১ ঃ১৬, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৬২। কাজী জাহান মিয়া, প্রগুক্ত, পৃঃ ১৬০ ।

৬৩। *আল কুরআন*, ৩০ ঃ ৮, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৬৪। হকিং, স্টিফেন ডব্লু, *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, অনুবাদ, শক্রজিৎ দাশগুপ্ত, কলকাতা ঃ বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৩, পৃঃ ১৩২ ।

৬৫। *আল কুরআন*, ৫৬ ঃ ৭১-৭৪, ৬ ঃ ৯৯, ১৪১, ১৩ ঃ ৩-৪, ১৬ ঃ ১০-১১, ২৩ ঃ ১৮-২০, ২৬ ঃ ৭-৯ ।

৬৬। ঐ, ২৪ ঃ ৩৫, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৬৭। Saiyed Abdul Hai, *Iqbal the Philosopher*, Dhaka : Islamic Foundation, 1980, p.21.

Dhaka University Institutional Repository

৬৮। *আল কুরআন*, ৫৫ ঃ ২৭, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৬৯। মুহাম্মদ শাফী, *তাফসীর মাআরিফুল কোরআন*, অনুবাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯২ ।

৭০। ঐ, পৃঃ ১৪০২ ।

৭১। *আল কুরআন*, ৭ ঃ ১৮৭, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৭২। ঐ, ১৬ ঃ ৭৭, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৭৩। ঐ, ৫৪ ঃ ১, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৭৪। *ঋগবেদ সংহিতা*, ৭।৪২।৩ ।

৭৫। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৪।৪।১৪, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৭৬। *মুণ্ডক উপনিষদ*, ২।২।৯, অনুবাদ প্রাগুক্ত ।

৭৭। *আল কুরআন*, ২১ ঃ ১৬, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৭৮। ঐ, ৩ ঃ ১৪, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৭৯। ঐ, ৩ ঃ ১৮৫ ; ১৩ ঃ ২৬ ; ১০২ ঃ ১, অনুবাদ প্রাগুক্ত ।

৮০। ঐ, ১৮ ঃ ৭, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৮১। ৬৭ ঃ ১-২, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৮২। ঐ, ৫১ ঃ ৫৬, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৮৩। ঐ, ২৮ ঃ ৭৭, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন

মানুষ সাধারণ অভিজ্ঞতায় যেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও তেমনি অত্যন্ত জটিল সংগঠন ও প্রক্রিয়া বলে প্রতীয়মান হয়। মানুষের জীবনে রয়েছে বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও এতটা নেই। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের মধ্যে কেটে যায় মানুষের জীবন। মানুষ তার নাতিদীর্ঘ জীবনে — সত্তর-আশি বছর সময়কালে — অজস্র কাহিনীর জন্ম দেয়, রচনা করে অমরকাব্য। সে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানের বিচার করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। সে জীবন ও জগতকে সুন্দরতম করার নিরন্তর প্রয়াস চালায়। এই মানুষইতো আদিম অবস্থা থেকে জীবন জগতকে বর্তমান উন্নতির পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। যে মানুষ শিকারী জন্তুর মাংস ছ্যাঁক দিয়ে খেত সে মানুষের ডাইনিং টেবিলে আজ অনায়াসে হাজির হয় মাংসের রকমারি খাবার, আজ ফলমূলের চেয়ে সে জ্যুস পানে বেশি অভ্যস্ত। আজ দৈহিক ও মানসিক ভোগের নানা কলা-কৌশল তার করতলে। বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষে মানুষ আজ সার্থকতার মুকুট পরিহিত। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এ উৎকর্ষকে খাট করে দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় আবিষ্কার সভ্যতাকে আরো বহুগুণ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মানুষের সকল প্রচেষ্টা মানুষের জন্যই নিবেদিত। এত আবিষ্কার, এত গবেষণা আর অধ্যয়ন মানুষের জীবনকে সুন্দর করার জন্যই। জল, স্থল আর মহাশূণ্যের এত অনুসন্ধান জীবনকে পরিতৃপ্ত করার জন্যই। মানুষ প্রকৃতিকে বুঝতে চায়, আয়ত্ত করতে চায় তারই কল্যাণে। অধিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা থেকে শুরু করে যত বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে তার পশ্চাতে (কখনো প্রত্যক্ষভাবে আর কখনো পরোক্ষভাবে) রয়েছে মানবজীবনকে সুশোভিত করার প্রেরণা। মানব কেন্দ্রিয় বিষয়। আর জগতের সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে তাকে নিয়ে। এ পৃথিবীর আলো-বাতাস, পর্বত-গিরি, সমুদ্র, আকাশ সবই অকাতরে মানুষকে সেবা বিলিয়ে যাচ্ছে। আর মানুষ যেন এর কেন্দ্রে থেকে কেবল পূজা গ্রহণ করে যাচ্ছে। বাঙালী কবি চন্ডীদাস মানুষের এ মর্যাদাকে প্রকাশ করেছেন এভাবে ঃ "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" তাঁরও বহু আগে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাস (খ্রিঃ পূর্ব ৪৮০-৪১০) বলেছিলেন, "Man is the

Dhaka University Institutional Repository

measure of all things অর্থাৎ মানুষ সবকিছুর মানদণ্ড। আবার এই মানুষকে পরমাত্মার সাথেও সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। তাকে দেখা হয়েছে পরমাত্মার অংশবিশেষ বা প্রতিনিধি হিসেবে। এরই একটা অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ করি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এলো ঃ

সীমার মধ্যে, অসীম, তুমি বাজাও আপনসুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

বিদ্রোহের অভিব্যক্তিতে কাজী নজরুল ইসলাম উচ্চারণ করলেন ঃ

'মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও'কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি, মরি !
ও'মুখ হতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে।
পূজিছে গ্রন্থ ভন্ডেরদল ! — মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ ; গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।

বিশ্বে মানুষের স্থান সর্বোচ্চে। শক্তি, সামর্থ্য, মেধা, মনন, জ্ঞানে, গুণে সে অতুলনীয়। অসম্ভবকে সম্ভব করে এই মানুষ। দুর্যোগ, দুর্বিপাক, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, অত্যাচার-অনাচার প্রভৃতিকে সে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করে। তাইতো যুগে যুগে কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাধক এই মানুষের জয়গান গেয়েছেন অকৃপণভাবে।

এতদসত্ত্বেও মানুষ বিপদমুক্ত নয়। তার জীবনের স্থায়িত্ব নেই। নিজেকে সে নিজে রক্ষা করতে পারে না। তার অজান্তে অনির্দিষ্ট ক্ষণে, নিতান্তই অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে এ ধরাধাম ত্যাগ করতে হয়। তার সকল আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন-পরিকল্পনা, নিমিষেই নিশ্চিহ্ন করে দেয় তার মৃত্যু। এ মৃত্যুই তার জীবনের চরম শত্রু। জীবনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে এ মৃত্যু। কিন্তু সে ধরা দেয় না। ক্ষণিকের জন্যও স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে ঘোষণা করে না — "শুনহ মানুষ ভাই, আমার চেয়ে বড় শত্রু তোমার এ জীবনে নাই।" আর এ ঘোষণা শোনার মানুষের সময়ইবা কোথায়। দারা, পুত্র-পরিবার নিয়ে তার ব্যস্ততা। তার ব্যস্ততা আর্থ-সামাজিক নানা প্রয়োজনে। কিন্তু হঠাৎ, মৃত্যু দুর্দান্ত প্রতাপ নিয়ে, ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তিতে তার শত্রুতা প্রকাশ করে। সম্ভবত শত অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি আর সময়বর্ধিত করণের যৌক্তিক আবেদন তার নিকট গ্রাহ্য হয় না। বড়ই পাষাণ এ মৃত্যু। মাতা-পিতার বুকফাটা বিলাপ, স্ত্রীর ক্রন্দনরোল, সন্তানের আর্তনাদ কিছুই তাকে বিগলিত করতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি তার ঐকান্তিক আনুগত্য। তাই সে তার কর্তব্য করেই যায় নির্বিচারে। মানব জীবনের প্রতি তার এ হানা অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

এ অপরিহার্যতা রোধের কোন সূত্র বা প্রযুক্তি বিজ্ঞান অদ্যাবধি আবিষ্কার করতে পারেনি । হয়তো কোনদিন পারবেও না । তাই বলে মানুষের চিন্তা থেমে থাকেনি । মানুষ ভেবেছে যদি এমন হত জীবনের সমাপ্তি কখনো ঘটবে না । কোন না কোনভাবে মানবের অস্তিত্ব থাকবে । থাকবে সুখ-দুঃখের অনুভূতি । আর যদি স্থায়ী সুখী জীবনের অধিকারী হওয়া যায় তাহলেতো সোনায় সোহাগা । এ ভাবনা থেকেই চিন্তাবিদ, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীরা পরকালের কথা বলেছে, অমরত্বের কথা বলেছে । যুক্তি দিয়ে মরণোত্তর জীবন বা পরকাল, অমরত্ব, স্বর্গ-নরক ইত্যাদির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন । এ সব চিন্তানায়কের মধ্যে পিথাগোরাস, প্লেটো, এরিস্টটল, দেকার্ত, বার্কলে, ইমানুয়েল কান্ট, উইলিয়াম জেমস প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এঁরা ন্যায়নিষ্ঠ, পুণ্যবান, সচ্চরিত্র লোকদের জন্য মরণোত্তরকালে স্থায়ী সুখী জীবনের কথা বলেছেন আর পাপাত্মা, দুর্নীতিপরায়ণ, অসচ্চরিত্র লোকদের জন্য বেদনাক্লিষ্ট ও শাস্তিময় জীবনের কথা বলেছেন ।

এঁদেরও বহু আগে ধর্ম মানবজাতিকে মরণোত্তর জীবন, অমরত্ব, স্থায়ী সুখভোগের আশার বাণী আর শাস্তি মুক্তির সতর্কবাণী শুনিয়ে আসছে । আদিমকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কালের প্রায় সবক'টি ধর্মের মূল লক্ষ মরণোত্তর জীবন, অমরত্ব ইত্যাদি । এ লক্ষকে সামনে রেখে ধর্ম পার্থিব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলিত, নিয়মনিষ্ঠ করার প্রয়াস পায় । এ লক্ষ ও প্রয়াসের মধ্যে ধর্মের সার্থকতা হচ্ছে — বস্তুবাদী, জড়বাদী ও প্রকৃতিবাদীরা যেখানে মৃত্যুতে জীবনের পরিসমাপ্তির কথা বলে ধর্ম সেখানে মৃত্যুর পরও জীবনের প্রলম্বনের কথা বলে, অনন্ত জীবনের স্বপ্ন দেখায়, আর্তপিড়ীত, নির্যাতিতকে শোনায় ন্যায়বিচারের অভয়বাণী, অভাবী-অতৃপ্তকে শোনায় তাৎক্ষণিক বাসনাপূরণ ও অফুরন্ত-স্থায়ী স্বর্গ-সুখ ভোগের কথা, পাপিষ্ঠ-দুরাচারকে সতর্ক করে শান্তিপূর্ণ আবাসের কথা বলে । এ প্রসঙ্গে হিন্দু ও ইসলামী মত প্রতিপাদ্য বিষয় ।

মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু ধর্ম ঃ

মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু মত বৌদ্ধ ও জৈন মতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও সিমেটিক ধর্মমত থেকে পৃথক । মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে হিন্দু সকল গ্রন্থ ও সম্প্রদায়সমূহের আলোচনা রয়েছে । অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এ সব গ্রন্থ ও সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ও যুক্তিপ্রক্রিয়ায় ভিন্নতা রয়েছে । মৃত্যু পরবর্তী জীবনের আলোচনায় মৃত্যুর অর্থ, আত্মার

Dhaka University Institutional Repository

অমরত্ব, পুনর্জন্মবাদ, কর্মবাদ, স্বর্গ-নরক, মোক্ষ, ব্রহ্মের সহিত মিলন ইত্যাদি বিষয়সমূহের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। সবকিছুর আগে জীবন বলতে হিন্দুধর্ম কী বুঝায় বা মানব জীবনের তাৎপর্য কী তা আলোচনার অবকাশ রাখে।

১। মানব জীবনের তাৎপর্য ঃ

জীবন একেক জনের নিকট একেক রকম। কেউ ''খাও, দাও, স্ফূর্তি কর।'' ''যাবজ্জীবেৎ সুখম্ জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতম পিবেৎ''— দর্শনে বিশ্বাসী। অর্থাৎ জীবন মানেই ভোগ। ইন্দ্রিয় সুখই জীবনের চরম লক্ষ। জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। মানসিক সুখের চেয়ে ইন্দ্রিয় সুখকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যে কোন মূল্যে সুখ উপভোগ করতে হবে। ভারতীয় চার্বাক দার্শনিকেরা এমন মত পোষণ করেন। বস্তুবাদী ও জড়বাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকদেরও অনেকে এ রকম মত পোষণ করেন। হিন্দু ধর্মের মত এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিন্দু ধর্ম মতে, মানব জীবনের সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য আছে। মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে — ''ব্রহ্মের সাথে একত্ব উপলব্ধি এবং ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়ে পরমানন্দ উপভোগ করা।'' এ উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে জীবনে সাধনা, নীতি-নৈতিকতা ও আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির পালন বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে।

মানুষ ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সে ব্রহ্মের অংশ।[১] যে ব্রহ্ম হতে তার উদ্ভব সে ব্রহ্মে লীন হওয়া বা ভগবান প্রাপ্ত হওয়া তার জীবনের পরম লক্ষ। যে পর্যন্ত মানুষ এর উপযোগী না হয়, সে পর্যন্ত তাকে কৃতকর্ম অনুসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে কর্মফল ভোগ করতে হয়।

জীবন সম্পর্কে যন্ত্রবাদ (Mechanism) কিংবা উন্মেষবাদ (The Emergence theory) যা মনে করে হিন্দুধর্মের বক্তব্য তা থেকে ভিন্ন। যন্ত্রবাদ অনুসারে, জীবদেহ যন্ত্রের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। এদের মধ্যকার পার্থক্য কেবল পরিমাণগত, গুণগত নয়। জীব বা মানুষের মধ্যে যে উন্নততর আচরণ, মানসিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয় তা ভৌত-রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার জটিলতমরূপ ভিন্ন কিছু নয়। অন্যদিকে, উন্মেষবাদ মনে করে, জীবন জড় থেকে উন্মেষিত একটি নতুন গুণ। ইহা জড় থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য বহন করে। যেমন, পানি অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থেকে উন্মেষিত হলেও তা একটি নতুন গুণ এবং তা তার উৎস থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে। কিন্তু হিন্দু মতে, জীবন কোন ভৌত-রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার ফল নয় বা রয়ি বা জড় থেকে উন্মেষিত কোন গুণ নয়, বরং জীবন হচ্ছে আধ্যাত্মিক সত্তা সম্পন্ন। প্রাণময়তা থেকে ভিন্ন মানুষের আরেকটি শক্তি আছে। উহা হচ্ছে তার অন্তস্থ আত্মা।[২] আবার গতি

Dhaka University Institutional Repository

এবং ক্রিয়াপরতার কথা বলে জীবনের সর্বব্যাপক সংজ্ঞা দেয়া যায় না । কেননা, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং রাসায়নিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের গতি ও ক্রিয়া-তৎপরতা আছে কিন্তু কেউ এদেরকে জীবন বলে মনে করে না । এবং এদেরকে জীবন মনে করা যুক্তিযুক্তও নয় । উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণ আছে । এরা খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় বিকশিত হতে পারে । বংশ বিস্তার করতে পারে । কিন্তু মানবেতর প্রাণীর অনেক বৈশিষ্ট্যই এদের মধ্যে নেই । মানবেতর প্রাণীর মধ্যে উদ্ভিদের ঐ সব গুণাবলী ছাড়াও সীমিত ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রতিরোধ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে । কিন্তু মানবের বহু বৈশিষ্ট্যই এদের মধ্যে নেই । মানুষের মধ্যে উদ্ভিদ ও মানবেতর প্রাণীর ঐ সব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও স্বাধীনতা, মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, নান্দনিকবোধ, স্বশাসন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিকতা, সার্বজাতিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিপ্রবণতা, স্বীকার বা অস্বীকারের যোগ্যতা, কল্পনাশক্তি ও মেধার তীক্ষ্মতা, ক্রমাগত জীবন-জগতকে সুখী ও সুন্দর করার প্রচেষ্টা, অমরত্বের বাসনা, অসীমের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সাধনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে । মানুষের দেহাভ্যন্তরে আধ্যাত্মিক ও সূক্ষ্ম সত্তা হিসেবে আত্মাকে স্বীকার করে নিলে মানবের এসব বৈশিষ্ট্য অর্থপূর্ণ হয় । আত্মা থাকার কারণে মানুষ উদ্ভিদ ও মানবেতর প্রাণী থেকে পৃথক । উদ্ভিদের প্রাণ আছে কিন্তু বুদ্ধি নেই । আর উদ্ভিদ থেকে মানবেতর প্রাণী একারণে পৃথক যে, মানবেতর প্রাণীর বুদ্ধি আছে । এ শক্তির কারণে প্রাণী পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে নিজের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে । আর মানুষ প্রাণী থেকে এ কারণে পৃথক যে, তার বিচার-বুদ্ধি বা যুক্তিকৌশল (Reason) রয়েছে । হিন্দুমতে, এই মানবীয় গুণাবলীর চালক হিসেবে রয়েছে তার আত্মা । এ আত্মা জড়াত্মক নয়, বরং ঐশী ।

আত্মা ঐশী হলেও দেহাভ্যন্তরে তার অবস্থান । দেহকে ভর করেই তার আবাস । দেহ ব্যতীত আত্মার পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন হয় না । সুতরাং হিন্দুধর্ম মতে, দেহ ও আত্মা নিয়েই মানবের পার্থিব জীবন । দেহ জড়াত্মক, আত্মা ঐশী । তাই মানব জীবন বস্তু ও অধ্যাত্মের সমন্বয় । এ কারণে হিন্দুধর্ম মানবজীবনে বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্যতা স্বীকার করে । হিন্দুধর্ম অনুসারে মানব জীবনের রয়েছে চারিটি পরম উদ্দেশ্য ।[৩] অর্থ (ধন-সম্পত্তি), কাম (সুখ-সম্ভোগাদি), ধর্ম (ন্যায়পরায়ণতা) এবং মোক্ষ (আধ্যাত্মিক মুক্তি) । 'অর্থ' বৈষয়িকতার স্বীকৃতি দেয় । 'কাম' মানসিক, নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক তৃপ্তির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে । 'ধর্ম' নীতি-নৈতিকতা, সততা, সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি চর্চার কথা বলে । 'মোক্ষ' পরম শান্তি ও আনন্দের কথা বলে । এ চারিটি উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়েই মানব জীবনে সার্থকতা অর্জিত হয় । এর মধ্যে মোক্ষ হচ্ছে মানব জীবনের মূল লক্ষ । অন্য তিনটিকে স্বীকার করে নিয়েই এ মূল লক্ষে উপনীত হতে হয় । কেবল বৈষয়িক সুখ মানুষকে সুখী করতে পারে না ।শুধু সুখের অন্বেষণ মানব

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে নৈরাজ্য নিয়ে আসে । কারণ সে সুখ খোঁজে কিন্তু সুখের নাগাল পায় না । অনেকটা মরীচিকার ন্যায় । সে যেটাকে সুখকর বস্তু মনে করে প্রধাবিত হয়, লক্ষে পৌঁছার পর বা প্রাপ্তির পর সেটা তাকে তৃপ্ত করতে পারে না । সে পুনরায় অন্য বস্তুতে সুখ অন্বেষণ করে । সেখানেও সে তৃপ্ত হয় না । একটা মনস্তাত্ত্বিক সত্য হচ্ছে যে, সুখের প্রতি আকর্ষণ যত অধিক হবে সুখ তত অধিক দুষ্প্রাপ্য হবে । সুখের অন্বেষণ প্রক্রিয়া চলতে থাকবে, কিন্তু কখনো সুখ পাওয়া যাবে না । এ অবস্থাকে নীতিবিদ সিজউইক 'সুখবাদের কুটাভাস' (Paradox of Hedonism) বলে অভিহিত করেছেন ।[৪] হিন্দুধর্ম এ ধরনের সুখ অন্বেষণের কথা বলে না । হিন্দুধর্ম ভোগের সাথে সংযমের, ত্যাগের সাথে প্রাপ্তির, অর্জনের সাথে অধিকার ও ন্যায়পরায়ণতার যোগ সাধনের শিক্ষা দেয় । মানুষের প্রকৃতি, প্রবণতা ও সামাজিক উদ্দেশ্যের সাথে আধ্যাত্মিকতা ও পরমাত্মার অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায় । সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের ভাষায় ঃ

> Hinduism does not believe in any permanent feud between the human world of natural desires and social aims and the spiritual life with its discipline and aspiration on the other ...[৫]

হিন্দুধর্ম যেমন কেবল জগতকে প্রাধান্য দেয় না, তেমনি কেবল অসীমের আরাধনায়ও নিজেকে ব্যাপৃত রাখে না । হিন্দুধর্ম জীবন-সার্থকতার জন্য সসীম ও অসীম, জাগতিক জীবন ও ব্রহ্ম উভয়কে সমগুরুত্ব প্রদান করে থাকে । এ প্রসঙ্গে উপনিষদের বক্তব্য ঃ

> In darkness are they who worship only the world but in greater darkness they who worship the infinite alone. He who accepts both saves himself from death by the knowledge of the former and attains immortality by the knowledge of the latter.[৬]

জীবন সার্থকতার জন্য হিন্দু ধর্মে চারিটি আশ্রম বা স্তর অতিক্রমের কথা বলা হয়েছে । এ আশ্রম হচ্ছে ব্রহ্মচর্য (প্রশিক্ষণ কাল), গার্হস্থ (গৃহস্বামী হিসেবে সাংসারিক ক্রিয়াদি সম্পাদন), বানপ্রস্থ (নির্জনবাস) এবং সন্যাস (সংসারের মায়া ত্যাগ ও মুক্তির জন্য অপেক্ষমান কাল) । প্রথম আশ্রম হচ্ছে দেহ-মনের নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রশিক্ষণ কাল । কিশোর বয়সে এ আশ্রম গ্রহণ করা হয় । এ স্তরে শিক্ষার্থী গুরু গৃহে নির্দিষ্ট কাল অবস্থান করে পরবর্তী জীবনের জন্য উপকারী বিষয়াদি শিক্ষা গ্রহণ করবে । দ্বিতীয় স্তরে সে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করবে । বিবাহের মধ্য দিয়ে সংসার ব্রত ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করবে । তৃতীয় স্তরে, সে গৃহস্থালীর দায়িত্ব পরিত্যাগ করবে । এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বনে যাবে । মনু অনুসারে এ তৃতীয় স্তরটি একজন গ্রহণ করার অধিকার পাবে দাদা হবার পর, অথবা যখন চর্মে ক্ষুদ্র ভাঁজ পড়ে যায়, অথবা চুল ধূসর বর্ণের হয়ে যায় । মূলত সামাজিক সম্পর্ক শিথিল করে ধ্যানের অভ্যাস করার জন্যই

Dhaka University Institutional Repository

এ আশ্রমটি গ্রহণ করা হয় । চতুর্থ স্তরে এসে মানব আধ্যাত্মিক মুক্তির অবস্থা অর্জন করে । তার বাহ্যিক জীবন থাকে ঠিকই, কিন্তু ধন, যশ, সফলতা-ব্যর্থতা কিছুই তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না । এ স্তরে সে আত্মার প্রশান্তি অর্জন করে । আসক্তি আবেগ তার থেকে বিলীন হয়ে যায় । আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মে তার কোন সম্পৃক্ততা থাকে না, সে পরিণত হয় একজন যথার্থ মানুষে । এখন সে যেন পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সাথে মিলনের জন্য অপেক্ষা করছে ।

অতএব, হিন্দুধর্ম অনুসারে মানব জীবনের তাৎপর্য হচ্ছে বৈষয়িকতা, জাগতিকতা প্রভৃতিকে স্বীকার করে নিয়েই তার আত্মার উৎস পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সাথে একীভূত হওয়ার সাধনায় ব্রতী হওয়া । এ অর্জনে ব্যর্থ হলে বার বার জন্ম গ্রহণ করে তার এই পার্থিব দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করতে হয় ।

২। মৃত্যুর তাৎপর্য ঃ

আদিমকালে মৃত্যুকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করা হত না । মনে করা হত, মৃত্যু হচ্ছে কোন অমঙ্গলকারী সত্তার আকস্মিক আক্রমণ । বর্তমান সময়ে এ ধারণার বিলোপ ঘটলেও এ সম্বন্ধে অভিন্ন ধারণা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি । অবশ্য, অভিন্ন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা মৃত্যু বলতে একই অর্থকে নির্দেশ করা জরুরী নয় । জাতি, ধর্ম ও ব্যক্তি ভেদে এর নানা ব্যঞ্জনা মানব মনে নানাভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে ।

কারো কারো নিকট মৃত্যু হচ্ছে এক চির নিদ্রা, যা হতে কখনো জাগ্রত হওয়া সম্ভব হয় না । কারো মতে, মৃত্যু হচ্ছে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছে স্থায়ী পরমানন্দ উপলব্ধির একটি প্রক্রিয়া । মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট পৌঁছে নিরঙ্কুশ সুখ উপলব্ধি করতে পারে । মৃত্যুর পূর্বে এ সুখ উপলব্ধি করা যায় না । মৃত্যুই বাধা । মৃত্যুর দ্বারা এ বাধা অপসারিত হয় । ব্যাবিলনীয়েরা কারো মৃত্যু হলে বলত — **'ইলু-শু-ইক্‌তের-শু'** অর্থাৎ ঈশ্বর তাকে নিয়ে গেছেন । চৈনিকেরা অকাল ও দুর্ঘটনার মৃত্যু এবং পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য করে । তারা অকাল ও দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জন্য অশুভ শক্তিকে দায়ী করে । আর পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুকে বলে 'আবরণ খসে পড়া' । 'মৃত্যু হল এ কথার পরিবর্তে তারা 'চলে গেলেন', 'স্বর্গে গেলেন', 'আর নেই' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন । অন্যদিকে, জড়বাদী, প্রকৃতিবাদীসহ অনেক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী মৃত্যু বলতে মানবের ধ্বংস বা বিনাশ বুঝে থাকেন । তাঁদের মতে, জীবন হচ্ছে ভৌত-রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা । মৃত্যু কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় । ক্রমে ক্রমে জীবনীশক্তি ক্ষয় হয়ে মৃত্যু সংঘটিত হয় । এবং এরপর আর কোন জগতের মোকাবিলা করার কোন সম্ভাবনা থাকে না ।

Dhaka University Institutional Repository

এ সবের বিপরীতে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্ট, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মে মৃত্যু অর্থ জীবনের বিনাশ বা ধ্বংস নয়। মৃত্যু হচ্ছে একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় পৌছা। হিন্দুধর্ম অনুসারে, শরীর এবং আত্মা নিয়েই মানুষের জীবন। মৃত্যুতে শরীরের ধ্বংস হয় কিন্তু আত্মা অক্ষয় থাকে। মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, বরং জীবন প্রক্রিয়ার একটি স্তর মাত্র। শ্রী অরবিন্দ বলেন ঃ

> Death has no reality except as a process of life. Disintegration of substance and renewal of Substance, maintenance of form and change of form are the constant process of life ; death is merely a rapid disintegration subservient to life's necessity of change and variation of formal experience.[৭]

জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করাই হচ্ছে মৃত্যু। গীতা এটা ব্যক্ত করেছে এভাবে ঃ

যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায়
অন্যানি নবানি গৃহ্নাতি
তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায়
অন্যানি নবানি সংঘাতি।[৮]

অর্থাৎ, মানুষ যেমন পুরাতন ও ছেঁড়া বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে সেরূপ আত্মা পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করে, নতুন শরীর গ্রহণ করে। কিন্তু কেন পুরাতন দেহ ছেড়ে নতুন দেহ গ্রহণ করতে হয় ? কেন মৃত্যু হয় ? এর কারণ হিসেবে উপনিষদ বলে ঃ "এই শরীর যখন জরায় অথবা রোগে জীর্ণ-শীর্ণ হয়, তখন (পাকা) আম, ডুমুর বা অশ্বত্থ ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি এই পুরুষ (দেহের) সকল অঙ্গ হতে মুক্ত হয়ে যথাগত পথে (নতুন) প্রাণ লাভ করার জন্য যোনি-স্থানে (অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থানে ফিরে যায়)।"[৯]

হিন্দুধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মও মৃত্যু সম্পর্কে প্রায় একই রকম ধারণা পোষণ করে। মৃত্যুর পরে কর্ম-ফল ভোগের জন্য নতুন শরীর গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুর পর নতুন দেহ গ্রহণ করে না। হিন্দুধর্ম যেখানে মৃত্যুতে শাশ্বত আত্মার দেহ পরিবর্তনের কথা বলে বৌদ্ধধর্মে সেখানে শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। বৌদ্ধধর্ম মনে করে — মৃত্যু হচ্ছে জন্মকালে নানা উপাদান দিয়ে যে দেহ গঠিত হয়েছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। মানব পঞ্চ স্কন্ধ দিয়ে গঠিত। এই স্কন্ধগুলো হলো — রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এ চারিটি উপাদানে গঠিত হল রূপস্কন্ধ। সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা ইত্যাদি হল বেদনাস্কন্ধ। বিষয়ের প্রত্যক্ষণ হল সংজ্ঞাস্কন্ধ। মানসিক প্রবণতা, ঐচ্ছিক ক্রিয়া প্রভৃতি হল সংস্কারস্কন্ধ। এবং বিচার-বুদ্ধি হলো বিজ্ঞানস্কন্ধ। এই বিচার-বুদ্ধি বা বিজ্ঞানস্কন্ধ মৃত্যুকালে একটি চিন্তা প্রবাহের সৃষ্টি করে। মৃত্যুতে ব্যক্তির অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান নষ্ট হয়ে গেলেও এই চিন্তা প্রবাহ থেকে যায়। এই চিন্তা প্রবাহ তার প্রকৃতি অনুযায়ী নতুন সত্তা ও দেহ লাভ করে।

হিন্দুধর্ম অনুসারে, মৃত্যু মানে পরিবর্তন। আত্মার এক দেহ ছেড়ে আরেক দেহ ধারণ। মৃত্যু জীবনের একটি স্তর ত্যাগ করে অন্য স্তরে পৌছা। বাল্যকাল থেকে যৌবনে আবার যৌবন অতিক্রম করে যেমন বার্ধক্য, ঠিক তেমনি কালের গতিতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহান্তর ঘটে।[১৩] অতএব, মৃত্যু ভীতির কারণ নেই, শোক বা বিলাপেরও কিছু নেই। হিন্দুধর্মের ন্যায় ইসলাম ধর্মও মৃত্যুকে পরিবর্তন বলে মনে করে। অবশ্য এ দু'য়ের ধারণার মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে।

৩। মানুষের সারসত্তা ঃ

মানুষের আসল সত্তা (Essence) কী ? এই যে ভৌত কাঠামোর মানুষকে দেখছি তা-ই-কি তার সবকিছু, না এর বাইরে অন্যকোন সূক্ষ্ম সত্তা আছে। থেকে থাকলে তার প্রকৃতি কী ? তা কি স্থায়ী না অস্থায়ী, নশ্বর না অবিনশ্বর, শাশ্বত না পরিবর্তনের অধীন, আধ্যাত্মিক না জড়ীয় ইত্যাদি প্রশ্ন মানবেতিহাসের প্রাচীন কাল থেকে উঠে আসছে। এবং এ সম্পর্কে নানা সময়ে নানাভাবে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীন চিন্তায় যেমন এর উত্তর প্রদত্ত হয়েছে তেমনি ধর্মেও এর উত্তর রয়েছে। হিন্দু, খ্রিস্ট, ইসলাম, জরথুষ্ট্র প্রভৃতি ধর্ম মানবের মাঝে এক শাশ্বত আত্মা স্বীকার করে। অপর দিকে, বৌদ্ধধর্ম মানবের মাঝে কোন শাশ্বত সত্তা স্বীকার করে না।

হিন্দুধর্ম মতে, মানুষের সারসত্তা দেহ নয় ; তার সারসত্তা হচ্ছে তার আত্মা। দেহ ধ্বংস হয় কিন্তু আত্মা ধ্বংসের উর্ধ্বে। ধ্বংস ও পরিবর্তনশীল দেহের মধ্যে থেকে আত্মা নিজে রয়ে যায় অক্ষয় ও অপরিবর্তনীয়। সে দেহের মধ্যে থেকে চালক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। সুতরাং আত্মা হচ্ছে মানুষের সারসত্তা।

৩ঃ১। আত্মার স্বরূপ ঃ

ঐতিহাসিকদের মতে, আর্যদের ভারত উপমহাদেশে আগমনের পূর্ব থেকেই ভারতীয় মানুষ দেহ ও আত্মাকে ভিন্ন বলে মনে করত। এবং এও প্রচলিত ছিল যে, মৃত্যুতে দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব বজায় থাকে। সুতরাং আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণা ভারতীয় আদিবাসীদের। এ ধারণা আর্যরা গ্রহণ করেছিল। এবং কালক্রমে এ ধারণা হিন্দুধর্মে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেহ অস্থায়ী, ইহা ক্রমান্বয়ে বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়, ইহাতো প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু এর পশ্চাতে একটি স্থায়ী, অবিনশ্বর সত্তা রয়েছে, ইহা বিভিন্ন ধর্ম নিজস্ব দৃষ্টিকোণ, বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতির

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছে। লক্ষণীয় যে, আত্মা ও তার অমরতা সম্পর্কে হিন্দুধর্ম যে সব বিষয়ের বিশ্বাস ও ধারণা পোষণ করে, সমরূপ বিশ্বাস ও ধারণা ভারতে উদ্ভূত প্রায় সকল ধর্মে বিদ্যমান রয়েছে। এসব ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের উল্লেখ করা যায়। হিন্দুধর্মের ন্যায় এগুলোও পুনর্জন্মবাদ, কর্মবাদ ইত্যাদি ধারণায় বিশ্বাস করে।

আত্মা ও তার পরিণতি সম্পর্কে বিশ্বাস ও ধারণা হিন্দুধর্মের কেন্দ্রিয় বিষয়। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্রসহ সকল গ্রন্থে আত্মা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়া হিন্দু ষড়দর্শনেও এর আলোচনা ব্যাপকভাবে রয়েছে। এভাবে আত্মা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা এর অধিকতর গুরুত্ব প্রকাশ করে। হিন্দুধর্মে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে যে বিষয়টি জটিলতা সৃষ্টি করে তা হচ্ছে এর যথেচ্ছ ব্যবহার। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ ও দর্শনে আত্মার সমার্থক হিসেবে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'ব্রহ্ম', 'জীব', 'পুরুষ', 'অহংকার', 'বুদ্ধি', 'প্রাণ', 'পুদ্‌গল' ইত্যাদি শব্দ আত্মা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এদের প্রত্যেকটির অনেকার্থক প্রয়োগও লক্ষ করা যায়। যেমন, ঋগবেদে 'আত্মা' শব্দটি সাতটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১১] (এ সাতটি অর্থহলো — বায়ু, শ্বাস, স্বয়ং, দেহ, নিয়ন্তা, সত্তা ও বাহ্যিকনীতি)। বৈদিক সাহিত্যে 'আত্মা' শব্দটির অর্থের দিক দিয়ে অধিকতর ঘনিষ্ঠ শব্দ হচ্ছে 'ব্রহ্ম'। ঋগবেদে ব্রহ্ম শব্দটি দুইশত বার ব্যবহৃত হয়েছে।[১২] সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত সায়নাচার্য 'ব্রহ্ম' শব্দের আটটি প্রতিশব্দ উল্লেখ করেছেন।[১৩] এ শব্দ আটটি হলো ঃ প্রার্থনা, বিশ্বের কারণ, মহৎ কাজ, ব্রাহ্মণ, দেহ, মহৎ এবং রুদ্র।

হিন্দুধর্ম ব্যক্তি আত্মাকে জীবাত্মা এবং ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলে অভিহিত করেছে। ঋগবেদ ও উপনিষদে দু'টি পাখির রূপকের সাহায্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ প্রস্ফুট করা হয়েছে।[১৪] এবং এ পাখি দু'টির আবাস হিসেবে জীব দেহকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বৃক্ষে সাধারণত পাখিরাই বাস করে। জীব দেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপী দু'টি পাখির আবাস। এরা পরস্পর সহচর। একটি আরেকটিকে ছাড়া থাকে না। উভয়ে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ। জীবাত্মা সর্বদা পরমাত্মার আশ্রয়েই থাকে। পরমাত্মা নিরপেক্ষ হয়ে স্বতন্ত্রভাবে জীবাত্মা থাকতে পারে না। কিন্তু জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে এ ঐক্য উপলব্ধি করতে না পেরে, নিজেকে 'কর্তা' ভেবে জাগতিক কর্মে লিপ্ত হয়, তখন জীবাত্মা আসক্তিজনিত কর্মের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। পরমাত্মা কর্মে লিপ্ত হয় না, অবলোকন করেন মাত্র। তাই তাঁর সুখ-দুঃখও ভোগ করতে হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

জীবাত্মা শরীরের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও ইহা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন থেকে পৃথক । শরীরের সাথে সম্পৃক্ততার দিক থেকে একে ব্যবহারিক আত্মা আর বিচ্ছিন্নতার দিক থেকে বিশুদ্ধ আত্মা বলে অভিহিত করা যায় ।

ব্যবহারিক আত্মা

ব্যবহারিক আত্মার রয়েছে তিনটি দিক ঃ দৈহিক, মানসিক, ও নৈতিক ।[১৫]

৩ঃ১ঃ১ । দৈহিক বৈশিষ্ট্য ঃ

জীবাত্মা যখন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে তখন তার তিন ধরনের দেহ থাকে । স্থুল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ ও কারণ দেহ । মাতৃগর্ভ হতে যে আত্মা ভূমিষ্ঠ হয় সে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম — এ পঞ্চ ভৌত উপাদানে গঠিত । এটা হচ্ছে স্থুল দেহ । এটা অভিজ্ঞতা ও জাগতিক বস্তুর ভোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে । সচেতন অবস্থায় আমরা যা জানি স্থুল শরীর তার ভিত্তি । মৃত্যুর সময় জীবাত্মা এ স্থুল শরীর ত্যাগ করে এবং নতুন আরেকটি দেহ সে আবাস হিসেবে গ্রহণ করে ।

সূক্ষ্ম শরীর স্থুল দেহের তুলনায় সূক্ষ্মতর উপাদান দিয়ে গঠিত । বাহ্য-ইন্দ্রিয় দিয়ে এর প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয় । এ শরীরকে লিঙ্গ শরীরও বলা হয়ে থাকে । এটি আমাদের স্বাপ্নিক চেতনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং এই ক্রিয়াপরতার কারণে আত্মার এক দেহ হতে অন্য দেহে স্থানান্তর ঘটে । অতীত জীবনের ইচ্ছা, চিন্তা এবং ক্রিয়াকলাপ এই সূক্ষ্ম শরীরে সংরক্ষিত হয় এবং পরজন্মে আত্মা কি হিসেবে জন্মাবে তা-ও এই সূক্ষ্ম শরীর নির্ধারণ করে ।

কারণ শরীর হচ্ছে আদি ভিত্তি, যেখান থেকে স্থুল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের উদ্ভব ঘটে । তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে, আত্মা থেকে আকাশের উদ্ভব ঘটে, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে আগুন, আগুন থেকে পানি, পানি থেকে গাছপালা, গাছপালা থেকে খাদ্য, খাদ্য থেকে উদ্ভূত হয় ব্যক্তি ।[১৬] কারণ শরীর হচ্ছে প্রশান্ত নিদ্রার ভিত্তি । এ সময়ে জীবাত্মা কামনা বাসনা বা চিন্তা দ্বারা বিচলিত হয় না ।

৩ঃ১ঃ২ । মানসিক বৈশিষ্ট্য ঃ

মানসিক আত্মা কামনা-বাসনা, ভয়, ঘৃণা, ইচ্ছা, শক্তি, আনন্দ, বেদনা, জ্ঞান, ইত্যাদি গুণাবলী বহন করে । এগুলো সরাসরি দেহের সাথে সম্পৃক্ত নয় । তবে আত্মা যখন দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে তখনই আত্মা এ সকল গুণ

Dhaka University Institutional Repository

ধারণ করে। আত্মা যখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় বা মুক্তি প্রাপ্ত হয় তখন এ সব গুণাবলীর বিলোপ ঘটে। চারিটি উপায়ে আত্মাকে চেনা যায়।[১৭] স্থুল শরীরের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকা কালে আত্মাকে তিনটি অবস্থা অতিক্রম করতে হয়। এ অবস্থাগুলো হলো ঃ জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং গভীর নিদ্রাবস্থা। আত্মার জাগ্রত অবস্থাকে বলা হয় বিশ্ব, স্বপ্নের অবস্থাকে তৈজস এবং নিদ্রিদ্র গভীর নিদ্রাবস্থাকে বলা হয় প্রজ্ঞা। চতুর্থ অবস্থাকে বলা হয় তূরীয় অবস্থা। এ অবস্থা মানুষের অভিজ্ঞতা, অনুমান ও প্রমাণের উর্ধ্বে। এ আত্মা বাহ্য বা অন্তর বিষয়ের জ্ঞাতা নয়, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থারও মধ্যবর্তী নয়। প্রজ্ঞা, সর্বজ্ঞ বা অচৈতন্যও নয়। কেবল আত্মারূপে একে অনুভব করা যায়।

৩ঃ১ঃ৩। নৈতিক বৈশিষ্ট্য ঃ

আত্মার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা নৈতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। জীবাত্মার নৈতিক গুণসমূহ তার নিজের অর্জনের ফল। নৈতিক উৎকর্ষের দিক থেকে জীবাত্মাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। নিত্য, মুক্ত ও বদ্ধ। প্রথমত ঃ নিত্য আত্মা চির মুক্ত। এ আত্মা কখনোই বন্দী অবস্থায় নিপতিত হয়নি। দ্বিতীয়ত ঃ মুক্ত আত্মা এক সময় বন্দী অবস্থায় ছিল, বর্তমানে মুক্তি লাভ করেছে। তৃতীয়ত ঃ বদ্ধ আত্মা হচ্ছে — যা হিংসা-বিদ্বেষ, ভয়-ঘৃণা, কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর এ কারণেই এ আত্মা বন্দী অবস্থায় আছে। এ আত্মা জন্ম-মৃত্যুর অধীন।

৩ঃ২। বিশুদ্ধ আত্মা

একজন মানুষের বিশুদ্ধ আত্মা তার দেহ ও ইন্দ্রিয় হতে ভিন্ন। 'আমার হাত', 'আমার ইন্দ্রিয়' ইত্যাদি দাবী প্রমাণ করে 'আমি' ইন্দ্রিয়ের মালিক এবং 'আমি' ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন। ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু একজন ব্যক্তির সত্যিকার আত্মা স্থায়ী ও আত্মসচেতন সত্তা। হিন্দুধর্ম অনুসারে এ আত্মা কেবল চেতনার তূরীয় অবস্থায় প্রকাশিত হয়। এ অবস্থা সমাধির অবস্থা। যা শুধু যোগের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। এ অবস্থায় দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় কিছু কাজ করে না। আবার এ অবস্থা অচেতন অবস্থাও নয়। আত্মার এ অবস্থা হল সৎ-চিৎ-আনন্দের অবস্থা। হিন্দুধর্ম অনুসারে আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই।আত্মা শাশ্বত, এর পরিবর্তন নেই। জাত বস্তুর ন্যায় আত্মা জন্ম গ্রহণ করে অস্তিত্ব লাভ করে না। ইহা স্বরূপে নিত্য ও বিদ্যমান। শরীরের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ নেই।[১৮] আত্মা

Dhaka University Institutional Repository

অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য । আত্মা দেশ-কালের উর্ধ্বে ।তাই কার্য-কারণ নীতির সাহায্যে এর ব্যাখ্যা দেয়া যায় না ।

বলা হয়ে থাকে যে, প্রাক উপনিষদে, বৈদিক সাহিত্যে এবং গীতায় আত্মা বলতে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের চেয়ে জীবাত্মাকে অধিক বোঝানো হয়েছে । আর উপনিষদে আত্মা বলতে জীবাত্মার চেয়ে পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে অধিক বোঝানো হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে বেদে বা গীতায় 'আত্মা' শব্দটি জীবাত্মা ও ব্রহ্ম উভয় অর্থে পাওয়া যায় আবার উপনিষদেও 'আত্মা' শব্দটি উক্ত দুই অর্থে পাওয়া যায় ।

৩ঃ৩ঃ১। উপনিষদে ব্রহ্ম অর্থে ঃ

ঐতরেয় উপনিষদের সূচনায়ই বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিলো । (১।১।১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, শুরুতে আত্মা ছাড়া আর কিছুই ছিল না । আত্মা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে আর কিছুই দেখলেন না । এ অবস্থায় সে আত্মা বলে উঠলেন 'আমি আছি' । (১।৪।১) ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে —'তুমিই তিনি', 'তিনিই জগতের আত্মা'। (৬।১২।৩, ৬।১৩।৩, ৬।১৪।৩) বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলে — আত্মাই জগতের জ্যোতি, আত্মার জ্যোতি দ্বারাই জীব ও জগৎ জ্যোতির্ময় হয় । (৪।১।৬, ৪।৩।২) অতএব দেখা যাচ্ছে যে, উপনিষদে আত্মা ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।

৩ঃ৩ঃ২ । উপনিষদে জীবাত্মা অর্থে ঃ

ঐতরেয় উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে যে, জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় গঠিত হল । কিন্তু সমস্ত দেহই অচেতন পড়ে থাকল । ইন্দ্রিয়াদি নিজেদের প্রয়োজনে কিছুই করতে সক্ষম হচ্ছিল না । আত্মানুভূতি ও ভোগেরও সামর্থ্য হল না । আত্মা ভাবলো তার সাহায্য ব্যতীত দেহ কিছুই করতে পারবে না । তাই আত্মা দেহে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিলো, এবং আত্মা মূর্ধাদেশ দিয়ে মানব দেহে প্রবেশ করলো । (১।৩।১১ — ১২) এর ফলে দেহে চেতনার উদ্ভব হলো যা পরিণামে জীবাত্মা হিসেবে পরিচিত হল । কঠোপনিষদে বলা হয়েছে যে — "শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মাকে (জীবকে) রথী বলে জেনো, জীবের শরীরকে রথ বলে জেনো, বুদ্ধিকে রথ চালক সারথী বলে জেনো । মনীষীগণ জীবের ইন্দ্রিয়ের বিচরণভূমি এবং শরীর ও মনযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলে থাকেন ।"[১৯] জীবাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি হতে স্বতন্ত্র । জীবাত্মা ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে ।

Dhaka University Institutional Repository

তৈত্তিরীয় উপনিষদ মতে জীবাত্মা পাঁচটি কোষ বা উপাদান দিয়ে গঠিত। জীবদেহ ও তার ইন্দ্রিয় হল তার অন্নময় কোষ। অন্নের উপরই জীবদেহ ও তার ইন্দ্রিয় নির্ভর করে। অন্নময় কোষের মধ্যে থাকে প্রাণময় কোষ। জীবের বর্ধন ও বিকাশ নির্ভর করে প্রাণের উপর। প্রাণময় কোষের মধ্যে রয়েছে মনোময় কোষ। মন ও তার ক্রিয়ার সাথে রয়েছে আত্মা। এবং এর সাথে রয়েছে বুদ্ধি-বিচার ও তার ক্রিয়া অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষ।[২০]

যাই হোক বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে জীবাত্মা ও পরামাত্মা বা ব্রহ্মের আলোচনা রয়েছে। আর এটা প্রস্ফুট যে, জীবাত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্মের অংশ। জীবাত্মা পরমাত্মার প্রকাশ। জীবাত্মার উৎস পরমাত্মা। এখন জীবাত্মা তার উৎসের সাথে ভিন্ন না অভিন্ন এ নিয়ে হিন্দুশাস্ত্রে বিতর্ক রয়েছে। এ বিতর্ক হিন্দুশাস্ত্রে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বৈশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নামে নানাবিধ মতবাদের জন্ম দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মার উৎস পরমাত্মা হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জীবাত্মা নামক পাখিটি কর্মে লিপ্ত হয়। বৃক্ষের নানা রূপ-সৌষ্ঠব তাকে আকৃষ্ট করে, সে আকর্ষণে জীবাত্মা সাড়া দেয়। বৃক্ষ তথা দেহের প্রতি সংশ্লিষ্টতা তাকে নানা চাহিদা, কামনা-বাসনা ও প্রয়োজন পূরণের দিকে ধাবিত করে। পক্ষান্তরে, পরমাত্মা নির্লিপ্ত, অনাসক্ত, বৃক্ষ তথা জগতের রূপ-সৌষ্ঠব তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। সে কর্ম করে না, জৈবিক, মানসিক, সামাজিক চাহিদাও তার নেই। তাই এরা ভিন্ন, এদের সত্তা ভিন্ন। হাত শরীরের অংশ। তাই বলে হাত ও শরীর অভিন্ন নয়।এদের মধ্যে ভিন্নতা আছে। নদীর পানি সমুদ্র থেকে আসে। নদীর পানির উৎস সমুদ্র। তাই বলে নদী ও সমুদ্র অভিন্ন নয়। সমুদ্র থেকে পানি নদীতে এসে তার স্বচ্ছতা হারাতে পারে, ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে, বর্ণ ও স্বাদ পরিবর্তন হতে পারে। তাই একই পানির ভিন্নরূপ ধারণ করা স্বাভাবিক। অনুরূপ জীবাত্মার পরিবেশ-পার্শ্বিকতার সংস্পর্শে এসে উৎস পরমাত্মা থেকে ভিন্ন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আবার নদী ও সমুদ্রের পানির মধ্যে অভিন্নতাও আছে। উভয়ই জড়ীয়, উভয়ের ধর্ম এক, উভয়ের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত একইধরনের, উভয়ই বাষ্পীভূত হয়, উভয়ের মধ্যে মাছ ও অন্যান্য জলজ কীট বাস করতে পারে ইত্যাদি। অনুরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যেও অভিন্নতা আছে। উভয়ই চেতন সত্তা, উভয়ই অক্ষয়, অবিনাশী, আকারহীন, অপরিমেয়, শাশ্বত ইত্যাদি। জীবাত্মা চেতন সত্তা বলে পারি-পার্শ্বিকতাকে বুঝতে পারে, নিজেকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। পরমাত্মার সাথে মিলনের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে। পরমাত্মা থেকে সে যে স্বভাব নিয়ে এসেছে সাংসারাসক্তির কারণে তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে, সাধনার দ্বারা সে ত্রুটি-বিচ্যুতি নিশ্চিহ্ন করে পরমাত্মার

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায় নিষ্কাম-নিস্পৃহ স্বভাব অর্জন করতে পারলে তার মুক্তি ঘটে, অন্যথায় পুনর্জন্ম গ্রহণ করে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়।

৩ঃ৪। ষড় দর্শনে আত্মা ঃ

নৈয়ায়িকদের মতে, আত্মা অজড়ীয় দ্রব্য বিশেষ। প্রতিটি দেহে একটি করে আত্মা আছে। দেহ আশ্রয় করে থাকলেও আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। আত্মা অসংখ্য। সকল আত্মা মিলে এক ও অখণ্ড নয়। আবার আত্মা ঈশ্বরের সাথেও অভিন্ন নয়। আত্মা শাশত সত্তা। আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই। আত্মা মন থেকেও ভিন্ন। মন একটি অন্তর ইন্দ্রিয়। আত্মা মনের সাহায্যে মানসিক অবস্থাগুলো প্রত্যক্ষ করে। আত্মা জ্ঞাতা, মন এই জ্ঞান লাভের উপায়। আত্মা প্রাণ থেকেও ভিন্ন। আত্মা মনের সঙ্গে যুক্ত হলেই প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। নৈয়ায়িকেরা মনে করেন, অনুমানের সাহায্যে আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি প্রমাণ করে স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব আছে। বর্তমান প্রত্যক্ষের বস্তুটি এবং অতীতে প্রত্যক্ষিত বস্তুটি অভিন্ন — এই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। নৈয়ায়িকদের ন্যায় বৈশেষিকদের মতেও আত্মা অজড়ীয় দ্রব্য। আত্মা বহু এবং প্রতি জীবে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বিরাজমান। এ আত্মা শাশ্বত ও সর্বব্যাপী। এবং অনুমানের সাহায্যে এ আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। সাংখ্য দর্শনে আত্মাকে পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। এ পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, জড় প্রভৃতি থেকে পৃথক। পুরুষ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। তবে এটা চৈতন্যগুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য নয়। পুরুষ শাশ্বত, তার কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। অদ্বৈত বেদান্ত মতে পুরুষ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু সাংখ্য মতে পুরুষ বা আত্মা এক নয়, বরং বহু। আত্মা এক হলে একজনের জন্ম, মৃত্যু, মোক্ষ ইত্যাদি সকলের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করত। বাস্তবে যেহেতু এরূপ ঘটছে না, অতএব প্রত্যেকের আত্মা ভিন্ন ভিন্ন। যোগ দর্শন মনে করে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ। ইহা মুক্ত ও অসঙ্গ। স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শরীরের সঙ্গে আত্মা স্বরূপত সম্বন্ধযুক্ত নয়। আত্মাস্বরূপত মুক্ত ও বিশুদ্ধ চৈতন্যময় সত্তা হলেও অবিদ্যাবশত চিত্তের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। মীমাংসা দর্শন ন্যায়-বৈশেষিকদের মতো মনে করে যে, আত্মা নিত্য ও সর্বব্যাপী দ্রব্য। আত্মা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত সত্তা। আত্মা হল ভোক্তা, দেহ হল ভোগায়তন। অতীত কর্মের দ্বারা পাপ-পুণ্যের ফলে আত্মা মন ও দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চৈতন্য গুণ লাভ করে। আত্মা এক নয়, বরং বহু। বেদান্ত দার্শনিক শংকর আত্মা ও ব্রহ্মকে অভিন্ন বলে মনে করেন। শংকরের মতে আত্মাই একমাত্র সৎ অন্য সবকিছু

Dhaka University Institutional Repository

অসৎ । প্রত্যেকেই আত্মাকে অহং বা 'আমি' রূপে জানে । দেকার্তের ন্যায় শংকরও বলেন যে, সব কিছু অস্বীকার করা গেলেও আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না । সবকিছু সংশয় করা গেলেও আত্মার অস্তিত্বে সংশয় করা চলে না । কেননা সংশয় কর্তা হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকাব করেই নিতে হয় । আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণসাপেক্ষ নয়, বরং আত্মা স্বতঃসিদ্ধ । আত্মা নির্বিশেষ, আত্মাতে বিষয়ী-বিষয়, কর্তা-কার্য — এসবের কোন ভেদাভেদ নেই । আত্মা নিত্য, অনাদি ও অখণ্ড । অন্যদিকে, বেদান্ত দার্শনিক রামানুজের মতে, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন নয় । এরা ভিন্ন । তবে জীবাত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্মের অংশ । আর এ কারণেই আত্মা নিত্য ও অবিনাশী । আত্মা জ্ঞানের কর্তা কিন্তু জ্ঞানের বিষয় নয় ।

৩ঃ৫ । জৈনধর্মে আত্মা ঃ

জৈনধর্ম দ্রব্যকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করে । জীব এবং অজীব । জীব ও আত্মা অভিন্ন । যে দ্রব্যের চেতনা আছে তাই জীব । চৈতন্য আত্মার স্বরূপগত ধর্ম । জৈন মতে আত্মা প্রমাণসাপেক্ষ নয় । আত্মা প্রত্যক্ষ আর যা প্রত্যক্ষ তার প্রমাণের প্রয়োজন নেই । এ ধর্ম অনুসারে আত্মার রয়েছে বিভিন্ন গুণ । নেমিনাথ সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী আত্মার নয়টি গুণের উল্লেখ করেছেন ।[১১] এ গুণগুলো হলো ঃ (১) আত্মা চেতনসত্তা, এটি জড় বা দেহ থেকে পৃথক । (২) এটা অতীন্দ্রিয় সত্তা (৩) আত্মা জ্ঞাতা (৪) আত্মা কর্তা (৫) দেহে এর অধিষ্ঠান (৬) এটা ভোক্তা (৭) জন্ম মৃত্যুতে এটা নতুন দেহ গ্রহণ করে (৮) আত্মা মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম এবং (৯) এর মধ্যে উর্ধ্বমুখী গতি প্রচ্ছন্ন থাকে । জৈনরা সকল জড়বস্তুতে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে । এ কারণে জৈনদের সর্বপ্রাণবাদী (Hylozoist) বা সর্বাত্মবাদী (Panpsychist) বলা হয় । তবে জড় ছাড়াও আত্মা থাকতে পারে । মুক্ত আত্মা দেহ ছাড়াই অবস্থান করে । অদ্বৈত বেদান্তের বিপরীতে, বৈশেষিক, সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনের মতো জৈনধর্মও মনে করে যে, আত্মা এক নয়, বরং বহু ।

৩ঃ৬। আত্মা সম্পর্কে বৌদ্ধমত ঃ

আত্মা সম্পর্কে গৌতম বুদ্ধ কি বুঝতেন এ সম্পর্কে বৌদ্ধধর্ম ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে বিভিন্ন মত এমনকি পরস্পর বিরোধী মতও পাওয়া যায় । এসবের মধ্যে সাধারণ মতটি হচ্ছে — গৌতম বুদ্ধ দ্রব্য হিসেবে কোন আত্মা বা শাশ্বত ও

Dhaka University Institutional Repository

চিরন্তন কোন আত্মা স্বীকার করেননি । বুদ্ধের মতে, জগতের সব কিছু অনিত্য এবং ক্ষণিক । সেহেতু কোন চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয় । আত্মা বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে রূপ, সংজ্ঞা, বেদনা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পাঁচটি স্কন্ধের সমষ্টি । সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, অভিপ্সা প্রভৃতির প্রবাহই আত্মা । এগুলো যেহেতু চিরন্তন নয়, অতএব আত্মাও চিরন্তন নয় । এখানে বুদ্ধের মধ্যে পাশ্চাত্য আধুনিক দার্শনিক হিউমের মতের পূর্বাভাস লক্ষ করা যায় । হিউমের মতে আত্মা হচ্ছে 'প্রত্যক্ষণের সমষ্টি' । হিউম বলেন, ''যখন আমি আমার ''আমি'' (Myself) বলতে যা বুঝাই, তার মাঝে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে প্রবেশ করি, তখন আমি কোন না কোন বিশেষ প্রত্যক্ষণের ওপর, গরম বা ঠাণ্ডার ওপর, আলো বা ছায়ার ওপর, ভালবাসা বা ঘৃণার ওপর, বেদনা বা আনন্দের ওপর হোঁচট খাই । আমি কোন প্রত্যক্ষণ ছাড়া আমিকে ধরতে পারি না । প্রত্যক্ষণ ছাড়া অন্য কিছুকে আমি কখনো লক্ষ করি না ।[২২] গৌতম বুদ্ধও মনে করতেন যে, প্রতি মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আমরা যেসব মানসিক প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি, সেই মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ধারা বা প্রবাহই আত্মা ।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, আত্মা যদি কোন শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তা না হয়ে কেবল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ হয়, তাহলে ব্যক্তি অভিন্নতাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ? শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য যে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা তা কি করে প্রমাণ করা যায় ? এর উত্তরে বুদ্ধদেব বলেন, চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় সত্তা না থাকলেও আমাদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা (Continuity) আছে । প্রতিটা অবস্থা একদিকে যেমন অন্য অবস্থা থেকে উদ্ভূত, তেমনিভাবে প্রতিটি অবস্থা পরবর্তী অবস্থাটি সৃষ্টি করে চলেছে । সেহেতু, জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মূলে একটা কার্য-কারণ সূত্রের সম্বন্ধ রয়েছে । বুদ্ধদেব একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন । সমস্ত রাত একটা প্রদীপ জ্বলছে । প্রতি মুহূর্তে আমরা একটামাত্র শিখাই দেখি, প্রকৃতপক্ষে প্রতিমুহূর্তের শিখা অন্য মুহূর্তের শিখা থেকে ভিন্ন । প্রতি মুহূর্তে প্রদীপের সলিতার বা তেলের ভিন্ন অংশ পুড়ছে । কিন্তু আমরা একটা প্রদীপ শিখাই দেখি । অনুরূপভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটা অবস্থা ভিন্ন । প্রতিটা অবস্থার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা বা পরম্পরা আছে মাত্র ।

Dhaka University Institutional Repository

৪। আত্মার অমরত্ব ঃ

হিন্দুধর্ম অনুসারে আত্মা নিত্য, শাশ্বত-চিরন্তন, অবিনাশী, অমর — এটা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আত্মার স্বরূপ আলোচনায় প্রস্ফুট হয়েছে। তদুপরি অত্র অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা যোগ করা হল।

হিন্দুধর্ম অনুসারে মানব জীবনের চরম লক্ষ হচ্ছে মোক্ষ লাভ করা। মোক্ষ হচ্ছে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট, আসক্তি, মোহ, লোভ ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করে ব্রহ্মের সাথে বিলীন হয়ে যাওয়া। এ লক্ষে উপনীত হওয়ার জন্য যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক দিক থেকে আত্মার অমর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রথমতঃ ব্রহ্ম নিত্য, শাশ্বত, চিরন্তন, অনাদি-অনন্ত। তিনি স্বয়ম্ভূ, অকারণিত-কারণ, অচালিত চালক। তিনি জগতকে নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু তিনি কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। আর জীবাত্মা হচ্ছে এই ব্রহ্মের অংশ বা ব্রহ্মের প্রকাশ। যেহেতু ব্রহ্ম শাশ্বত-চিরন্তন, সেহেতু তার প্রকাশও শাশ্বত-চিরন্তন হবে। যদি তা না হয় অর্থাৎ আত্মা যদি অমর বা শাশ্বত না হয়, তাহলে স্ববিরোধিতা দেখা দিবে। তখন বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম যে, ব্রহ্ম শাশ্বত ও অশাশ্বত, চিরন্তন ও অচিরন্তন, অমর ও অমর নয়। কিন্তু একই বস্তুতে দু'টি বিরুদ্ধ গুণের অধিষ্ঠান যুক্তিসিদ্ধ নয়। সকাল ঠিক ন'টার সময়ে অত্র স্থানে বৃষ্টি হবে এবং হবে না — এ বচনটি সত্য হতে পারে না। ঠিক তেমনি ব্রহ্ম শাশ্বত ও শাশ্বত নয়, অমর ও অমর নয় — এ বচনটি সত্য হতে পারে না। যেহেতু হিন্দু ধর্মে ব্রহ্মকে শাশ্বত-চিরন্তন ও অমর হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয় সেহেতু তাঁর অংশ বা প্রকাশ আত্মাকেও যৌক্তিক দিক থেকে শাশ্বত, চিরন্তন ও অমর হিসেবে স্বীকার করে নিতে হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ আত্মা যদি অমর না হয়, তাহলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আত্মা যদি অমর না হয়, তাহলে ব্রহ্মের সাথে মিলন হবে কি করে ? আত্মা যদি মৃত্যুতে বিনাশ হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ব্রহ্মের সাথে মিলন হবে কার ? আত্মার বিনাশ হলে এ মিলন অসম্ভব হয়ে যায়। প্রেমাস্পদের সাথে প্রেমিকের মিলন যদি অসম্ভব হয় তাহলে এ প্রেমের সার্থকতা কোথায় ? এ সার্থকতার জন্য প্রেমিকের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। তাই ব্রহ্মের সাথে আত্মার মিলনের জন্য আত্মার অমর হওয়া জরুরী। সুতরাং— ব্রহ্মের সাথে আত্মার মিলন — মানব জীবনের এ লক্ষ তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করে যে, আত্মা অমর।

তৃতীয়ত ঃ একই স্বভাব-ধর্মের বস্তু একে-অপরকে আকর্ষণ করে। অন্যকথায় একই স্বভাব-ধর্মের বস্তুর মধ্যে মিলন সম্ভব। বিরোধী স্বভাবের বস্তুর মধ্যে মিলন সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ — আগুন ও পানির মধ্যে মিলন সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

নয় । কিন্তু পানি ও চিনি বা লবনপিণ্ডের মধ্যে মিলন সম্ভব । পানির স্বভাবে রয়েছে দ্রবীভূত করা এবং চিনি বা লবনপিণ্ডের স্বভাবে রয়েছে দ্রবীভূত হওয়া । একারণেই পানি ও চিনি বা লবনের মিলন সম্ভব হয় । হিন্দুধর্মে দাবী করা হয় যে, মানব জীবনের চরম লক্ষ হচ্ছে ব্রহ্মের মিলন লাভ করা । এখন এই মিলনকে যদি সম্ভব বলে স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে এও স্বীকার করে নিতে হয় যে, মানব অর্থাৎ তার সারসত্তা আত্মা ব্রহ্মের স্বভাব-ধর্মের অনুরূপ হবে । অন্যথায় এ দু'য়ের মিলন সম্ভব নয় । ব্রহ্মের স্বভাব-ধর্ম হচ্ছে — ব্রহ্ম শাশ্বত-চিরন্তন ও অমর । অতএব, আত্মাও শাশ্বত চিরন্তন ও অমর হবে ।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ আত্মার এ অমরতাকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছে । যেমন গীতায় বলা হয়েছে : আমি পূর্বে ছিলাম না, বা তুমি ছিলে না বা এই নৃপতিগণ ছিলেন না, এমন নহে । আর পরে আমরা সকলে থাকব না, তাও নহে ।[২৩] আত্মার কোন বিনাশ নেই । আত্মা নিত্য । আত্মা ছিল, আছে এবং থাকবে । মৃত্যুতে দেহ বিনষ্ট হয় কিন্তু আত্মা অবিনশ্বরই থেকে যায় । যার জন্ম হলো তার আত্মা অস্তিত্ব লাভ করল এমন নয়, আবার যার মৃত্যু হল তার আত্মার বিনাশ ঘটল এমনও নয় । আত্মা জন্ম ও মৃত্যু রহিত । ''অজো নিত্য ; শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'' অর্থাৎ আত্মা নিত্য, শাশ্বত এবং চিরবিদ্যমান । দেহ হত হলেও আত্মা হতের উর্ধ্বে ।''[২৪] আত্মা সর্বাবস্থায়ই একরূপ । এর কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই । কোন আক্রমণ এর কোন ক্ষতি করতে পারে না । ''শস্ত্র সকল একে ছেদন করতে পারে না, অগ্নিতে দহন করতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না । এ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য বলে কথিত হন ।''[২৫]

মৃত্যুতে দেহ বিনষ্ট হয় । আত্মা আবার দেহ গ্রহণ করে । পূর্বজন্মে কৃত কর্মের ফল ভোগের ও প্রায়শ্চিত্তের জন্যই আত্মার নতুন দেহ গ্রহণ করতে হয় । যতদিন সে মোক্ষ লাভ না করবে, ব্রহ্মের সাথে মিলনের যোগ্যতা অর্জন করতে না পারবে, ততদিন পুনর্জন্ম গ্রহণ করে নতুন দেহ গ্রহণ করবে এবং কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবে । আত্মা অমর বলেই পুনর্জন্ম গ্রহণ। কর্ম-ফল ভোগ সম্ভব হয় । কিন্তু তার জীবন তখনই পরিপূর্ণ সার্থক হয় যখন সে ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন হয়ে যেতে পারে । এটাই আত্মার সর্বোত্তম অমরতা ।''[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

৫ । মরণোত্তর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ঃ

৫ঃ১ । মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায় ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হিন্দুধর্ম বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যে ভরপুর । আত্মার পরিণতি বা মৃত্যুর পর মানব জীবনের অবস্থা সম্পর্কেও এর ব্যতিক্রম নেই । তবে এসবের মধ্যে যা সাধারণ তা হচ্ছে — আত্মার পুনর্জন্ম গ্রহণ অথবা ব্রহ্মের সাথে বিলীন হয়ে যাওয়া ।

মৃত্যুর পর আত্মার পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতের একটি হচ্ছে আত্মা দেবযানে ব্রহ্মলোকে গমন করে অথবা পিতৃযানে চন্দ্রলোকে গমন করে । অতঃপর মোক্ষ লাভে সমর্থ আত্মা ব্যতীত সকল আত্মা মর্তে এসে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ।

আরেকটি মত অনুসারে মৃত্যুর পর আত্মা যমপুরীতে গমন করে । সেখানে যমের সিদ্ধান্তক্রমে পুণ্যাত্মা ক্ষণস্থায়ী স্বর্গ ও পাপাত্মা ক্ষণস্থায়ী নরক ভোগ শেষে মর্তে এসে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ।

অন্য আরেকটি মত অনুসারে, মোক্ষ প্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মা ব্রহ্মের সত্তায় বিলীন হয়ে যায় । আর মোক্ষ লাভে ব্যর্থ ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাদের আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রাণীরূপে জীবন-যাপন করে ।

প্রথমোক্ত মত অনুসারে, ''যাঁরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার উপাসনা করেন তাঁরা (মৃত্যুর পর) অর্চিতে গমন করেন । অর্চি হতে দিনে, দিন হতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হতে উত্তরায়ণের ছয় মাসে গমন করেন । মাসসমূহ হতে সংবৎসরে, সংবৎসর হতে আদিত্যে, আদিত্য হতে চন্দ্রে, চন্দ্র হতে বিদ্যুতে গমন করেন । সে স্থানে এক অমানব পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্ম লাভ করায় । এটাই দেবযান পথ ।''[২৭] ব্রহ্মলোকে আত্মারা চিরকাল বাস করে । তাদের মর্তে এসে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না ।[২৮] কিন্তু গীতার বক্তব্য অনুসারে এ লোকের আত্মারাও পুনর্জন্মের ঊর্ধ্বে নয় । গীতার বাণী ঃ ''আব্রহ্মাভুবনাৎ লোকাঃ পুনঃ আবর্তিনঃ তু হে কৌন্তেয়, মাম উপেত্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।'' অর্থাৎ ব্রহ্মলোক হতেও লোকগণ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে । কেবল আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না ।[২৯] এখানে উপনিষদ ও গীতার বিরোধ সুস্পষ্ট । কোন কোন পন্ডিত এ বিরোধ নিরসনের চেষ্টা করেছেন এভাবে ঃ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত আত্মাগণ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করেন । ব্রহ্মলোক যখন বিনষ্ট হয়, তখন তাদের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী । আবার ব্রহ্মলোকে অবস্থানকালে কোন আত্মার যদি সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হয়,তখন তারা ব্রহ্মে লীন হয় । আত্মার এ মুক্তিকে বিদেহমুক্তি বা ক্রমমুক্তি বলে অভিহিত করা হয় । ''আর যারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত,

Dhaka University Institutional Repository

দান ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে, তারা মৃত্যুর পর ধূমে গমন করে। ধূম হতে রাত্রিতে, রাত্রি হতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হতে দাক্ষিণায়নের ছয়মাসে গমন করে। এ মাসসমূহ হতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হতে আকাশে, আকাশ হতে চন্দ্রলোকে গমন করে। . . . যে পর্যন্ত কর্ম ক্ষয় না হয়, সে পর্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলে বাস করে যে পথে গিয়েছিল, সে পথেই ফিরে আসে। . . . এবং প্রাণীরূপে আবার জন্ম গ্রহণ করে।''[৩০]

দ্বিতীয় মত অনুসারে, আত্মা বা প্রেত মৃত্যুর পর অল্প কিছু দিন এ ধরায় অবস্থান করে। এ আত্মাকে স্বর্গীয় পোশাক সরবরাহ করা হয়। এ পোশাক পরে প্রেত যমপুরীতে গমন করে। সেখানে মৃত-রাজ্যের রাজা 'যম' আত্মাদের বিচার-কার্য সম্পন্ন করেন। ইহ-জগতে আত্মাদের চিন্তা, অভীপ্সা, ইচ্ছা ও ভাল-মন্দ কর্মের ভিত্তিতে এ বিচার কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরপর ভাল ক্রিয়ার কর্তাকে স্বর্গে এবং মন্দ ক্রিয়ার কর্তাকে নরকে প্রেরণ করা হয়।[৩১] স্বর্গে পুণ্য ক্ষয় এবং নরকে শাস্তি ভোগের পর পুনরায় এ আত্মারা মানব বা বিভিন্ন প্রাণীরূপে পুনঃজন্ম গ্রহণ করে।

তৃতীয় মত অনুসারে, মৃত্যুর পূর্বে যারা ব্রহ্ম লাভ করতে সক্ষম হয়, তাঁরা মৃত্যুর পর ব্রহ্মের সাথে লীন হয়। শুদ্ধ অদ্বৈতবাদীগণ বলেন, যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক এবং যাঁদের আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, তাঁদের ব্রহ্মলোকে যেতে হয় না। তাঁরা ব্রহ্ম হন। ''হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা বর্তমান, সে কামনা যখন দূর হয়, তখন মর্ত অমৃত হয়, এবং এখানে (দেহে বর্তমান থেকে) আত্মা ব্রহ্ম লাভ করে।''[৩২] একে সদ্যোমুক্তি বা জীবন্মুক্তি বলে অভিহিত করা হয়। এদের মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। আর যারা জ্ঞানালোচনা বা পুণ্য-কর্ম কিছুই করে না, কেবল যাবজ্জীবন পাপাচরণ করে, তারা পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি তির্যক যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। একে 'তৃতীয় পথ' বা তৃতীয় মার্গ বলা হয়। (*ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৫/১০/৮, গীতা-১৬/১৯/-২১)

এ আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, আত্মার মূল পরিণতি হচ্ছে ব্রহ্মের সাথে বিলীন হওয়া বা পুনর্জন্ম গ্রহণ করা। ব্রহ্ম লাভে ব্যর্থ হলে তাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতেই হবে। স্বর্গবাস বা নরকবাস কোনটাই তার জন্য স্থায়ী নয়। পুনর্জন্ম গ্রহণ করে পূর্বজন্মের কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। ব্রহ্ম লাভ করতে পারলেই কেবল পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পুনর্জন্মবাদ হিন্দুধর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কেবল হিন্দুধর্মে নয়, ভারতীয় অন্যান্য ধর্ম যেমন- জৈন-বৌদ্ধধর্মেও এর গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এ হেতু পুনর্জন্মবাদ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

Dhaka University Institutional Repository

৫ঃ২ । পুনর্জন্মবাদ ঃ

পুনর্জন্মের ধারণা খুবই প্রাচীন । ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসসহ অনেকে মনে করেন যে, মিশরীয়দের মধ্যে সর্বাগ্রে পুনর্জন্মবাদ ও আত্মার অমরত্বের ধারণা পাওয়া যায় । কিন্তু আধুনিক মিশরতত্ত্ববিদ ম্যাসপেরো, এ, আর্মানসহ অনেকে মনে করেন যে, পুনর্জন্মবাদের সহিত মিশরীয়গণ পরিচিত ছিল না । বরং হিন্দুদের বা ভারতবর্ষের নিকট থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি পুনর্জন্মবাদের ধারণা গ্রহণ করেছিল । গ্রীকদের মধ্যে পিথাগোরাস সর্ব প্রথম পুনর্জন্মবাদ প্রচার করেন । এপুলিয়াসের মতে, পিথাগোরাস ভারতে এসে ব্রাহ্মণদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন । পিথাগোরাসের পরে গ্রীকদের মধ্যে অর্ফিয়াস, এম্পিডক্লিস, প্লেটো, প্লটিনাস প্রমুখ পুনর্জন্মবাদ প্রচার করেন । আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক শোপেনহাওয়ার, ম্যাকটেগার্ট প্রমুখ তাঁদের অধিবিদ্যায় পুনর্জন্মবাদের অবতারণা করেছেন ।

যাই হোক, হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মবাদের প্রথম পরিচয় মেলে 'শতপথ ব্রাহ্মণে' ঋগবেদে জন্মান্তরবাদের ধারণা নেই । অবশ্য ১০ম মন্ডলের ৫৮তম সূত্রে তিন জন্মের ধারণা আছে । কিন্তু এ সব পুনর্জন্মের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে না । শতপথ ব্রাহ্মণের পর উপনিষদ এ ধারণাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে । মনু, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এবং ষড়দর্শনেও এ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে ।

আত্মা শাশ্বত হলেও দেহের সাথে তার সম্পৃক্ততা আছে । দেহকে ভর করেই সে তার কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা চরিতার্থ করে । পার্থিব কামনা-বাসনাকে যদি সে পরিত্যাগ করতে না পারে, তাহলে দেহের মোহ থেকেও সে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না । এই মোহ ও পার্থিব সামগ্রির কামনা তাকে মৃত্যুর পর আবার দেহে ফিরে নিয়ে আসে । এক দেহ ছেড়ে সে আরেক দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে । যেমন জোঁক একটি তৃণের শীর্ষে গিয়ে অন্য তৃণকে আশ্রয় করে এবং নিজেকে তার উপব তুলে নেয় । একজন স্বর্ণকাব এক খন্ড স্বর্ণকে অভিনব ও সুন্দরতর রূপ দেয় তেমনি আত্মা দেহ ত্যাগের পর পিতৃ-পুরুষ, দেব বা অন্যকোন জীবের উপযোগী রূপ গ্রহণ করে ।[৩৩] হিন্দুধর্ম অনুসারে, দেহান্তর নিতান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঘটে । এ একই জীবনের ক্রমধারামাত্র । বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য যেমন একই ধারাবাহিকতায় কালক্রমে উপস্থিত হয়, তেমনি কালের গতিতে দেহান্তর প্রাপ্তিও ঘটে । (*গীতা*, ২/১৩) মানুষের মৃত্যুতে স্থুল দেহের বিনাশ ঘটে । কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমান থাকে, বেদান্ত মতে, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়বে সূক্ষ্ম শরীর গঠিত । জীবদ্দশায় যে সব বাসনা প্রবল হয়, সে সব বাসনার ছাঁচে সূক্ষ্ম শরীর নতুন দেহ গঠন করে তাতে আশ্রিত হয় । সে দেহে সূক্ষ্ম শরীর পুনর্জন্মের কৃত কর্মের ফল ভোগ করে । সূক্ষ্ম শরীরের যখন বিনাশ

Dhaka University Institutional Repository

সাধন করা সম্ভব হয়, তখনই আত্মা দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয় । এ প্রসঙ্গে হিন্দু মতের সাথে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম মতের সাদৃশ্য রয়েছে । জৈনধর্মও মনে করে যে, দেহের প্রতি আত্মার যে বন্ধন বা মোহ এ বন্ধন বা মোহই আত্মাকে দেহ ধারণে বা পুনর্জন্ম গ্রহণে বাধ্য করে । কর্মের ফল ভোগের জন্য আত্মার পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় । বিভিন্ন বস্তু ও ক্রিয়া আত্মায় ভোগ, লালসা, কামনা-বাসনা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির সৃষ্টি করে । এ কামনা-বাসনার ফলে দেহের প্রতি মোহ বা বন্ধন সৃষ্টি হয় । এ বন্ধনের কারণে আত্মাকে মৃত্যুর পর পুনরায় দেহ ধারণ বা পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় । বৌদ্ধধর্ম অনুসারেও দেহের প্রতি বন্ধনের কারণে জাগতিক দুঃখ, ক্লেশ ভোগ করতে হয়, পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় । পুনর্জন্ম গ্রহণ করে কৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হয় । নির্বাণ লাভ করতে পারলেই কেবল জাগতিক দুঃখ ও পুনর্জন্ম থেকে নিস্তার লাভ করা সম্ভব হয় । কিন্তু বৌদ্ধধর্মে কোন শাশ্বত আত্মা স্বীকার করা হয় না । বুদ্ধদেবের মতে, 'সর্বং অনিত্যম'— সব কিছুই অনিত্য, কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরন্তন নয় । বৌদ্ধ ক্ষণিকত্ববাদ (The theory of Momentariness) অনুযায়ী কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী । একটিমাত্র ক্ষণের জন্যও কোন কিছু স্থায়ী হয় না । ক্ষণিক পরের মানুষটি ক্ষণিক আগের মানুষটি নয় । বুদ্ধদেবের এ মতে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাসের ''একই নদীতে দুইবার অবগাহন করা সম্ভব নয়'' মতের পূর্বাভাস পাওয়া যায় । এখন প্রশ্ন হচ্ছে সবকিছুই যদি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়, স্থায়ী ও শাশ্বত আত্মা যদি না থাকে তাহলে কে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, কারইবা নির্বাণ লাভ হয় ? বৌদ্ধধর্ম প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ (The theory of Dependent Origination) এর সাহায্যে এর উত্তর দিয়ে থাকে । প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ অনুসারে, বিনা কারণে কোন কিছু ঘটে না । প্রত্যেক ঘটনা বা কার্যের পশ্চাতে একটি কারণ আছে । প্রত্যেক পরবর্তী ঘটনা তার পূর্ববর্তী কোন কারণের উপর নির্ভর করে । তাই পরবর্তী ঘটনা বা কার্যের সাথে পূর্ববর্তী ঘটনা বা কার্যের একটা সম্পর্ক ও ধারবাহিকতা থাকে । এ ধারাবাহিকতা ব্যতীত আকস্মিকভাবে কোন কার্যের উদ্ভব সম্ভব নয় । প্রত্যেক বস্তুতে পরিবর্তন আছে । তার মধ্যে আবার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতাও আছে । মানুষের মধ্যে শাশ্বত আত্মা নেই, কিন্তু তার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল সচেতনতার ধারাবাহিকতা আছে । মানুষের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে । মৃত্যুতেও তার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয় । যে মানুষটির মৃত্যু হয় এবং পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে — এ দুই মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ অভিন্নতা নেই আবার সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতাও নেই । এ দু'য়ের মধ্যে যেটি সাধারণ সেটি হচ্ছে ধারাবাহিকতা । পূর্ববর্তী জীবনের শেষ চিন্তার ক্ষণটি পরবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের প্রথম চিন্তার ক্ষণটির কারণ । অর্থাৎ ' পূর্বজীবনের শেষ চিন্তাপ্রবাহটিই পরবর্তী জীবনের বা পুনর্জীবনের উদ্ভব ঘটায় । এ জীবন আবার একটা ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে ।

মানুষের যে পুনর্জন্ম হয় এর প্রমাণ কি করে দেয়া সম্ভব ? এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬ সালে নিউইয়র্কে প্রদত্ত "Reincarnation of the Soul" শীর্ষক বক্তৃতায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । তাঁর একটি যুক্তি এরকম ঃ আমরা বিভিন্ন বস্তুর যে জ্ঞান লাভ করি তা পুনর্জন্মের কারণেই সম্ভব হয় । আমি ঘর থেকে বের হয়ে একটা জন্তু দেখলাম এবং বুঝতে পারলাম যে ওটা একটা কুকুর । ওটা যে একটা কুকুর তা কি করে জানলাম ? যখন ওটার ছাপ আমার মনের উপর পড়ল, তখন উহার সহিত মনের ভিতরকার পূর্ব-সংস্কারগুলো মিলে গেল । আমার যাবতীয় পূর্ব-সংস্কার স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে । নূতন কোন বিষয় মনের সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্র আমি সেটিকে পূর্ব-সংস্কারগুলির সহিত মিলিয়ে দেখি । যখন মিলে যায়, তখন উহার জ্ঞান হয় । কুকুর দেখার পর পূর্ব-সংস্কারের সাথে মিলে যাওয়ায় আমার এই জ্ঞান হল যে, এটা কুকুর । আর যখন কোন বস্তুকে আমার পূর্ব-সংস্কারের সাথে মিলাতে ব্যর্থ হই তখন ধরে নেই যে, এর পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার নেই । এখানে একথা স্পষ্ট যে, পুনর্জন্মবাদের সমর্থকেরা জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদী । তবে তাঁদের মতে, এ জ্ঞান প্রক্রিয়া পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে সংগঠিত হয় । আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী ও তাঁদের মতের পার্থক্য এই যে, আধুনিক আভিজ্ঞতাবাদীরা বিশেষ করে জন লক মনে করেন যে, আমরা অভিজ্ঞতাশূণ্য মন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করি । জন্মের সময়ে আমাদের মন হচ্ছে অলিখিত কাগজের (Tabula rasa) ন্যায় । বাস্তব পরিবেশের সংস্পর্শে এসে আস্তে আস্তে সে মনে অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয় । পক্ষান্তরে পুনর্জন্মবাদের সমর্থকদের মতে, আমরা অভিজ্ঞতাশূণ্য মন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করি না । জন্মের সময় আমাদের মনে পূর্বজন্মের সংস্কার বিদ্যমান থাকে । এ সংস্কার থাকার কারণেই আমরা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে পারি । পূর্ব-সংস্কার ও পূর্বজ্ঞান আছে বলেই একটু আগে ভূমিষ্ঠ মুরগী ছানার মৃত্যু ভয় আছে । একটু আগে ডিম থেকে বের হয়েছে — একটা বাজ পাখি আসল, অমনি সে ভয়ে মায়ের ডানার নিচে গিয়ে আশ্রয় নিল । কীভাবে ঐ মুরগী ছানাটি শিখল যে, সে বাজের ভক্ষ্য ? পূর্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে বলেই সে বাজপাখি দেখে নিজের শত্রু চিনতে পারল এবং নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করল । ডিম হতে সদ্য বহির্গত হংস পানির নিকট আসলেই ঝাঁপ দিয়ে পানিতে পড়ে এবং সাঁতার কাটতে থাকে । উহা কখনো সাঁতার দেয় নাই । বা কাউকে সাঁতার দেতে দেখে নাই । কিন্তু কী করে উহা পানিতে

Dhaka University Institutional Repository

নামতে ও সাঁতার কাটতে শিখল ? হংসের এ কাণ্ড পূর্ব অস্তিত্ব ও পূর্ব-জ্ঞান প্রমাণ করে । পুর্ব-সংস্কার নিয়ে সে জন্ম গ্রহণ করেছে বলেই তৎক্ষনাৎ সাঁতার দিতে পারল ।

এটাকে অনেকে 'স্বাভাবিক জ্ঞান' (Instinct) বলে অভিহিত করেন । মূলত স্বাভাবিক জ্ঞানও পুনর্জন্মের প্রমাণ করে । একজন পিয়ানো বাজানো শিখতে আরম্ভ করল । প্রথমে তাকে প্রত্যেক পর্দার দিকে নজর রেখে অঙ্গুলি প্রয়োগ করতে হয় ; কিন্তু অনেক মাস, অনেক বৎসর অভ্যাস করতে করতে উহা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়, তখন আপনা-আপনি হতে থাকে । এক সময়ে এতে জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছার প্রয়োজন হত, এখন আর উহার প্রয়োজন থাকে না, জ্ঞান পূর্বক ইচ্ছা ব্যতীতই উহা নিষ্পন্ন হতে পারে, একেই বলে 'স্বাভাবিক জ্ঞান' । প্রথমে ইহা ইচ্ছাপূর্বক কর্ম ছিল, পরে উহাতে আর ইচ্ছার প্রয়োজন থাকল না । অতএব, মানুষ বা মানবেতর প্রাণীতে যাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বা কর্ম বলা হয়, তা পূর্ববর্তী ইচ্ছাকৃত কার্যের ক্রম অভ্যাসের ফল মাত্র । আর ইচ্ছাকৃত কার্য বলায় এটা স্বীকৃত হল যে, এর অভ্যাস পূর্বে করা হয়েছে, পূর্বে এর অভিজ্ঞতা ছিল, এবং দীর্ঘদিন অভ্যাসের ফলে আজ আপনা-আপনিই সংঘটিত হচ্ছে । অতএব, স্বাভাবিক জ্ঞান বা কর্ম পূর্ব অস্তিত্ব প্রমাণ করে । পূর্ব-অস্তিত্বের সংস্কার নিয়ে মানুষ বা প্রাণী পুনর্জন্ম গ্রহণ করে স্বাভাবিক ক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হচ্ছে ।

এখানে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে পুনর্জন্মবাদের সাদৃশ্য রয়েছে । পুনর্জন্মবাদ যেমন বলে মানুষ বা জীব পূর্ব-সংস্কার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, ঠিক তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানও বলে যে, প্রত্যেক মানুষ বা প্রত্যেক জীব কতকগুলি অনুভূতির সমষ্টি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে । কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য এখানে যে, পুনর্জন্মবাদ বলে যে, ঐ পূর্ব-সংস্কারগুলি নিয়ে এক শাশ্বত আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে । কিন্তু বিজ্ঞান কোন শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাস করে না । বিজ্ঞান বলে ঐ অনুভূতিগুলো হচ্ছে শরীরের ধর্ম । উহা হচ্ছে 'বংশানুক্রমিক সঞ্চার' (Hereditary transmission) মাত্র । আমি যে সব সংস্কার নিয়ে জন্মেছি, সেগুলি আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত সংস্কার । ক্ষুদ্র জীবাণু হতে মনুষ্য পর্যন্ত সকল সংস্কারই আমার মধ্যে রয়েছে । আর এটা সম্ভব হয় জীবাণু কোষের (Bio-plasmic cell) দ্বারা । একটি শুক্রাণু এবং একটি ডিম্বাণু মিলে নিষিক্ত ডিম্বাণু (Zygote) গঠন করে । এই নিষিক্ত ডিম্বাণু হতে ক্রম পর্যায় জীবের উদ্ভব ঘটে । এই নিষিক্ত ডিম্বাণুতে থাকে ৪৬টি (২৩+২৩) ক্রোমোজম । ক্রোমোজমে থাকে আবার জীন্‌স (genes)।এ জীন্‌স জীবের বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে । ল্যামার্ক মনে করতেন যে, পিতা-মাতার জৈবিক ও অর্জিত

Dhaka University Institutional Repository

উভয়বিধ গুণ শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু জার্মান প্রাণীতত্ত্ববিদ অগাস্ট ওয়াইজম্যান প্রথম যুক্তি দিয়ে দেখান যে, পিতা-মাতার অর্জিত গুনাবলী শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হয় না, কেবল জৈবিক গুলাবলী সঞ্চারিত হয়।

হিন্দুধর্ম আধুনিক বিজ্ঞানের এ বক্তব্যকে স্বীকার করে যে, জীবাণু কোষ পরবর্তী প্রজন্মের জৈবিক বৈশিষ্ট্যে প্রভাব বিস্তার করে। কেননা হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুতে স্থুল দেহের বিনাশ ঘটে, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ বিদ্যমান থাকে। এ সূক্ষ্ম দেহ নিয়েই সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু জীবাণু কোষ বা জীনস মানসিক বৈশিষ্ট্য বা আত্মায় কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।একজন সমাজ-দরদী, নিস্বার্থ মানুষের সন্তান সমাজ বিরোধী ও স্বার্থপর হতে পারে। একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সন্তান দুর্নীতিপরায়ন হতে পারে। একজন সচ্চরিত্র লোকের সন্তান অসচ্চরিত্রের হতে পারে এবং হয়ে থাকে। অতএব, একজন ব্যক্তি থেকে তার সন্তান বা পববর্তী প্রজন্মের কর্মের ও গুণের ভিন্নতা এই কারণে হয় যে, তাদের আত্মা ভিন্ন। তাদের কর্মও ভিন্ন। প্রত্যেকের রয়েছে অবিভাজ্য ও শাশ্বত আত্মা। এই অবিভাজ্য ও শাশ্বত আত্মাই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।

বংশানুক্রমিক সঞ্চারবাদ প্রতিভাবান (Genius) বা ক্ষীণ বুদ্ধির (Moron) জন্মকে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির সন্তান ক্ষীণ বুদ্ধির এমনকি জড়ধীও (Idiot) হতে পারে। আবার বিপরীতক্রমে, একজন ক্ষীণ বুদ্ধির বা জড়ধী লোকের সন্তান প্রতিভাবান হতে পারে। আবার একই লোকের একটি সন্তান প্রতিভাবান এবং আরেকটি সন্তান ক্ষীণ বুদ্ধির হতে পারে। আধুনিক জীববিজ্ঞান একে দৈব (Chance) বলে অভিহিত করে। পুনর্জন্মবাদ অনুসারে, এটি কর্মের ফল। পূর্ব জন্মে যে যেরকম কর্ম করে সে রকম প্রকৃতির অধিকারী হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। কর্ম অনুসারে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ মানবেতর প্রাণী এমনকি কুকুর, শূকর, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৎস্য, কীট, সর্প ইত্যাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করে।[৩৪] কর্মই নির্ধারণ করে পরবর্তী জন্মের প্রকৃতি। আবার কর্মই পুনর্জন্মের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পুনর্জন্ম কর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্যকথায় — পুনর্জন্মবাদ কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে কর্মবাদ আলোচনা করা যাক।

৫ঃ২ঃ১। কর্মবাদ ঃ

'কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করতে হবে,' 'যেমন কর্ম তেমন ফল' এটাই কর্মবাদের মূল কথা। প্রত্যেক ভাল কর্ম ভাল পরিণতি সৃষ্টি করে আর প্রত্যেক মন্দ কর্ম মন্দ পরিণতি সৃষ্টি করে। আমার বর্তমানের কর্মের উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আমার কর্মের কোন ক্ষয় নেই। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মও আমার চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করে। আমি

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে শুভ ভবিষ্যৎ বা মন্দ ভবিষ্যতের দিকে দিয়ে যাই । আমিই আমার ভাগ্যের নির্মাতা । কর্মে আমি স্বাধীন । ইচ্ছানুযায়ী কর্ম করার অধিকার ও ক্ষমতা আমার আছে । এ ক্ষমতা আছে বলেই আমি আমাকে 'পরমার্থ' বা 'মোক্ষ' লাভের দিকে প্রধাবিত করতে পারি । কর্মবাদ আমাকে এ কথাই বলে — বাঞ্ছিত কর্ম করলে তুমি মোক্ষ লাভ করবে আর অবাঞ্ছিত কর্ম করলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে ।

লোকে পুণ্য কর্ম দ্বারা পুণ্যবান হয় এবং পাপ কর্ম দ্বারা পাপী হয় ।[৩৫] পুণ্য কর্ম বা পাপ কর্ম কোনটাই নষ্ট হয় না । প্রত্যেক কর্মই ফল উৎপাদন করে । এবং কর্মের এ ফল কর্তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হয় । কর্ম-ফলের ভোগ ইহ-জীবনে হতে পারে, আবার পর-জীবনেও হতে পারে । কারো যদি কর্ম-ফলের ভোগ এ জীবনে সম্ভব না হয় তাহলে তাকে কর্ম-ফল ভোগের জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয় । তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পুনর্জন্ম হচ্ছে পূর্ব-জীবনের কর্মের আবশ্যিক পরিণতি । এ পুনর্জীবনে যদি কারো কর্ম-ফল ভোগ শেষ না হয় তাহলে তাকে আবার জন্ম গ্রহণ করতে হয় । এবং যতদিন সে কর্ম-ফল ভোগ শেষ না করতে পারবে ততদিন সে জন্ম চক্রে আবদ্ধ থাকবে । কর্ম সংস্কার উৎপাদন করে । এবং সংস্কারই আত্মাকে পুনর্জন্ম গ্রহণে বাধ্য করে । আত্মা পূর্ব-জীবনের সকল সংস্কার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে । আত্মা পূর্ব-জীবনে যে সকল কার্য করেছে, যে সকল চিন্তা করেছে, সে সকল কর্ম ও চিন্তা । আত্মাকে বিশেষ দিকে পরিচালিত করে । তার সমবেত কার্য ও চিন্তা যে শরীরের উপযোগী, সে শরীর গ্রহণের জন্য সে এমন পিতা-মাতার নিকট যাবে যাদের নিকট হতে সে শরীর গঠনের উপযোগী উপাদান পাওয়া যাবে । এবং সে পিতা-মাতার মধ্য দিয়ে নতুন শরীর গ্রহণ করবে ।

সব ধরনের কর্ম পুনর্জন্ম বা জাগতিক দুঃখ-কষ্টের জন্য দায়ী নয় । হিন্দুধর্মে কর্মকে দু'ভাগে ভাগ কার হয় । সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম । কামনা-বাসনা, লোভ-মোহ ও আসক্তিযুক্ত যে কর্ম তা-ই সকাম কর্ম । এ সকাম কর্মই জাগতিক দুঃখ-ক্লেশ ও পুনর্জন্মের জন্য দায়ী । ''বিষয় চিন্তা করতে করতে মনুষ্যের তাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হতে কামনা, কামনা কোন কারণে প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হলে প্রতিরোধকের প্রতি ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হতে মোহ, মোহ হতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হতে বিনাশ ঘটে ।''[৩৬] কর্ম আছে কিন্তু তার মধ্যে আসক্তি নেই, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, মোহ নেই, ফলাকাঙ্খা নেই, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ভয়-অভয়, লাভালাভ ইত্যাদির চিন্তা নেই — এমন কর্মই নিষ্কাম কর্ম । ''আমাকে কিন্তু সে সকল কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না । কারণ, আমি সে সকল

Dhaka University Institutional Repository

কর্মে অনাসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত।"[৩৭] নিষ্কাম কর্মের কর্তার পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না, জাগতিক দুঃখ-কষ্ট তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, তাঁর মোক্ষ প্রাপ্তি লাভ হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মোক্ষ প্রাপ্ত আত্মার পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়না। এ আত্মা মৃত্যুর পর ব্রহ্মের সাথে বিলীন হয়ে যায়। ব্রহ্ম শাশ্বত, চিরন্তন, ধ্বংস ও পরিবর্তনের উর্ধ্বে। মহাপ্রলয়ের সময়ে ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়। যেসব আত্মা ব্রহ্মের সাথে বিলীন হয়ে যায় তারা ব্রহ্মের সাথে ধ্বংসের উর্ধ্বে থাকে। কিন্তু কর্ম অনুসারে যে সব আত্মার পুনর্জন্ম অবধারিত, লয়-প্রলয় বা মহাপ্রলয়ের[৩] সময়ে যদি সে সব আত্মা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগের অবকাশ কোথায় ? এবং পুনর্জন্মে মোক্ষ লাভের সাধনা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয় না কি ? এর একটা উত্তর অদ্বৈত বেদান্তে দেয়া হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, কোন অবস্থায়ই আত্মা ধ্বংস হয় না। আত্মা শাশ্বত। মোক্ষ লাভ না করার কারণে আত্মার মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয় না। বরং আত্মারা সুপ্ত অবস্থায় থাকে যেন তারা বিশ্রাম নিতেছে। পুনরায় জগৎ সৃষ্টি হবার পর আত্মারা কর্মশক্তি ফিরে পায়। এবং কর্মফল ভোগ করে।[৩৮]

হিন্দু ধর্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মও মনে করে যে, আমাদের দেহ ধারণ কর্মের উপর নির্ভর করে। কর্ম অনুযায়ী মানুষকে অবশ্যই ফল ভোগ করতে হয়। এক জীবনে কর্ম-ফল ভোগ শেষ না হলে বার বার জন্ম গ্রহণ করে কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কর্মের কোন ক্ষয় নেই। কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। কর্মবাদ কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ থাকা মানে যেমন তার কোন কার্য থাকবে, ঠিক তেমনি কর্ম থাকা মানে তার কোন ফল থাকবে। এ জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই। সকাম কর্ম অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত কর্ম সংসারের প্রতি বন্ধন সৃষ্টি করে। এ বন্ধনের কারণে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। এ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব না হলে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম সংসারের প্রতি কোন বন্ধন বা মোহ সৃষ্টি করে না। তাই নিষ্কাম কর্মের কর্তার নির্বাণ লাভ ঘটে। আর নির্বাণ লাভ ঘটলে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব একটি উপমা দিয়েছেন। আগুনে ভাজা শুকনা বীজ বপন করলে তা থেকে যেমন ফলোৎপাদন সম্ভব হয় না, তেমনি নির্বাণ লাভের পর কর্ম থেকে ফলোৎপাদন হয় না। এ কারণে নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।

---

[৩] লয়-প্রলয় এবং মহাপ্রলয় সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩ঃ৪ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ন্যায় জৈনধর্মও কর্মবাদে বিশ্বাসী । জৈন মতেও জীবকে তার কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করতে হয় । কর্মের কারণে আত্মায় ভোগ, লোভ-লালসা, কামনা, বাসনা,, মোহ, ক্রোধ ইত্যাদির সৃষ্টি হয় । সাধনার দ্বারা ইহ-জীবনে যদি এ কামনা-বাসনা-লোভ, লালসা দূর করা সম্ভব না হয় এবং নিরাসক্তভাবে কর্ম করা না যায় তাহলে সে কর্মের ফল ভোগ করার জন্য জীবকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয় । এবং তার কর্মই নির্ধারণ করে দেয় পরজীবনে সে কোন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করবে । তার স্বাস্থ্য কেমন হবে, বর্ণ কেমন হবে, গঠন, আকার, আয়ু ইত্যাদি কর্মের উপরই নির্ভর করে । এ দৃষ্টিকোণ থেকে জৈন ধর্ম আট প্রকার কর্মের কথা বলে । (১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম — যে কর্ম আত্মার যথার্থ জ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করে । (২) দর্শনাবরণীয় কর্ম — যে কর্ম সম্যক দৃষ্টিকে ব্যাহত করে । (৩) মোহণীয় কর্ম — যে কর্ম মোহের সৃষ্টি করে জীবকে অশুভ কর্মে লিপ্ত করে । (৪) বেদনীয় কর্ম — যে কর্ম সুখ-দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করে । (৫) নাম কর্ম — যে কর্মের উপর দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সৃষ্টি নির্ভর করে । (৬) অন্তরায় কর্ম — যে কর্ম জীবের শুভ কর্ম সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । (৭) গোত্র কর্ম — যে কর্ম বংশ নিরূপণ করে । এবং (৮) আয়ুষ্কর্ম — যে কর্ম জীবের আয়ু কাল নির্ধারণ করে । এসব কর্মের উর্ধ্বে থেকে জীব যদি নিরাসক্ত বা নিষ্কাম করতে সক্ষম হয় তাহলে তার কৈবল্য লাভ ঘটে । অন্যথায় তাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় ।

উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য কর্ম বিজ্ঞান ও হিন্দু তথা ভারতীয় কর্মবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে । পাশ্চাত্যের কর্ম-জীবনের মূলে রয়েছে অভিমান, আত্ম-প্রতিষ্ঠা, বিশ্বময় আমিত্বের প্রসার । আর ভারতীয় কর্মবাদের মূলে রয়েছে নিরভিমানিতা, অহংত্যাগ ও হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত জগৎ প্রতিষ্ঠা । পাশ্চাত্য কর্মী ফলাকাঙ্খী, সুখান্বেষী, পক্ষান্তরে, কর্মবাদী নিষ্কাম, শান্ত ও দুঃখ নিরোধী । পাশ্চাত্য কর্ম ভোগ, বন্ধন আনে আর ভারতীয় কর্মবাদ ভোগকে নিরসন করে মোক্ষকে অর্জন করে । সর্বোপরি পাশ্চাত্য কর্ম বিজ্ঞানের পশ্চাতে রয়েছে জাগতিকতা আর কর্মবাদের পশ্চাতে রয়েছে আধ্যাত্মিকতা ।

৫ঃ২ঃ২ । পুনর্জন্মবাদের বিচার ঃ

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে পুনর্জন্মবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । পুনর্জন্মবাদেব একটি বড় সার্থকতা হচ্ছে যে, এর বিশ্বাস মানুষের প্রবৃত্তি ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে । এর বিশ্বাস মানুষকে অসৎ গুণাবলী পরিত্যাগ করে সৎ গুণাবলী অর্জন

Dhaka University Institutional Repository

করতে শেখায় । মানুষকে পরিণত করে প্রকৃত মানুষে । এ সত্ত্বেও এ বিশ্বাসের কিছু তাত্ত্বিক অসঙ্গতি রয়েছে বলে মনে হয় । যেমন ঃ

(১) পুনর্জন্মবাদ অনুসারে এই পার্থিব জীবন পূর্বের জীবনের কর্মের ফল স্বরূপ । এ জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট হচ্ছে তা পূর্ব-জীবনের সকাম কর্মের কারণে । এখন প্রশ্ন হচ্ছে — মানুষের যখন প্রথম আবির্ভাব হল তার পূর্বে তার কোন জীবন ছিল না । কিন্তু প্রথম আবির্ভাবটিকে কোন কর্মের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় ? প্রথম জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট তা কোন্ জীবনের কর্মের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আখ্যা দেয়া যায় ? ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের পুনর্জন্মবাদের পক্ষে এই প্রথম আবির্ভাব এবং প্রথম জীবনের দুঃখ-কষ্টের সুস্পষ্ট এবং সর্বজন গ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন ।

(২) পুনর্জন্মবাদ অনুসারে এ জগতে আমি পূর্বজীবনের কর্মের শাস্তি স্বরূপ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি । এখন একজন প্রশ্ন করতে পারে পূর্বজীবনের কোন্ কর্ম বা অপরাধের দরুন আমি শাস্তি ভোগ করছি আমিতো সে কর্ম বা অপরাধের স্মরণ করতে পারছি না । অতএব পূর্বে জীবন ছিল এটা কি করে মেনে নেয়া যায় ? পুনর্জন্মে বিশ্বাসীদের পক্ষে এর সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর দেয়া কঠিন । যদিও তাঁরা এ কথা বলবে যে, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মরণ না থাকা অনস্তিত্ব প্রমাণ করে না । যেমন শিশু কালের সিংহভাগ ঘটনা ও অভিজ্ঞতা আমাদের স্মরণ নেই । কৈশোরের অনেক ঘটনাও আমাদের স্মরণ নেই । এর অর্থ এ নয় যে, শৈশব ও কৈশোরে আমাদের অস্তিত্ব ছিল না । তাঁদের কেউ কেউ এ কথাও বলে যে, মোক্ষ অর্জনের পরে পূর্ব-জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতা স্মরণ করা সম্ভব হয় । কিন্তু শৈশব-কৈশোরে সংঘটিত অভিজ্ঞতা ও ঘটনা থেকে পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতা ও ঘটনা ভিন্ন । শৈশব-কৈশোর এবং যৌবন-বার্ধক্যের মধ্যে কর্মের প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার নেই । এমন নয় যে, শৈশবে আমি বিশেষ কোন কর্ম করেছি বিধায় বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি, আর শৈশবে সে কর্ম না করলে আমি চির কিশোর বা চির যৌবনা থাকতাম । কিন্তু আমার এ জীবন পূর্ব জীবনের কর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, পূর্ব জীবনের কর্ম ফল ভোগের জন্যই আমার পুনরায় জন্ম হয়েছে । পূর্বজীবনের কর্মের শাস্তি স্বরূপ বা পুরস্কার স্বরূপ আমি এ জীবন পেয়েছি । এখন কোন কর্মের জন্য আমি এ শাস্তি ভোগ করতেছি, তা যদি আমি বুঝতে না পারি, তাহলে এ শাস্তির অর্থ কী ? অনুতপ্ত হওয়ার বা সংশোধিত হওয়ার সুযোগই বা কোথায় ? দ্বিতীয়তঃ মোক্ষ লাভের পর পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতার স্মরণ হলেও তার কোন তাৎপর্য নেই । কেননা তা জীবন সাধনায় বা মোক্ষ প্রাপ্তিতে কোন ভূমিকা রাখে না । মোক্ষ প্রাপ্ত ব্যক্তি অনুতপ্ত হওয়া, অতীত কর্ম তথা কামনা-বাসনার উর্ধ্বে চলে যায় । এ অবস্থায় নিষ্কাম কর্ম তার অস্থি

Dhaka University Institutional Repository

মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। অতএব, অতীত অভিজ্ঞতার স্মরণ এ অবস্থায় তাঁর জন্য কোন শিক্ষণীয় কিছু বয়ে আনে না। সুতরাং পূর্বজীবনের অস্তিত্বকে পুনর্জন্মবাদ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে বলে মনে হয় না।

(৩) অনেকে মনে করেন যে, পুনর্জন্মবাদ জীব বিজ্ঞানের একটি সাধারণ নিয়ম-'সদৃশ উৎপাদন' (Like begets like) মতের বিরোধী মত উপস্থাপন করে। 'সদৃশ উৎপাদন' মতে আমরা দেখি যে, মানব থেকে মানবের জন্ম, হাতি থেকে হাতির জন্ম, পিপড়া থেকে পিপড়ার জন্ম, শূকর থেকে শূকর, কুকুর থেকে কুকুর, সর্প থেকে সর্প, বটবৃক্ষ থেকে বটবৃক্ষ, তমাল থেকে তমাল, ইত্যাদির জন্ম। কিন্তু পুনর্জন্মবাদ মতে কৃত কর্ম অনুসারে মানুষ মানবেতর প্রাণী এমনকি ব্যাঘ্র, সিংহ, সর্প, কুকুর, শূকর ইত্যাদি আকৃতিতে জন্ম গ্রহণ করে। এটা বিবর্তনবিরোধী মত। বিবর্তন সব সময় উর্ধ্বমুখী, নিম্নমুখী নয়। বিবর্তন ক্রমোন্নতি ও অগ্রগতির দিকে ধাবিত হয়। মানুষের মানবেতর প্রাণীতে জন্ম এ এক নিম্নমুখী প্রক্রিয়া। এ মত মানুষের মর্যাদাকে হেয় করে ফেলে। অবশ্য, স্বামী অভেদানন্দসহ অনেকে মনে করেন যে, পুনর্জন্মে মানুষ মানবীয় স্তরেই থাকে। তাকে পশু, পাখি,, কীট-পতঙ্গের রূপ ধারণ করতে হয় না। কৃতকর্ম অনুসারে সে নীচ স্বভাব ধারণ করে। মানবীয় আকৃতিতেই সে পশুজীবন যাপন করে।[৩৯] এ মত গ্রহণ করা যায় না, কারণ ধর্মগ্রন্থকে ব্যাখ্যাতার চেয়ে অধিকতর প্রাধান্য দিতে হয়। খোদ উপনিষদে মনুষ্যের মানবেতর প্রাণী হিসেবে জন্মের উল্লেখ স্পষ্টভাবে রয়েছে (*ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৫/১০/৭, *কৌষীতকি উপনিষদ*, ১/২)। সুতরাং পুনর্জন্মবাদ বিবর্তনকে অস্বীকার করে।

আসলে বিবর্তনকে অস্বীকার করা পুনর্জন্মবাদের উদ্দেশ্য নয়। এবং পুনর্জন্মবাদ বিবর্তনকে অস্বীকারও করে না। বরং পুনর্জন্মবাদের স্পিরিট হচ্ছে মানুষকে যথার্থ মানুষে পরিণত করা। মানুষকে কাম, লোভ, মোহ, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত রাখা। এবং মানব জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৫ঃ২ঃ৩। **কর্মবাদের মূল্য ঃ**

পুনর্জন্মবাদ যে কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কর্মবাদেরও মূল্য ও তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। কর্মবাদ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদেরকে আশাবাদী করে তোলে। একজন মানুষের বর্তমান কর্ম ও অবস্থা যাই হোক না কেন সে একটা সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। কেননা সে জানে তার আজকের কর্মই তার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে। সে অতীতের ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক কর্ম পরিত্যাগ করে মঙ্গলজনক ও উপকারী কর্ম সম্পাদন

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারে ।শত বাধা-বিপত্তি, রোগ-শোক, বিপর্যয়ের মাঝেও সে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে । তার কর্মই তাকে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করবে । সে নিজেই নিজের ভবিষ্যতের স্রষ্টা । নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাতা ।

'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল' — কর্মবাদ এ নীতিই প্রতিষ্ঠিত করে । কর্মবাদ কর্ম দিয়ে মানুষের মূল্যায়ন করে । মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে তার কর্ম । পদ মর্যাদা, বিত্ত-বৈভব, বংশ, জাতীয়তা ইত্যাদি মানুষের মর্যাদা নিরূপণ করে না । বরং কর্মই তার মর্যাদা নির্ধারণ করে । সদ্‌গুণই উত্তম । কর্মই জগতের হিংসা-বিদ্বেষ, মোহ-লোভ থেকে মানুষকে মুক্ত রাখতে পারে । আজকের এক অবহেলিত মানুষ কর্মগুণে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে । কেবল তাই নয়, কর্মবাদ মানুষকে নিয়ে যায় ব্রহ্মের কাছাকাছি । এ পার্থিব জগতে থেকেই একজন মানুষ ব্রহ্মভাব লাভ করতে পারে । এ কর্মই মৃত্যুর পর মানুষকে ব্রহ্মের সাথে মিলিত করে দিতে পারে ।

কর্মবাদ অমঙ্গলের সমস্যা, অসমতা, দুঃখভোগ ইত্যাদির একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেয় । এই পৃথিবীতে যত হিংসা-বিদ্বেষ, রোগ-শোক, দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি মানুষের অতীত কর্মের কারণেই ঘটে থাকে । মানুষেরা নিজের কর্মের দ্বারাই জগতকে দুঃখময় করে তোলে, আবার কর্ম দ্বারাই জগতকে সুখময় করতে পারে । কর্মের দ্বারা ব্যক্তি নিজে যেমন শান্তিতে থাকতে পারে তেমনি কর্মের দ্বারা জগতকেও শান্তিময় করে তুলতে পারে । সুতরাং কর্মবাদকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ।

৫ ঃ ৩ । স্বর্গ ও নরক ঃ

হিন্দু ধর্মে আত্মা মৃত্যুর পর স্বর্গে বা নরকে যায় বলে একটি ধারণা আছে । এ ধারণা বেদে অত্যন্ত জোরালোভাবে রয়েছে । উপনিষদ, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি মতে, আত্মা স্বর্গ বা নরক ভোগ শেষে পুনরায় মর্তে ফিরে আসে এবং পুনর্জন্ম গ্রহণ করে । কিন্তু বেদে পুনর্জন্মের ধারণা নেই । ঋগবেদে স্বর্গকে একটি আনন্দ উপভোগ ও ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ তৃপ্তির স্থান বলে অভিহিত করা হয়েছে ।[৪০] মানব জীবনে সাধনার উদ্দেশ্য হল দেব-দেবীর ন্যায় অমরতা লাভ করা । দেব-দেবীরা স্বর্গে বিশুদ্ধ শান্তি উপভোগ করে । তাঁরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উর্ধ্বে । তাঁরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে । মানুষও দেব-দেবীর এ গুণাবলী অর্জন করতে চায় । মানুষ দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করলে দেব-দেবীরা খুশী হয়ে মানুষকে অমরতা দান করেন । অর্থাৎ যারা দেব-দেবীর উপাসনা করে তারা অমরতা লাভ করতে পারে ।[৪১] এক কথায় দেব-দেবী যার প্রতি প্রসন্ন সেই স্বর্গ-সুখ ভোগ করে । এর নিমিত্তে দেবদেবীর জন্য নানা আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিপালন বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে । আর যারা পুণ্য-কর্ম করে না, পূজা-অর্চনায় মন নেই । মৃত্যুর পর তাদের

Dhaka University Institutional Repository

আত্মার স্থান হয় নরকে বা অন্ধকার পাতালে (Dark abyss)। এ পাতাল থেকে সে কখনো ফিরে আসতে পারে না । ঋগবেদ মতে, 'যারা সৎ কর্ম করে না, বা সৎ কর্ম অনুষ্ঠানে অবহেলা করে তারা অধোগামী হয়।[৪২]

কিন্তু উপনিষদ, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি মতে স্বর্গে অনন্ত কাল থাকার অবকাশ নেই। পুণ্য-কর্ম ক্ষয় করার জন্যই আত্মা স্বর্গে যায়। এবং পুণ্য-কর্ম ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত আত্মা স্বর্গে অবস্থান করে।[৪৩] মৃত্যুর পর আত্মা ইহ-জাগতিক চিন্তা, কামনা-বাসনা ও কর্ম সঙ্গে নিয়ে যায়। চিন্তা, কামনা ও কর্মের উপরই আত্মার গতি নির্ভর করে। এ গতি সুখ ভোগের জন্য স্বর্গে বা শাস্তিভোগের জন্য অধঃস্তরে — যেখানেই হোক, সেখান থেকে আত্মাকে পুনঃজন্ম নিতে হবে।[৪৪] এখানে হিন্দুমতের সাথে খ্রিস্ট, ইসলাম ও জরথুস্ট্র মতের পার্থক্য সুস্পষ্ট। শেষোক্ত ধর্মগুলো স্বর্গকে চরম ও স্থায়ী সুখভোগের আবাস বলে মনে করে। এখান থেকে কেউ ফিরে আসে না। এ স্বর্গ মানুষের চরম কাম্য বিষয়। কিন্তু হিন্দু মতে স্বর্গ ক্ষণিকের। এ স্বর্গ হিন্দুর চরম কাম্য নয়। সাধারণত হিন্দু ধর্মে সাত ধরনের স্বর্গের কথা বলা হয়। এবং মনে করা হয় যে, হিমালয়ের উত্তর দিকে এ সব স্বর্গের অবস্থান। এদের চতুর্দিকে রয়েছে ঐশী বেষ্টনী (Divine enclosure)। এরা প্রচ্ছন্ন, কেবল যেসব আত্মা স্বর্গে গমন করে তারাই এদের অবলোকন করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের স্বর্গের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোকের আবার রয়েছে কয়েকটি প্রকার ; যেমন ঃ (ক) সত্য লোক (খ) তপোলোক (গ) জনরলোক (ঘ) মহরলোক। এ সব স্বর্গ বিভিন্ন দেব-দেবীর আবাস। আরেক ধরনের স্বর্গ আছে। এদেরকে স্বর-লোক বলে অভিহিত করা হয়। এটা ইন্দ্রিয় সুখের স্থান। এ স্বর্গে ইন্দ্র দেবতার বাস বলে একে ইন্দ্রলোকও বলা হয়। এ ছাড়া বৈকুণ্ঠ, গোলোক, অলোক, কৈলাস, মারুত প্রভৃতি নামের স্বর্গ রয়েছে।[৪৫]

পুরাণে নরকের বিভিষিকাময় অবস্থার বর্ণনা আছে। এতে সাত ধরনের নরকের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ পঞ্চাশ ধরনের নরকের কথা বলেছেন। বিভিন্ন নরকে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণা ও কষ্টভোগের ব্যবস্থা রয়েছে। নরক সাতটি হচ্ছে (ক) পুত (খ) অবিচি (গ) সংহাত (ঘ) তামিস্র বা পুতি-মৃত্তিকা (ঙ) ঋজিশা (চ) কুড়মল এবং (ছ) কাকোল বা তলাতল।[৪৬]

৫ঃ৪। ব্রহ্মের সাথে একীভূত হওয়া ঃ

হিন্দুধর্ম অনুসারে, আত্মার চরম পরিণতি হচ্ছে ব্রহ্মের সাথে একীভূত হওয়া, ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়ে শাশ্বত আনন্দ লাভ করা। মানব-জীবন দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা, পেরেশানীতে পূর্ণ। অবিদ্যা ও কর্মের কারণে মানুষ এ

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। অবিদ্যা হচ্ছে তার উৎস ও প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞানতা। মানুষ ব্রহ্ম থেকে এসেছে, তার আত্মা ব্রহ্মের অংশ। তাই তার স্বভাব-প্রকৃতি হবে ব্রহ্মের ন্যায়। কিন্তু জাগতিক আকর্ষণ, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ইত্যাদির প্রভাবে সে নিজেকে ভুলে যায়, নিজের উৎস ও প্রকৃতিকে ভুলে যায়। এখানেই ঘটে তার সকল বিপত্তি। আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন এর বিস্মৃতিই তাকে জাগতিক দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে। সে যখন জগৎ ও আত্মাকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন মনে করে, জগতের স্বরূপ সে যখন উপলব্ধি করতে না পারে, তখন সে জাগতিক আসক্তিপূর্ণ নানা কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। জাগতিক লাভ-লোকসান, ভাল-মন্দ, জয়-পরাজয় তার সামনে অত্যন্ত তীব্রভাবে এসে হাজির হয়। এগুলো সম্পর্কে সচেতনতা মানুষকে অধিকতর ব্যাকুল করে তোলে। এ ব্যাকুলতা তাকে প্রতিনিয়ত সকাম কর্মে লিপ্ত রাখে। আর এ সকাম কর্মের প্রতিফল মানুষকে ভোগ করতেই হয়। এ জন্মে প্রতিফল ভোগ শেষ না হলে তাকে পুনরায় জন্ম নিয়ে প্রতিফল ভোগ করতে হয়। অপরদিকে, জাগতিক লাভ-লোকসান, সুখ-দুঃখ, লোভ-মোহ, কামনা-বাসনা যত কমতে থাকে আত্মা ও ব্রহ্মের উপলব্ধি ততবৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং যখন মানুষ আত্মা ও ব্রহ্মের অদ্বৈততা উপলব্ধি করে, তখন তার পক্ষে নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব হয়। আর নিষ্কাম কর্ম সম্ভব হলে সে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করে। জীবদ্দশায় জাগতিক দুঃখ-কষ্ট থেকে এ মুক্তিকে জীবন্মুক্তি নামে অভিহিত করা হয়।

জীবন্মুক্তির পরও আত্মা পার্থিব দেহে বিদ্যমান থাকতে পারে। অদ্বৈত বেদান্তে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা — প্রারব্ধ, সঞ্চিত এবং সঞ্চীয়মান কর্ম। যে কর্মের ফল ইতোমধ্যে কার্যকর হতে শুরু করেছে সে কর্মকে প্রারব্ধ কর্ম বলে। যে অতীত কর্মের ফল সঞ্চিত রয়েছে তাকে সঞ্চিত কর্ম বলে। আর বর্তমানে যে কর্ম করা হচ্ছে তার যে ফল সঞ্চিত হচ্ছে তাকে সঞ্চীয়মান কর্ম বলে অভিহিত করা হয়। অদ্বৈত জ্ঞান অর্জিত হলে সঞ্চিত ও সঞ্চীয়মান কর্ম-ফল নষ্ট হয়ে যায়।কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল নষ্ট হয় না। দেহ প্রারব্ধ কর্মের ফল। তাই জীবন্মুক্তির পরও দেহ বর্তমান থাকে। ফলে এ অবস্থায় জীবের দেহাত্মবোধ থাকে না। জগতের প্রতি তার কোন আসক্তি থাকে না। জগৎ আর তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনা তাকে এতটুকু বিচলিতকরতে পারে না। এ অবস্থায় আত্মা ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।[৪৭] এ অবস্থায় মৃত্যু হলে স্থূল দেহের সাথে সাথে সূক্ষ্মশরীরও বিনষ্ট হয়। একে আত্মার বিদেহ মুক্তি বলে।

বিদেহ মুক্তি দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমতঃ জীবন্মুক্তি লাভের পর যদি মৃত্যু হয় তাহলে তাকে বিদেহ মৃত্যু বলে। দ্বিতীয়তঃ জীবন্মুক্তি ঘটেনি এ অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার পর যেসব আত্মা দেব যানে ব্রহ্মলোকে যায় সে সব

আত্মাদের মধ্যে যেসব আত্মা (ব্রহ্মলোকে) অদ্বৈত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয় তাদের বিদেহ মুক্তি ঘটে এবং তাদের পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না ।[৪৮] অবশ্য কোন কোন পণ্ডিত এ ধরনের বিদেহ মুক্তিকে কাল্পনিক বলে অভিহিত করেন । তাঁদের মতে, জীবন্মুক্তির পর মৃত্যু হলেই কেবল বিদেহ মুক্তি ঘটে । যাই-হোক, এটা অনস্বীকার্য যে, বিদেহ মুক্তির পর আত্মার পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না ।

বিদেহ মুক্তির পর আত্মা ব্রহ্মে গিয়ে মিলিত হয় । এ মিলন অপর বা অপরিচিত সত্তায় মিলন নয় । এ মিলন হচ্ছে উৎসের নিকট প্রত্যাবর্তন করা । উপনিষদ বিভিন্ন উপমার সাহায্যে এ অবস্থাকে প্রকাশ করেছে । ''প্রবাহমান নদী যেমন স্বীয় বৈশিষ্ট্য, স্বভাব পরিত্যাগ করে সমুদ্রে গিয়ে নিজেকে সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনি জ্ঞানী পুরুষ স্বীয় বৈশিষ্ট্য-স্বভাব পরিত্যাগ করে ব্রহ্মে গিয়ে নিজেকে ব্রহ্মের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে । লবন যে রকম পানিতে একাকার হয়ে যায় জীবাত্মাও তেমনি ব্রহ্মের সাথে একীভূত হয়ে যান ।[৪৯] আত্মা ব্রহ্মের সাথে যখন মিলিত হয়, তখন তার সমস্ত কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটে । সে যেন সকল কাম্য ও ভোগ্যবস্তু পেয়ে যায় । ব্রহ্মের মধ্যে যেন তাবৎ কাম্যবস্তু বিদ্যমান আর তাবৎ কাম্য বস্তুকে যেন সে একসঙ্গে ভোগ করে ।[৫০] ব্রহ্মের সাথে মিলিত হয়ে আত্মা শাশ্বত সুখ ও পরম আনন্দ ভোগ করে । এ সুখ স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় । এ সুখ ও আনন্দ থেকে আত্মার কখনো বিচ্যুতি ঘটে না ।

এখানে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন ওঠে যে, ব্রহ্মের সাথে একীভূত হওয়ার পর জীবাত্মা তার অস্তিত্ব হারায় কি-না ? এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে যে, ব্রহ্মের সাথে মিলনে আত্মা তার অস্তিত্ব হারায় না । আত্মা শাশ্বত, চিরন্তন, ক্ষয় ও পরিবর্তনের উর্ধে । তাই আত্মা কখনো অস্তিত্বহীন বা নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে না । আত্মা ব্রহ্মে গিয়ে চরম উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধ অমরতা লাভ করে । ব্রহ্মের সাথে মিলে আত্মা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ম হয় — এ কথার অর্থ হচ্ছে আত্মা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে ব্রহ্মের ন্যায় পরম স্বাধীনতা ও অসীমতা ভোগ করে । আত্মা তখন যা খুশি তাই করার ক্ষমতা অর্জন করে । উপনিষদ আত্মার এ উৎকর্ষকে প্রকাশ করেছে এভাবে ঃ ''জ্ঞানসম্পন্ন লোক এ লোক হতে প্রত্যাগমন করে অর্থাৎ বিষয়াসক্তি দূর করে প্রথমে অন্নময় আত্মাকে (আত্মভাবে) প্রাপ্ত হয়, তারপর প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়, অতঃপর মনোময় আত্মাকে সাক্ষাৎ করে । ক্রমে বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয় এবং পরে আনন্দময় আত্মাকে লাভ করে । শেষে ইচ্ছামত অন্ন ও রূপের অধিকারী হয়ে এ পৃথিবী প্রভৃতি লোকে সঞ্চরণ করতে থাকে ।''[৫১] সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মাকে আলিঙ্গন করে পরম সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দ উপভোগ করে । পূর্ব-সংস্কার ও বিষয়-মুক্তি তার চেতনা থেকে অন্তর্হিত হলেও আত্ম প্রত্যয় বিলুপ্ত হয় না । একটা সুহানুভূতির সাথে আত্মপ্রত্যয় জড়িত থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে ইসলাম ঃ

মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে ইসলামী মত ইহুদী-খ্রিস্টান মতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ । অবশ্য ভারতীয় ধর্ম মতের সাথে ইসলামী মতের পার্থক্য প্রকট । কুরআন এবং হাদীসে মরণোত্তর জীবনের সুস্পষ্ট চিত্র রয়েছে । তবে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । মরণোত্তর জীবনের সম্যক আলোচনায় জীবনের তাৎপর্য, মৃত্যুর অর্থ, আত্মার অমরত্ব পুনরুত্থান-পূর্ব অবস্থা, পুনরুত্থান, বিচার দিবস, বেহেশত-দোযখ, আল্লাহর সান্নিধ্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা প্রাসঙ্গিক ।

৬ । মানব জীবনের তাৎপর্য ঃ

মানব জীবন অত্যন্ত দীর্ঘ একটি পথ-পরিক্রমা । বিভিন্ন স্তর ও অবস্থার মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে । ভূমিষ্ঠ হওয়ার মধ্য দিয়ে একজন মানবের অস্তিত্বের সূচনা হল তা নয়, বরং তার অস্তিত্বের সূত্রপাত বহু বছর পূর্বে । ভূমিষ্ঠের মধ্য দিয়ে একটা স্তরে উপনীত হল মাত্র । ইসলাম অনুসারে, আল্লাহ তাবৎ আত্মাকে একই সময়ে সৃষ্টি করেছেন । এবং এ পৃথিবীতে কোন মানব প্রেরণের পূর্বে এ সকল আত্মার নিকট থেকে তাঁর প্রভুত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন । সকল আত্মা 'আলমে আরওয়াহ' বা রূহের জগতে অবস্থান করে । এ সব আত্মাকে আল্লাহ পর্যায়ক্রমে মাতৃগর্ভে ভ্রূণে প্রেরণ করেন ।[৫২] পরে ভূমিষ্ঠের মধ্য দিয়ে সে এ পার্থিব জীবন লাভ করে । এরপর মৃত্যুতে এ পার্থিব জীবনের অবসান ঘটিয়ে জীবনের নতুন আরেকটি স্তরে সে উপনীত হয় ।

রূহের জগতের জীবনে মানবের কোন দায়-দায়িত্ব নেই । সেটা ঐশী জীবন । সেখানে পছন্দ, নির্বাচন, কর্ম বা সুখ-দুঃখের বালাই নেই । কিন্তু পার্থিব জীবন মানবের কর্ম তৎপরতার জীবন । এ জীবনে তার কর্মের জন্য তার নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে । এবং তার কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে । এ জীবনের কর্মের উপর তার পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে । পরকালীন জীবনে তার কোন কর্ম তৎপরতা, দায়-দায়িত্ব থাকবে না । সেখানে সে কেবল পার্থিব কর্মের ফল ভোগ করবে ।

মূলত ইসলাম মরণোত্তর জীবনকেই প্রাধান্য দেয় । ইহ-জীবন ক্ষণস্থায়ী, মরণোত্তর জীবন স্থায়ী ও অনন্ত । তবে মরণোত্তর বা পরকালীন জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে ইহ-জীবনের কর্মের উপর । পার্থিব জীবনে যে পুণ্য-কর্ম করবে তার পরিণতি শুভ হবে, আর যে পাপাচার করবে তার পরিণতি অশুভ হবে । পুণ্য ও পাপাচারের মানদণ্ড হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

আলকুরআন ও পয়গম্বর (স:) এর সুন্নাহ । তাই জীবন পরিচালিত হওয়া চাই কুরআন নির্দেশিত মত ও পয়গম্বর (স:) প্রদর্শিত ও অনুমোদিত পথে । ইসলাম আল্লাহর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য দাবী করে । আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে —''ওয়া'বুদূ রাব্বাকুমুল্লাজি খালাকাকুম'' — তোমরা সে প্রতিপালকের দাসত্ব কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন । আর দাসত্বের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ মানব ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন ।[৩৩] তাই ইসলাম অনুসারে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের মধ্য দিয়ে জীবন সার্থক হয়ে ওঠে ।

জীবন কোন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয় । এমন নয় যে, প্রকৃতির নিয়মে জীবনের উদ্ভব ঘটে, আবার প্রকৃতির নিয়মে জীবনের অবসান ঘটে । জীবন প্রকৃতির ক্রীড়নক মাত্র নয় । জীবনের সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে । মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে । অসংখ্য বিকল্পের মধ্যে সে যে কোনটিকে বেছে নিতে পারে । কোন্‌টি ভাল বা মন্দ, উচিত-অনুচিত, সঠিক-ভ্রান্ত তা তার সামনে সুস্পষ্ট । গ্রহণ-বর্জনের ক্ষমতা তার রয়েছে । এ কারণে তাকে তার কর্মের জন্য দায়ী করা যুক্তিসঙ্গত । ইসলাম দায়িত্বের ধারণাকে অত্যন্ত জোরালোভাবে উপস্থাপন করে । ইসলাম অনুসারে বয়োঃপ্রাপ্তির পর মানুষকে প্রতিটা সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করা হবে এবং অসৎকর্মের জন্য শাস্তি দেয়া হবে । এমনকি জীবনব্যাপী আয়-ব্যয়ের জন্যও তাকে জবাবদিহি করতে হবে । প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-কাণ্ডেরও হিসাব দিতে হবে । এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তার জীবনকে নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করতে পারে না, এবং জীবনের উপর তার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নেই । তার প্রভুর আদেশ-নিষেধ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সন্তুষ্টি-ক্রোধ ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে জীবনাচরণ করতে হয় । এ দিক থেকে সে পরাধীন । সে যা খুশী তাই করতে পারে না, যে দিকে খুশি সে দিকে জীবনকে প্রধাবিত করতে পারে না । তাকে যাপন করতে হয় শৃঙ্খলিত ও সংযত জীবন । এ শৃঙ্খলিত ও সংযত জীবনের মধ্যেই তার সার্থকতা নিহিত ।

মানুষ বৈষয়িকতা ও জাগতিকতাকে অস্বীকার করতে পারে না । নানা প্রয়োজন ও স্বভাবগতভাবে তাকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-যাপন করতে হয় । এ সবের মাঝেও তার মনে প্রশ্ন জাগে সে কোত্থেকে এসেছে, কোথায় যাবে, এ জীবনে কী তার করণীয়, কিসে তার মঙ্গল, কিসে তার স্থায়িত্ব বা অমরতা প্রভৃতি । এ সব প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে বেড়ায় । এর উত্তর না পেলে সে চরম তৃপ্তিহীনতায় ভোগে । এ সব সম্পর্কে প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও উত্তর রয়েছে । এ পৃথিবীতে চেষ্টা-তদবির ব্যতীত কিছুই হয় না । কিন্তু মানুষ স্বীয় চেষ্টা-তদবির ব্যতীত এ পৃথিবীতে এসেছে । এবং সে যে স্থান ও কালে এসেছে সে স্থান ও কাল নির্বাচনেও তার কোন হাত ছিল

Dhaka University Institutional Repository

না । আবার তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে । কবে সে ইহলোক ত্যাগ করবে তাও সে জানে না । এতেও তার কোন হাত নেই । অন্যদের থেকে তার বৈচিত্র্য, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে । বহু চেষ্টা করেও সে অন্যের মধ্যে বিদ্যমান একটি অসাধারণ গুণ আয়ত্ত করতে পারে না । আবার অনায়াসে সে কোন জটিল কর্ম সম্পাদনের বিস্ময়কর ক্ষমতা রাখে । এ সবের পশ্চাতে সে এক পরম সত্তার অস্তিত্ব খুঁজে পায় । জগতের সবকিছুতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ, পরিকল্পনা, বিস্তৃত ও সুনিপুণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় । অণু থেকে সুবিশাল পর্বতরাজি, ক্ষুদ্র কীট থেকে বিশালদেহী প্রাণী সব কিছুই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করছে । কিন্তু জড় বা প্রাণী কিংবা তীক্ষ্ম ধীসম্পন্ন মানুষ কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, প্রত্যেকের অন্যের প্রতি কম-বেশী নির্ভরতা রয়েছে । এরা নিজেরা যেমন নিজেদেরকে অস্তিত্ববান করতে পারে না তেমনি এরা নিজেদেরকে নিজেরা রক্ষাও করতে পারে না । এমনিভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান তাদের পশ্চাতে এক বুদ্ধিময়, জ্ঞানী ও পরিকল্পনাকারী সত্তার অস্তিত্ব নির্দেশ করে । এ সত্তার নিকট মানুষ অবনত হয়, নিজেকে সমর্পণ করে এবং এ সত্তার আনুগত্যের মধ্য দিয়ে জীবনকে সার্থক করে তোলে ।

ইসলাম কর্মকুশল জীবনের কথা বলে । সংগ্রাম, শ্রম ও সাধনার মধ্য দিয়ে জীবনের উৎকর্ষ সাধনের শিক্ষা দেয় ইসলাম । তবে ইসলাম জাগতিক উৎকর্ষের চেয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে অধিক গুরুত্ব দেয় । ইসলাম জৈবিক ও মানসিক সকল যৌক্তিক প্রয়োজনকে অনুমোদন করে । তবে ইসলাম সীমা লঙ্ঘনকে নিরুৎসাহিত করে এবং অবৈধ ও অনাধিকার ভোগকে কঠোরভাবে নিষেধ করে । সংগ্রাম, শ্রম ও সাধনা দিয়ে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সার্থক করতে হয় । আল্লাহ বলেন, ''লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি কাবাদ''— আমরা মানুষকে শ্রম নির্ভর করে সৃষ্টি করেছি ।[৫৪]

মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মানুষের জন্য রয়েছে বেহেশত অথবা দোজখ । পার্থিব জীবনে যারা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে পারবে তারা পরজীবনে বেহেশতের অনন্ত সুখরাজি ভোগ করবে । আর যারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা পরজীবনে দোযখের নিদারুণ যন্ত্রনা ভোগ করবে । তাই ইসলাম মতে মানব জীবনের লক্ষ হচ্ছে দোযখের শাস্তি ভোগ থেকে নিস্তার এবং বেহেশত প্রাপ্তির সাধনা করা । অবশ্য সূফীদের মতে মানব জীবনের মূল লক্ষ হচ্ছে আল্লাহর প্রেম অর্জন করা । মরণোত্তর জীবনে আল্লাহর সান্নিধ্য ও মিলন লাভের জন্য সাধনার মধ্যেই পার্থিব জীবনের সার্থকতা নিহিত ।

Dhaka University Institutional Repository

৭ । মৃত্যুর তাৎপর্য ঃ

এ পার্থিব জীবন মানুষের জন্য স্থায়ী হয় না । একটা নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করার পর তাকে এ জগৎ ত্যাগ করতে হয় । এ ত্যাগ তার জন্য অপরিহার্য । এ ত্যাগকে ইসলাম মৃত্যু বা ইনতিকাল বলে অভিহিত করে । ইনতিকাল শব্দের অর্থ হচ্ছে স্থানান্তরিত হওয়া । সুতরাং ইসলাম মতে মৃত্যু মানে মানব সত্তার নিঃশেষ হওয়া নয় বরং এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করা বা এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় উপনীত হওয়া । কিন্তু এ স্থানান্তর পার্থিব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনকে বা শারীরিক এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় (যেমন — কৈশোর থেকে যৌবনে) উপনীত হওয়াকে বুঝায় না । এ হচ্ছে পার্থিব জগৎ থেকে অপার্থিব জগতে গমন, পার্থিব অবস্থা হতে অপার্থিব অবস্থায় উপনীত হওয়া । এ স্থানান্তর বা অবস্থান্তরের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এ স্থানান্তর ব্যক্তির ইচ্ছায় ঘটে না, এ স্থানান্তর ঘটে আল্লাহর ইচ্ছায় । এবং এ স্থানান্তর থেকে কখনো প্রত্যাবর্তন ঘটে না । তাই ইসলাম অনুসারে, মৃত্যু মানব সত্তার বিনাশ নয়, বরং একটা পরিবর্তন । মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে । কুরআন বলে, ''নিশ্চয় তোমরা বিভিন্ন স্তরে উপনীত হবে।''(৮৪ঃ১৯) পার্থিব জীবন তার জীবনের একটি স্তর । মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ স্তর অতিক্রম করে সে আরেকটি স্তরে উপনীত হয় । এ মৃত্যু আল্লাহ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটা ব্যবস্থা । মৃত্যুর সময় মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট । কিন্তু মানুষ সে সময় সম্পর্কে অবগত নয় । নির্ধারিত সময়েই মানুষের মৃত্যু হবে । এক মুহূর্ত আগে বা এক মুহূর্ত পরে তা সংঘটিত হবে না'' ।[৫৫]

মাতৃগর্ভে দেহ সৃষ্টি হয় । অতঃপর আল্লাহ সে দেহে আত্মা দান করেন । মাতৃগর্ভে ও ভূমিষ্ঠের পর ক্রমান্বয়ে দেহ বিকশিত হয় । এ দেহের সাথে পার্থিব জগতে আত্মা সম্পর্কযুক্ত থাকে । নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করার পর আল্লাহ আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে নেন । তখনই মানবের মৃত্যু ঘটে । সুতরাং মৃত্যু হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা । মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহের বিনাশ ঘটে । দেহ তার সক্রিয়তা হারায় কিন্তু আত্মা অক্ষয় ও অবিনাশী থাকে । ইমাম গাযালীর মতে, মানবের রয়েছে দু'ধরনের আত্মা । জীবাত্মা ও মানবাত্মা । দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে সাম্যভাব তাই জীবাত্মা । জীবাত্মার সাম্যভাব নষ্ট হলেই মানবের মৃত্যু ঘটে । এরপর দেহ মানবাত্মার কোন আদেশ পালন করে না ।[৫৬]

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ অন্য জীবন ধারণ করে । পার্থিব জীবন থেকে সে জীবনের বিরাট পার্থক্য রয়েছে । পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মরণোত্তর জীবন স্থায়ী । পার্থিব জীবনে মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়, বিভিন্ন বৈরী পরিবেশের

Dhaka University Institutional Repository

মোকাবিলা করতে হয়, স্বীয় শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় । কিন্তু মরণোত্তর জীবনে স্বাধীন কর্মতৎপরতা নেই । সেখানে মানুষের সাংসারিক দায়িত্বে জীবন নির্বাহ করার অবকাশ নেই । এমনকি সেখানে ইবাদতেরও সুযোগ নেই । পার্থিব জগতে মানুষ পাপ-পুণ্য করে । আর মরণোত্তর জীবনে পাপ-পুণ্যের শাস্তি বা পুরস্কার গ্রহণ করে । পাপী ব্যক্তি সেখানে বেদনাক্লিষ্ট শাস্তির জীবন যাপন করে আর পুণ্যবান ব্যক্তি সেখানে শাশ্বত সুখের জীবন যাপন করে । তাই মৃত্যুতে পুণ্যবান বা মুমিনের কোন ভয় নেই । পাপাত্মার জন্য মৃত্যু ভয়ের কারণ । পাপীদের জন্য সর্প দংশন, অগ্নির দহনসহ নানা ভয়ঙ্কর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে । তাই মৃত্যু পরবর্তী জীবনে কারো জন্য সৌভাগ্য এবং কারো জন্য দুর্ভাগ্য এনে দেয় ।

৮ । মানুষের সারসত্তা ঃ

দেহ ও আত্মা নিয়ে মানুষ । দেহ জড়ীয় কিন্তু আত্মা ঐশী । দেহ মাটি, পানি, আগুন, বায়ু প্রভৃতি উপাদান দিয়ে গঠিত । দেহ নশ্বর ও পরিবর্তনের অধীন । দেহ রোগ-ব্যাধি, জরা, মৃত্যুর অধীন । কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর । আত্মার কোন পরিবর্তন নেই । আত্মা দেহকে আশ্রয় করে থাকে । দেহ আত্মার দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় । আত্মা ব্যতীত দেহ অচল । আত্মার নির্দেশ দেহ বাস্তবায়ন করে মাত্র । সুতরাং আত্মা হচ্ছে মূল । আত্মাই মানুষের সারসত্তা । ইসলাম অনুসারে আত্মাই ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্যের কর্তা । আত্মাই মরণোত্তর জীবনে সুখ বা শাস্তি ভোগ করে ।

৮ঃ১ । আত্মার স্বরূপ ঃ

আত্মা বিস্ময়কর রহস্যপূর্ণ । কুরআনও বলে যে, মানুষকে আত্মা সম্পর্কে নিতান্ত স্বল্প জ্ঞানই দেয়া হয়েছে । নবী মুহাম্মাদ (সঃ)ও আত্মার রহস্য সকল মানুষের নিকট প্রকাশ করেননি । মহামতি বুদ্ধের ন্যায় মুহাম্মাদ (সঃ)ও আধিবিদ্যক বিষয়ে সাধারণকে নিরুৎসাহিত করেছেন । জ্ঞান ও বোধ শক্তির প্রতি লক্ষ করে তিনি এ কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং এর সাহায্যে তিনি অবাঞ্ছিত বির্তক থেকে এড়াতে চেয়েছেন । আবার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লক্ষ করে তার অনেক প্রাজ্ঞ সাহাবীর নিকট অনেক রহস্য প্রকাশ করেছেন । পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সাধক, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন । তাঁদের কেউ কেউ একে বস্তু আবার কেউ কেউ অবস্তু (immaterial) বলে অভিহিত করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মাকে বুঝানোর জন্য কুরআনে নফস, রূহ, কলব ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দগুলো কুরআনে পরস্পর বিনিময়ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে নফস, রূহ ইত্যাদি শব্দ কুরআনে যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল।

৮ঃ১ঃ১। কুরআনে 'নফস্' শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার ঃ

নফস এবং এর বহুবচন আনফুস বা নুফূস কুরআনে নিম্নোক্ত অর্থসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

(ক) ব্যক্তি অর্থে,

যেমন আল্লাহ বলেন ঃ ''ওয়া ফি আনফুসিকুম আফালা তুবছিরূন'' অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না ?[৫৭]

কুরআনের অন্য স্থানে আল্লাহ বলেন ঃ ''বাদশাহ বলল ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের (লিনফসী) বিশেষ সহচর করে রাখব।''[৫৮]

খ)স্বয়ং আল্লাহকে বোঝাতে,

যেমন কুরআন বলছে ঃ ''জিজ্ঞেস করুণ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যা আছে, তার মালিক কে ? বলে দিন ঃ মালিক আল্লাহ। তিনি অনুকম্পা প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে (নফসিহী) লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন।''[৫৯]

গ) মানবাত্মা অর্থে,

যেমন কুরআন বলছে ঃ "ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা (আনফুসাকুম) ! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে।''[৬০]

৮ঃ১ঃ২। নফসের তিনটি বৈশিষ্ট্য ঃ

কুরআনে মানবাত্মা অর্থে ব্যবহৃত নফস শব্দটি তিনটি বৈশিষ্ট্য বা তিন ধরনের আত্মাকে নির্দেশ করে। যথা ঃ

(অ) মন্দ আদেশ দাতা আত্মা

(আ) ধিক্কার দাতা আত্মা

(ই) প্রশান্ত আত্মা

Dhaka University Institutional Repository

(অ) মন্দ আদেশ দাতা আত্মা (নফসি আম্মারাহ বিচ্ছুয়ি) ঃ

'আম্মারাহ' অর্থ হচ্ছে আদেশ দান করা বা উদ্বুদ্ধ করা । 'ছুয়ি' হচ্ছে মন্দ কাজ বা অপছন্দনীয় কাজ । সুতরাং নফসি আম্মারাহ বিচ্ছুয়ি' হচ্ছে এমন আত্মা যা মানুষকে মন্দ কাজে প্রবৃত্ত করে । মানুষের মধ্যে মন্দ প্রবৃত্তি সাধারণভাবে বিদ্যমান রয়েছে । যেমন কুরআন বলে ঃ ''নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়, আমার পালন কর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন ।''[৬১]

প্রত্যেক মানুষের আত্মা মানুষকে মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে । যেমন হাদীসে আছে, ''রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাথীদের জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী, যাকে সম্মান-সমাদর করলে অর্থাৎ অন্ন দিলে, বস্ত্র দিলে অথচ সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয় । অপরদিকে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে নিরান্ন ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে ? সাহাবারা বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! এর চেয়ে অধিক মন্দ আর কিছু হতে পারে না । মুহাম্মাদ (সঃ) বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমদের বুকের মধ্যে যে আত্মা আছে সেই এ ধরনের সাথী ।''[৬২] এ ধরনের আত্মাকেই কুরআন নফসি আম্মারাহ বলেছে ।

(আ) ধিক্কার দাতা আত্মা (নফসি লাওয়ামাহ) ঃ

মানুষ যখন আল্লাহ ও নবগোত্তর জীবনেব ভয়ে মনের মন্দ আদেশ থেকে বিরত থাকে তখন মানুষের আত্মা লাওয়ামাহ হয়ে যায় অর্থাৎ ধিক্কারকারী বা ভর্ৎসনাকারী হয়ে যায় । কর্মে ক্রটির কারণে অথবা অধিকতর পুণ্যকর্ম করতে না পাবার কারণে যে মানব মন অনুশোচনা করে. যে মানব মন নিজেকে দায়ী করে তিরস্কার করে, সে মনকেই কুরআনে নফসি লাওয়ামাহ বা ধিক্কার দাতা আত্মা বলা হয়েছে । কুরআন বলছে ঃ ''ওয়া লাউকসিমু বিন্নাফসিল লাওয়ামাহ'' অর্থাৎ আরও শপথ করি সেই আত্মার, যে নিজেকে ধিক্কার দেয় ।'' (৭৫ ঃ ২)

(ই) প্রশান্ত আত্মা (নফসি মুতমায়িন্না) ঃ

যখন মানুষ মনের ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাধনা কবতে করতে মনকে এমন স্তরে পৌঁছে দেয় যে, তখন তার মনে মন্দ কাজের কোন স্পৃহা থাকে না, মন্দ ক্রিয়ার ইচ্ছা তার মন থেকে বিদূরিত হয়, সব কর্মে সে আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তার মনে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা, পেরেশানি অবশিষ্ট থাকে না, সকল অবস্থায়ই সে আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকে । কারো বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ থাকে না, এমন আত্মাকে কুরআন 'প্রশান্ত আত্মা' বলে অভিহিত করেছে । এ আত্মা আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যেব দ্বারা প্রশান্তি অর্জন করে । এ ধরনের আত্মাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশের আহবান

Dhaka University Institutional Repository

জানান । ''হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালন কর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে । অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও । এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর ।''[৬৩]

৮ঃ১ঃ৩ । কুরআনে 'রূহ' শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার ঃ

' রূহ ' শব্দটি কুরআনে নিম্নোক্ত অর্থসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে ।

ক) প্রাণ অর্থে ঃ

আল্লাহ আদম (আঃ) এর মধ্যে স্বীয় রূহ ফুঁকে দিলেন । এতে আদম (আঃ) প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠলেন । কুরআন বলছেঃ ''অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব (ওয়া নফখতু ফিহি মির রূহী), তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো ।''[৬৪] 'নফখ' শব্দের অর্থ ফুঁক দেয়া বা সঞ্চার করা । আল্লাহ রূহ ফুঁকে দিলেন অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চার করলেন ।

খ) আল্লাহর আদেশ অর্থে ঃ

মুহাম্মদ (সঃ) কতিপয় ইহুদী কর্তৃক আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে আল্লাহ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করলেন ঃ বলে দিন ঃ ''রূহ আমার পালন কর্তার আদেশ ঘটিত । এ বিষয়ে তোমদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে ।''[৬৫]

৮ঃ১ঃ৪ । রূহ এবং নফ্স ঃ

রূহ এবং নফ্স অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । আবার অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী তফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন ঃ রূহ দু'প্রকার — স্বর্গজাত ও মর্তজাত । স্বর্গজাত রূহ আল্লাহর একটি একক সৃষ্টি । এর স্বরূপ উপলব্ধি করা খুবই কঠিন । সজ্ঞার অধিকারী সাধকগণ এর প্রকৃত স্থান আরশের উপর দেখতে পান । তাঁরা একে পাঁচটি স্তর প্রত্যক্ষ করেন । এ পাঁচটি স্তর হল ঃ কলব, রূহ, সির, খফী এবং আখফা । এগুলো আদেশ জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব । মর্তজাত রূহ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানব দেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন । এ মর্তজাত রূহকেই নফস বলা হয় ।[৬৬]

আল্লাহর সৃষ্টিধর্মী কার্যাবলী বুঝানোর জন্য আরবীতে দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয় । একটি হচ্ছে খালক্ এবং অপরটি হচ্ছে আমর । এ দিক থেকে জগৎ দু'ধরনের — আলমে খালক্ বা জড়জগৎ এবং আলমে আমর বা আদেশের জগৎ । যে সব বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং সংখ্যা আছে তা আলমে খালকের অন্তর্ভুক্ত । আর যে সকল

Dhaka University Institutional Repository

বস্তু আকৃতিহীন, অপরিমেয় এবং অবিভাজ্য তা আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত । আত্মা আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত । আল্লামা ইকবাল বলেন, ''আত্মার মৌলিক প্রকৃতি হল নির্দেশাত্মক ; কেননা আত্মা আসছে আল্লাহর নির্দেশমূলক স্পৃহা থেকে । . . . এ নির্দেশাত্মক সত্তার মধ্যেই আমার প্রকৃত 'আমি'নিহিত ।''[৬৭]

৮ঃ১ঃ৫ । আত্মা বস্তুগত দ্রব্য না আধ্যাত্মিক দ্রব্য ঃ

আত্মা বস্তুগত দ্রব্য না আধ্যাত্মিক দ্রব্য এ নিয়ে ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং সূফীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে । মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের অনেকে মনে করেন যে, আত্মা বস্তুগত (Material) দ্রব্য । যেমন আশারিয়াদের অভিমত হচ্ছে যে, জগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় আত্মাও পরমাণু দিয়ে গঠিত । যা দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা দেশ-কালে অবস্থান করে, তা বস্তুগত । আত্মা যেহেতু দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সুতরাং তার প্রকৃতি বস্তুগত । তাঁদের এ মত কুরআনসম্মত নয় । কেননা কুরআন স্পষ্টই বলে যে, ''আত্মা হচ্ছে আল্লাহর আদেশ ।'' আল্লাহর আদেশ দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েও অবস্তুগত ও আধ্যাত্মিক হতে পারে । আবার অনেকে (যেমন মুয়াম্মার) আত্মাকে পরমাণু বলেও অবস্তুগত মনে করেন । ইমাম গাযালী, মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী, ফখরুদ্দিন রাযীসহ অনেকে মনে করেন যে, আত্মা অবস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক দ্রব্য । এ দ্রব্য যদিও দেহের সাথে সম্পৃক্ত হয়, দেহে অবস্থান করে, তবুও দেহ কখনও একে আত্মস্থ করতে পারে না, বরং আত্মা দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে । আত্মা দেহকে পরিচালনা করে । আল্লাহর আদেশ হিসেবে, সূক্ষ্ম, মৌলিক, আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসেবে এ পরিচালনা সম্ভব ।

কুরআন আত্মা সম্পর্কে যতটুকু পরিচয় দিয়েছে তা থেকে এটা বলা যায় যে, আত্মা দৈহিক বস্তুর গুণাবলীর উর্ধ্বে । আত্মা অপরিমেয়, অবিভাজ্য, অদৃশ্য এবং যৌক্তিকভাবে (জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করে) এর সংজ্ঞা দেয়া অসম্ভব । ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকেরা এর বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করেছেন এবং সূফীরা স্বজ্ঞার সাহায্যে এর স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন । বুদ্ধি নির্ভর বর্ণনা এবং স্বজ্ঞা নির্ভর উপলব্ধি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক । আর এ কারণে আত্মা সম্পর্কে মতের তারতম্য দেখা দিয়েছে । সর্বোপরি আত্মা সম্পর্কে ইসলামের যে ধারণা তা পাশ্চাত্য 'আত্মা দ্রব্য মতবাদের' সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং গৌতম বুদ্ধ বা হিউমের 'প্রত্যক্ষণের সমষ্টি' তথা অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদের বিরোধী ।

Dhaka University Institutional Repository

৯ । আত্মার অমরত্ব ঃ

ইসলাম অনুসারে, আত্মার আদি বা আরম্ভ আছে । একটি কালে এর শুরু হয়েছে । আল্লাহর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়ে প্রথমে আত্মা আলমে আরওয়াহ বা রূহের জগতে থাকে । পরে এর এ মর্তজগতে আবির্ভাব ঘটে । এ মর্তজগৎ তাকে আবার ত্যাগ করতে হয় । এ ত্যাগের মধ্য দিয়ে তার বিনাশ হয় না । সে অমর, অবিনাশী । অমর থেকে সে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মর্তজীবনের কৃত কর্মের ফল ভোগ করে । সে পুরস্কৃত হয় অথবা শাস্তি প্রাপ্ত হয় । কিন্তু এ ধরায় সে আর কখনো ফিরে আসে না ।

মর্তজীবন হচ্ছে মানুষের কর্ম সাধনের জীবন । এ জীবনে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত কর্ম সাধনের অবকাশ রয়েছে । সুতরাং কর্ম ও ইচ্ছার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে । কর্মে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষার জন্যই স্রষ্টা মানুষকে এ অবকাশ দিয়েছেন । তার এ জীবন সম্পর্কে মরণোত্তর জীবনে স্রষ্টা পরীক্ষা ও হিসাব-নিকাশ নিবেন । পাপাত্মা এবং পুণ্যাত্মা উভয়ই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে । কুরআন বলছে ঃ ''কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ । অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার মৃত্যু দান করবেন । পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন । অতঃপর তোমরা তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে ।''[৬৮] ''আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে । অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবংঅন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে । নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে ।''[৬৯]

১০ । মরণোত্তর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ঃ

১০ঃ১ । আত্মা কোথায় যায় ঃ

মৃত্যুর পর দেহ অচল, অসার হয়ে পড়ে থাকে । অল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ক্রিয়া-কাণ্ডের পর দেহকে সমাধিস্থ করা হয় । কিন্তু অমর-অনন্ত রূহ কোথায় যায় ? কিয়ামত পর্যন্ত বা পুনরুত্থান দিবস ও বেহেশ্‌ত-দোযখে গমনের পূর্বে রূহ কোথায় অবস্থান করে, কী অবস্থায় বিদ্যমান থাকে — এ প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক । এ সম্পর্কে ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে । আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম তাঁর *'আররূহ'* নামক গ্রন্থে উনিশটি মতের উল্লেখ করেছেন । এর সবগুলো সঠিক বা কুরআন-হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

কারো মতে রূহ জান্নাতে বা জাহান্নামে গিয়ে অবস্থান করে। কেউ মনে করেন, রূহ পাখির আকৃতিতে জান্নাত বা জাহান্নামের চতুর্পার্শ্বে অবস্থান করে। কেউ মনে করেন রূহ পাখির পক্ষপুটে আরশের নীচে স্বর্ণের ফানুসে অবস্থান করে বা জাহান্নামের নীচে আগুনের গর্তে অবস্থান করে। কারো মতে, রূহ তাদের কবরের আশেপাশে অবস্থান করে। কেউ মনে করেন, রূহ স্বাধীন ও মুক্তভাবে যেখানে খুশি সেখানে বিচরণ করে বেড়ায়। আরেকটি মত অনুসারে, মুমিনদের রূহ পৃথিবীর সপ্তম আকাশের উপর ইল্লিয়্যীনে এবং কাফিরদের রূহ পৃথিবীর সপ্তম স্তরের নিচে সিজ্জীনে অবস্থান করে। এ মতটি সর্বাধিক গৃহীত। এবং এর সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে কুরআনের বাণীতে। কুরআন বলছে ঃ ''নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। আপনি জানেন, সিজ্জীন কী ? এটা লিপিবদ্ধ খাতা। . . . নিশ্চয় সৎ লোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে। আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কী ? এটা লিপিবদ্ধ খাতা। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশ্তাগণ একে প্রত্যক্ষ করে।''[৭০] সিজ্জীন একটা সংকীর্ণ স্থানের নাম। এখানে কাফিরদের রূহ অবস্থান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। অনুরূপভাবে, ইল্লিয়্যীনও একটি স্থানের নাম। এখানে মুমিনদের রূহ ও আমলনামা থাকে।

মৃত্যুর পরে রূহের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। এ কারণেই হয়তো ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। মূলত রূহের মর্যাদা অনুযায়ী আলমে বরযখে তাদের অবস্থান স্থল ভিন্ন ভিন্ন হবে। নবী রসূলদের আবাস স্থল, সিদ্দিকদের আবাস স্থল, শহীদদের আবাস স্থল, মুমিনদের আবাস স্থল ভিন্ন ভিন্ন হবে। অনুরূপভাবে পাপাচারের তারতম্য অনুসারে কাফিরদের রূহের আবাস স্থলও বিভিন্ন হবে। এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন ঃ কোন কোন রূহের অবস্থান হবে উচ্চ স্থানেরও উচ্চে ইল্লিয়্যীনে। নবী (সঃ) মি'রাজে নবীদের মর্যাদা ও আবাস স্থল বিভিন্ন রকম দেখেছেন। কোন কোন রূহের অবস্থান ছিল সবুজ পাখির পক্ষপুটে, যারা বেহেশতের যেখানে খুশি উড়ে বেড়ায়। এ সব হলো এক শ্রেণীর শহীদের রূহ। আবার কোন কোন শহীদের রূহকে ঋণগ্রস্ত হওয়া বা অন্য কোন কারণে বেহেশতে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। আবার কোন কোন রূহকে বেহেশতের দরজায় আটকে রাখা হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন, ''আমি তোমাদের এক সাথীকে দেখলাম, তাকে জান্নাতের ফটকে আটকে রাখা হয়েছে।'' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, ''শহীদগণ বেহেশতের ফটকের নিকটে নহরের কিনারায় সবুজ গম্বুযে অবস্থান করেন আর জান্নাত থেকে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁদের খাবার আসে।'' নিম্নস্তরের রূহ উর্ধ্বলোকে যাওয়ার সুযোগ পায় না। অনেক ব্যভিচারী নর-নারীর রূহ

Dhaka University Institutional Repository

জ্বলন্ত চুলার মধ্যে থাকবে। অনেকের রূহ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটবে এবং তাদের মুখের মধ্যে পাথর ঠেসে দেয়া হবে। মোট কথা, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রূহ ইল্লিয়্যীনের উচ্চস্তরে অবস্থান করে, এখান থেকে আল্লাহর আদেশ ব্যতীত কোথাও যেতে পারে না।[৭১]

উল্লেখ্য যে, পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত রূহের অবস্থানের জন্য দেহ ধারণের কোন অপরিহার্যতা নেই। ইসলামের বিশ্বাস হচ্ছে যে, আত্মা দেহ ব্যতীতই ইল্লিয়্যীনে বা সিজ্জীনে অবস্থান করে। হাদীসে শহীদদের রূহ পাখির আকৃতিতে বা সবুজ পাখির পক্ষপুটে থাকার কথা বলা হয়েছে। এটাকে মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকেরা শহীদদের প্রতি আল্লাহর একটি বিশেষ কৃপা বলে ব্যাখ্যা করেন। এতে দেহান্তরবাদ বা কর্ম অনুসারে দেহ গ্রহণের বিষয়টি নেই। এ প্রসঙ্গে ইসলাম ভারতীয় ধর্ম থেকে স্পষ্টত পৃথক।

১০ঃ২। কবরে শান্তি বা শাস্তি ঃ

ইসলাম ধর্ম অনুসারে মৃত্যুর পর কবরে[✪] দাফন বা সমাধিস্থ করা হয়। সমাধিস্থ করার অব্যবহিত পর সেখানে মুনকির ও নাকীর নামক দু'জন ফেরেশ্‌তা আগমন করেন। ফেরেশ্‌তাদ্বয় কবরবাসীকে নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করেন। সঠিক উত্তরদাতা বরযখের জীবন অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবসের পূর্ব পর্যন্ত সময় জান্নাতের সুখে অতিবাহিত করেন। উত্তর দানে অপারগ ব্যক্তি বা ভ্রান্ত উত্তরদাতা বেদনাক্লিষ্ট আযাবে নিপতিত হয়। হাদীসে আছে মুমিন ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দেয়ার পর মুনকির-নাকীর তাঁকে বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন। অতঃপর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত সে মুমিন ব্যক্তির কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। অতঃপর অত্যন্ত সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ও সুঘ্রাণযুক্ত পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি এসে বলেন, আল্লাহ আপনাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর ইবাদতে তৎপর ছিলেন এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত ছিলেন। তখন মুমিন ব্যক্তি বলেন, আল্লাহ আপনাকে এর শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিন। বলুন, আপনি কে ? তিনি বলেন, আমি আপনার নেক আমল। এরপর তাঁর জন্য বেহেশতের একটি দরজা খুলে দেয়া হয় এবং বেহেশতে তাঁর জন্য নির্ধারিত স্থান তাঁকে দেখানো হয়। এতে তিনি আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করেন এবং এ আনন্দ ও শান্তি উপভোগের মধ্যে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সময় অতিবাহিত করেন। অন্য হাদীসে এও আছে যে, প্রশ্নোত্তর শেষে ফেরেশ্‌তারা তাঁকে বলেন, আপনি কিয়ামত পর্যন্ত নববধূর মতো ঘুমিয়ে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ

✪ কবর বলতে সাধারণত মৃত দেহকে ভূতলে রাখা বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে কবর হচ্ছে মৃত ব্যক্তির ঠিকানা বা অবস্থান স্থল। মৃত্তিকার নিচে অথবা পানির নীচে কিংবা আকাশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মৃত দেহের অংশসমূহ যেখানেই থাকুকনা কেন, সেই স্থানটিই তার কবর। একে আলমে বরযখও বলা হয়। (দ্রষ্টব্য, ইসলামী বিশ্বকোষ, ষষ্ঠ খণ্ড, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ. ৬৪৬)

Dhaka University Institutional Repository

আপনাকে জাগ্রত করেন, যেমন একজন স্বামী তার নববধূকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন । অপরদিকে, একজন পাপাচারী যখন ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন সমূহের সঠিক উত্তর দিতে অপারগ হয়, তখন আকাশ থেকে আওয়াজ আসে — ''ওর নিচে আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও । আর জাহান্নামের জানালা খুলে দাও ।'' এরপর তার কবরে জাহান্নামের প্রচন্ড গরম ও দুর্গন্ধ আসতে আরম্ভ করে । এবং তাকে তার কবর এমনভাবে চাপ দেয় যে, এদিকের হাড় ওদিকে, ওদিকে হাড় এদিকে বের হয়ে যায় । তারপর তার নিকট কুৎসিত চেহারা ও দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক পরিহিত একজন লোক এসে বলে, তুমি একটি দুঃসবাদ শোন ! আজকের দিনটি ঐদিন তোমার সাথে যেই দিনটি সম্পর্কে অঙ্গীকার করা হয়েছিল ।সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে ? তোমার চেহারা থেকে অশুভ লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে ! জবাব আসে, আমি তোমার বদ আমল । তারপর কববাসী দুআ করে, হে আল্লাহ, কিয়ামত কখনো কায়িম করো না । (আহমদ, আবু দাউদ,ইবনে মাজাহ) এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন হাদীসে সর্পদংশন, হাতুড়ি দিয়ে আঘাতসহ কবরে বিভিন্ন শাস্তির উল্লেখ রয়েছে । তবে পার্থিব জীবনে কর্মের ভিত্তিতে কবরে ব্যক্তি ভেদে শান্তি ও শাস্তিতে তারতম্য ঘটে ।

১০ঃ৩ । কবরের সাথে রূহের সংশ্লিষ্টতা ঃ

কবর রূহের স্থায়ী আবাস স্থল নয় । রূহ কখনো কখনো কবরে আসে অথবা ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীন থেকে কবরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে । সওয়াল জওয়াবের সময়ে আল্লাহ মৃত ব্যক্তির রূহ কবরে প্রেরণ করেন । বিভিন্ন হাদীস দ্বারা এটা জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তি যিয়ারতকারীর সালামের জবাব দেয়, আর সালাম দাতাকে চিনতেও পারে । ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, সহীহ ও মুতাওয়াতর হাদীস দ্বারা জানা যায়, মুনকার-নাকীরের সওয়ালের সময় রূহকে দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয় । অনেকের ধারণা কবরে সওয়াল কেবল দেহকে করা হয় । এ ধারণা ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক । কেননা, রূহ ব্যতীত কেবল দেহ অসার, অচল, ও নিষ্ক্রিয় । এর উপর প্রশ্নের প্রতিক্রিয়া আশা করা অবাঞ্ছিত । আবার অনেকে মনে করেন কেবল রূহকে সওয়াল করা হয়, দেহকে নয় । এ ধারনাও ভ্রান্ত । কেননা, কেবল রূহকে প্রশ্ন করা হলেও রূহের কবরে আসা বা কবরের সাথে রূহের কোন সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজন থাকত না। ইল্লিয়্যীনে বা সিজ্জীনে প্রশ্নোত্তর পর্ব সমাপ্ত করা সম্ভব হত । সুতরাং, কবরে সওয়াল-যওয়াব, শান্তি বা শাস্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে রূহ ও দেহ উভয়ের সংশ্লিষ্টতা থাকে । ইবনে তাইমিয়া (রঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো কবরে শান্তি ও শাস্তি কেবল দেহ বা রূহের উপর হয় না উভয়ের উপর হয় ? তিনি উত্তর দিলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআ'তের ঐকমত্য এই যে, কবরে শান্তি বা শাস্তি রূহ ও দেহ উভয়ের উপর হয়ে থাকে ।[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

১০ঃ৪ । পুনরুত্থান ঃ

ইসলামের একটি অন্যতম বিশ্বাস হচ্ছে যে, মানুষসহ সকল জীবজন্তু নির্ধারিত সময় পুনরুত্থিত হবে । কিন্তু একটি বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে, কবরে দাফনের অল্প দিন পরে দেহ পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে যায়, দেহের এতটুকু চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না, তাই পুনরুত্থান কি করে সম্ভব ? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের আগে মানব সকল কোথায় উত্থিত হবে তার আলোচনা করা হলো ।

একটা বিশাল স্থানে মানব সকলকে একই সময়ে একত্রিত করা হবে । সাধারণভাবে এ স্থানটি হাশরের ময়দান বা পুনরুত্থিত হবার ময়দান নামে পরিচিত । এ ময়দানেই মানবকুলের বিচার কার্য সমাধা হবে । এ পৃথিবীকে পাল্টে দিয়ে হাশরের ময়দান বানানো হবে । যেমন আল্লাহ বলেন,''যেদিন পরিবর্তিত করা হবে, এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে পেশ হবে ।''[৭৩] পৃথিবী ও আকাশের এ পরিবর্তন পরিমাণগত হতে পারে, আবার গুণগতও হতে পারে । হতে পারে এ পৃথিবীর স্থলে নতুন পৃথিবী স্থাপন করা হবে । যেমন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বর্ণনা করেন, '' হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী । তার রঙ হবে রৌপ্যের মত সাদা ।'' আবার হতে পারে এ পৃথিবীকেই হাশরের মাঠে রূপান্তরিত করা হবে । যেমন হযরত জাবেরের বর্ণনায় মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, ''চামড়ার ভাঁজ দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেয়া হয়, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেভাবে টান দেয়া হবে । ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় ইত্যাদি সমান হয়ে একটা সমতল ভূমি হয়ে যাবে । তখন সকল মানুষ এ পৃথিবীতে একত্রিত হবে । ভীড় এত হবে যে, একজনের অংশে তার দাঁড়ানোর জায়গাটুকুই পড়বে ।'' হাশরের মাঠে সমতলভূমি হবে এবং সেখানে পাহাড়,, টিলা, বৃক্ষ, গর্ত, বক্রতা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না । যেমন কুরআন বলছে, ''পৃথিবীকে মসৃণ সমতল ভূমি বানাবেন, তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না ।''[৭৪] রসূল (সঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিস্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে পুনরুত্থিত করা হবে । এতে বৃক্ষরাজি বা পাহাড়-পর্বতের কোন দাগ থাকবে না ।'' (বুখারী ও মুসলিম) অনেক হাদীসে এ ভূমিকে ভস্মকর বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ভূমি হবে উত্তপ্ত এবং একহাত বা অর্ধহাত মাথার উপরে তেজোদীপ্ত সূর্যের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে ।

এ পৃথিবীতে বা সমতল ভূমিতে মানুষ উত্থিত হবে । মানুষের দেহ একটি ভৌত কাঠামো । অন্যান্য ভৌত কাঠামোর ন্যায় দেহও পরিবর্তন ও ধ্বংসের অধীন । কবরে মৃত দেহ রাখার পর তা পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

আস্তে আস্তে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । এক পর্যায়ে দেহের কোন অংশ বিশেষেরও হদিস থাকে না । আদি মানুষ তো দূরের কথা দশ বছর আগে যে মানুষটি মৃত্যুবরণ করেছে তার দেহের অংশ বিশেষও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর । কথিত আছে যে, সর্বশেষ যে ব্যক্তির মৃত্যু হবে সেও আলমে বরযখে তথা কবর জগতে চল্লিশ হাজার বছর অবস্থান করবে । এ থেকে বলা যায় যে, সর্বশেষ মৃত্যু ব্যক্তির দেহও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । অবশ্য পয়গম্বর, শহীদ প্রমুখদের দেহ নষ্ট হয় না বলে ইসলামে বিশ্বাস রয়েছে । বাকীদের নিশ্চহ্ন অবস্থা থেকে আল্লাহ উত্থান ঘটাবেন । আল্লহ বলেন ঃ এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি, এতেই তোমাদের ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব ।''[৭৫] আল্লাহর এ বাণী, ইসলামের এ বিশ্বাস কাফির মুশরিকদের নিকট অলৌকিক ও অসম্ভব । দেহ মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধূলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে । বায়ু এসব ধূলিকণাকে দূর থেকে দূরান্তে নিয়ে যায় । এ বিচ্ছিন্ন ও ছড়িয়ে পড়া অংশ শত সহস্র বছর পর কীভাবে একত্রিত হওয়া সম্ভব তা তাদের নিকট বোধগম্য নয় । তারা বলে আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ন হয়ে যাব, মাটিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব ![৭৬] আল কুরআন প্ররোচক যুক্তি (Persuasive argument)র সাহায্যে এ সংশয় ও অস্বীকৃতির উত্তর দেয় । কুরআন মানুষকে চিন্তা করতে আহবান জানায় । ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টি ও বিকাশ, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল প্রভৃতির সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে বলে । কুরআন বলেছে ঃ ''মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না ? পরন্তু আমি তার অঙ্গুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম । বলুন, যিনি প্রথমবার সে গুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন । তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত । . . . যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? হাঁ তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ।''[৭৭]

বিশ্বাসীদের মনেও পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রশ্ন জাগতে পারে । মানব মনের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও চাক্ষুষ না করার পূর্ব পর্যন্ত কৌতূহল থেকেই যায় । একজন নবীর মনও এ প্রকৃতির উর্ধ্বে নয় । আল কুরআন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে । ''যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে । আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এ জন্য চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি । বললেন, তাহলে চারিটি পাখি ধরে নাও । পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও । তারপর সেগুলোকে ডাক, তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে । আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্

Dhaka University Institutional Repository

পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন ।''[৭৮] অতএব, পুনরুত্থান সম্ভব এবং আল্লাহ অতি অনায়াসে পুনরুত্থান ঘটিয়ে থাকবেন ।

বিশিষ্ট লেখক সাইয়্যিদ মুজতবা মুসাভী লারী একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যকে উপমা হিসেবে পেশ করে দেখান যে, পুনরুত্থান সম্ভব । তিনি মানুষের মুখ নিঃসৃত অতীত শব্দ তরঙ্গকে উপমা হিসেবে গ্রহণ করেন । একদল গবেষক এটা চেষ্টা করে আসছেন যে, কি করে অতীত সময়ে একজন মানুষ যে সব কথাবার্তা বলেছে তা উদ্ধার বা শনাক্ত করা যায় । তাঁরা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এ কাজে সফল হচ্ছেন এবং উত্তরোত্তর তাঁদের গবেষণায় অগ্রগতি হচ্ছে । একজন মানুষ কিছু বলার পর তা ঐ স্থানে স্থির থাকে না । তা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তা বিশ্বময় বায়ু তরঙ্গের সাথে ছড়িয়ে পড়ে । তবে 'জড় ও শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়ম' অনুসারে তা অক্ষয় থাকে । এই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অতীত উক্তি বা শব্দ সমূহকে পুনরুদ্ধার বা শনাক্ত করা বৈজ্ঞানিকভাবে পুনরুত্থানকে সম্ভব বলে প্রমাণ করে । বায়ু তরঙ্গে বিদ্যমান নানা উক্তি থেকে নির্দিষ্ট করে কোনটি কার উক্তি তা বের করা যেহেতু সম্ভব সেহেতু আল্লাহর পক্ষেও বিচ্ছিন্ন ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মানবকে পুনরুত্থিত করা অসম্ভব হবে না ।[৭৯]

১০ঃ৪ঃ১ । পুনরুত্থান দৈহিক কি না ঃ

পুনরুত্থান দৈহিক হবে কি না এ সম্পর্কে মুসলিম দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে । গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত মুসলিম দার্শনিকগণ আল কিন্দি, আল ফারাবী, ইবনে সিনা প্রমুখ মনে করেন যে, দৈহিক পুনরুত্থান অসম্ভব । পক্ষান্তরে, ইমাম গাযালী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী প্রমুখ মনে করেন যে, পুনরুত্থান দৈহিক হবে । ইমাম গাযালী (রঃ) তাঁর '*তাহাফুতুল ফালাসিফা*' গ্রন্থে দৈহিক পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে দার্শনিকদের প্রধান প্রধান যুক্তি খণ্ডন করেছেন । প্রথমতঃ দার্শনিকেরা বলেন যে, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দৈহিক পুনরুত্থান সম্ভব তা প্রমাণ করে না । দার্শনিকদের মতে, মৃত্যু মানে হচ্ছে জীবনের সমাপ্তি । মৃত্যুতে দেহ অস্তিত্বহীন হয় এবং দেহ মাটির সাথে মিশে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায় । এ অবস্থায় পুনরুত্থান মানে নিম্নোক্ত তিনটি বিকল্প হতে পারে ।

ক) ধ্বংসপ্রাপ্ত দেহের উপাদান দ্বারা অন্য আরেকটি দেহ সৃষ্টি করা

খ) মৃত্যুর পর দেহকে সংরক্ষণ করে তাতে আত্মা প্রতিষ্ঠা করা

গ) পূর্ববর্তী দেহের অংশবিশেষ বা নতুন উপাদান নিয়ে দেহ সৃষ্টি করে তাতে আত্মা প্রতিষ্ঠা করা ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিকল্পটির অর্থ হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুটির উপাদান দ্বারা একটা বস্তু সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু এই সৃষ্ট বস্তুটি অবিকল পূর্বঃস্থিত বস্তুটি হবে না। এটা হবে একটা নতুন বস্তু। দেহ ধ্বংস হলে তার উপাদান দ্বারা আরেকটি দেহ আল্লাহ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সেটি হবে নতুন একটি দেহ, পূর্বের দেহটি নয়। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষে পূর্বের দেহটি পুনবায় অস্তিত্বে আনয়ন সম্ভব নয়। পূর্বের দেহ সৃষ্টি সম্ভব নয় বলে পুনরুত্থানও সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বিকল্পটিও অসম্ভব। কেননা পূর্ণাঙ্গ দেহের সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। মৃত দেহ মাটিতে পরিণত হয়। উহা পানি, বাষ্প ও বায়ুতে পরিণত হয় এবং বাষ্প ও বায়ুর সাথে মিশ্রিত হয়ে উহা জগন্ময় ছড়িয়ে পড়ে। কিংবা কীটাদি, পক্ষীগণ উহা ভক্ষণ করে ফেলে। এভাবে দেহ যেহেতু সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না, সেহেতু তাতে আত্মা প্রদান করে পুনরুত্থিত করাও সম্ভব হয় না। এখানে আরেকটি সমস্যা দেখা দেয় যে, মৃত দেহকে যদি কোন প্রাণী ভক্ষণ করে তাহলে ঐ ভক্ষিত অংশ ভক্ষকের দেহের অন্তর্ভুক্ত হয় যায়। এখন দেহের যদি পুনরুত্থান হয় তাহলে একটি দেহ অঙ্গহানি অবস্থায় এবং তারই একটি অংশ ভক্ষকের দেহে পুনরুত্থিত হবে। এ অবস্থায় আত্মার প্রকৃত দেহ দুই দেহে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে একই আত্মাকে দুই দেহে স্থাপন করার অথবা দুই আত্মাকে একই দেহে স্থাপনের জটিলতা দেখা দেয়। আর দেহ পানি, বায়ুতে মিশ্রণের ফলে বা অন্য প্রাণীর ভক্ষণের ফলে দেহের ঘাটতি দেখা দিবে, এতে দেহের তুলনায় আত্মা অসংখ্য হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় দৈহিক পুনরুত্থান সম্ভব নয়।

তৃতীয় বিকল্পটিও অসম্ভব। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, নিছক মাটি স্বীয় অবস্থায় আত্মার পরিচালনা গ্রহণ করে না। কাষ্ঠ বা লৌহও আত্মার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে না। আর কাঠ অথবা লৌহ হতে মানুষের দেহ বিনির্মাণ সম্ভবও নয়। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মাংস, অস্থি, রক্ত, পিত্ত, কফ এবং গ্রন্থিরস প্রভৃতিতে বিভক্ত হলেই তা মানুষ হবে। কিন্তু যখন দেহ ও স্বভাব আত্মা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবে তখন আত্মা প্রদাতার প্রাথমিক কারণের জন্য কর্তব্য হয় উহাতে আত্মা সৃষ্টি করা। এমতাবস্থায় পুনরুত্থান হলে একই দেহে দুই আত্মা স্থাপন করা হয়। দুই আত্মার সমন্বয় অযৌক্তিক ও অসম্ভব। আর এ কারণে পুণর্জন্ম মতবাদ যেভাবে বাতিল হয়, সেভাবে দৈহিক পুনরুত্থান মতবাদও বাতিল হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম গাযালীর খণ্ডন ঃ

মৃত্যুর পর আত্মা বর্তমান থাকে — দার্শনিকদের এ বক্তব্য কুরআন ও হাদীস সম্মত বলে ইমাম গাযালী তাঁদের এ বক্তব্যের স্বীকৃতি দেন। কিন্তু দৈহিক পুনরুত্থান সম্ভব নয় — এ মত প্রত্যাখ্যান করেন। এবং তাঁদের মতের প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন ঃ

ক) আত্মাকে যে কোন আধারে তা প্রথম দেহের উপাদান, অপর কোন উপাদান অথবা পরে সৃষ্ট নতুন উপাদান দ্বারা গঠিত হোক সংস্থাপন সম্ভব। যন্ত্রের অভাবে সে সুখ বা দুঃখ অনুভব করতে অক্ষম। তাই পূর্বের ন্যায় তাকে একটি যন্ত্র অর্থাৎ দেহ প্রদান করা হবে। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ উপলব্ধির জন্য পুনরুত্থান হবে দৈহিক।

খ) আত্মা অসংখ্য ও উপাদান সীমাবদ্ধ এবং পুনরুত্থানে দেহের ঘাটতি দেখা দিবে — দার্শনিকদের এ বক্তব্য অসম্ভব ও ভিত্তিহীন। গাযালী বলেন, উহা জগতের অবিনশ্বরত্ব ও কালচক্রের চির আবর্তন সম্পর্কিত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যদি এটা স্বীকারও কর হয় যে দেহের তুলনায় আত্মার সংখ্যা অধিক তাহলে আল্লাহ অতিরিক্ত সংখ্যক দেহ কোন উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি করতে সক্ষম। এটা অস্বীকার করা আল্লাহর সৃজনীশক্তিকে অবিশ্বাস করার সমতুল্য। (অবশ্য দেহের তুলনায় আত্মা অধিক হওয়ার প্রশ্ন উঠে না, যে আত্মা পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে, দেহ ধারণ করেছে তাদেরই পুনরুত্থান হবে। প্রতিটা দেহের জন্য একটা আত্মা নির্দিষ্ট)

গ) মাটি মাটি থাকা অবস্থায় আত্মার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে না। তথা দৈহিক পুনরুত্থানের জন্য জরায়ুতে যোগ্য মিশ্রণ প্রয়োজন — এ মতের উত্তরে গাযালী বলেন, সম্ভবত দেহবিচ্ছিন্ন আত্মার অন্য কোন ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন এবং এর পূর্ণতা অর্জন কিয়ামতের সময় ব্যতীত হয় না। এর জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত ও উহার কারণ সম্পর্কে আল্লাহ সমধিক অবগত। সর্বোপরি শরীয়তের বর্ণনা মতে দৈহিক পুনরুত্থানে তা আমাদের বুদ্ধি সমর্থন করুক আর নাই করুক বিশ্বাস করা আমাদের অপরিহার্য।[৮০]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ দার্শনিকদের যুক্তি হচ্ছে যে, কেবল 'হও' বললেই মানুষ হয় না। বিভিন্ন স্তর ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ মানুষে পরিণত হয়। পুনরুত্থিত মানুষের দেহ যদি প্রস্তর, মরকত, মনি-মুক্তা অথবা কেবল মৃত্তিকার হয়, তাহলে তা মানুষ হবে না। মানুষ হবার জন্য অস্থি, স্নায়ু, মাংস, উপাস্থি, রক্ত, পিত্ত, কফ, গ্রন্থিরস প্রভৃতি অংশ দ্বারা গঠিত নির্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকতে হবে। অস্থি, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতি না হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও হবে না। এ সমস্ত একক বস্তু আবার রক্ত, পিত্ত, কফ, গ্রন্থিরস না থাকলে হবে না। এ চারিটি দেহের রসও আবার খাদ্য হতে গৃহীত উপাদান ব্যতীত হতে পারে না। এ খাদ্য হচ্ছে মাংস ও শস্য। মোট কথা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ প্রভৃতি নির্দিষ্ট অনুপাত ও প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত না হলে প্রাণী বা উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না। এ ছাড়া মানুষের দেহ হতে হলে যে প্রক্রিয়াগুলোর প্রয়োজন তা হচ্ছে (ক) পুরুষের বীর্য জরায়ুতে পতন (খ) ঐ বীর্যের ডিম্বাণুর সাথে মিশ্রণ ও পুষ্টি গ্রহণ (গ) রক্ত ও পরে মাংস পিন্ডে পরিণত হওয়া (ঘ) ভ্রূণের উৎপত্তি হওয়া, (ঙ) এরপর শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়া (চ) অতঃপর যৌবন ও (ছ) বার্ধক্যে উপনীত হওয়া। এভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষকে মানুষ হতে হয়। মৃত্যুর পর দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়। এ মৃত্তিকার সাথে কথা বলা যায় না। তাই 'কুন' বা হও শব্দটি মৃত্তিকার উপর প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে না গিয়ে কেবল 'হও' বলে মৃত্তিকা থেকে দেহের পুনরুত্থান সম্ভব হয় না।

গাযালীর খন্ডন ঃ

ইমাম গাযালী বলেন, মানুষ হতে হলে বিভিন্ন নিয়ম ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হতে হয় — দার্শনিকদের এ বক্তব্য আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু পুনরুত্থান অল্প সময়ে হবে, না বিকাশের দীর্ঘ সময় নিয়ে হবে তা আমাদের নিকট অজ্ঞাত বিষয়। তবে আল্লাহর পক্ষে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যস্থতা ব্যতীত পুনরুত্থান সংঘটিত করা সম্ভব। আবার কার্য-কারণের মাধ্যমেও তিনি পুনরুত্থান ঘটাতে পারেন। আবার এও সত্য যে, কার্য-কারণ কোন অনিবার্য ব্যাপার নয়। কারণ ব্যতীত আল্লাহর শক্তি দ্বারা সব কিছু সংঘটিত করা সম্ভব। মানুষ স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে সবকিছু ব্যাখ্যা করে। সে কার্য-কারণ সম্পর্কের আলোকে সব কিছু দেখতে চায়। কিন্তু কারণ সর্বত্র বিদ্যমান থাকবে এটা শর্ত নহে। আল্লাহর শক্তির ভান্ডারে বহু আশ্চর্য ও অপরিচিত ঘটনা রয়েছে। তাই আল্লাহ কীভাবে পুনরুত্থান ঘটাবেন তা আমাদের নিকট বিদিত নয়। কোন কোনও হাদীসে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের সময় বৃষ্টি পৃথিবীকে প্লাবিত করে দিবে। ঐ বৃষ্টির

Dhaka University Institutional Repository

বিন্দুগুলি বীর্যের ন্যায় হবে। উহা মৃত্তিকার সাথে মিশ্রিত হবে। কাজেই আল্লাহর নির্ধারিত কারণগুলির সহিত সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব কোথায়? তবে এটাই দেহের পুনরুত্থান এবং উহার পুনরুত্থিত আত্মা গ্রহণের যোগ্যতা সূচিত করে কি না, তা আমরা জানি না। এভাবে, দৈহিক পুনরুত্থান অসম্ভব দার্শনিকদের এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।[৮১]

ইসলামে জান্নাত ও জাহান্নামে যে বর্ণনা রয়েছে তাতে সে পরিবেশের উপযোগী কোন দৈহিক মাধ্যমের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া কুরআনের বিভিন্ন বাণী ও উপমা থেকে যা অনুধাবন করা যায় তা থেকে 'পুনরুত্থান দৈহিক' এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হবে না। যেমন কুরআন বলছে ঃ

> আমরা মরে গেলে এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি পুনরুত্থিত হব? এ প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করবে, তা আমার জানা আছে এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত কিতাব, আমি কিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখ দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। . . .তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ আসমান ও যমিন সৃজিত করেছেন, তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন একটি নির্দিষ্ট কাল, এতে কোন সন্দেহ নেই। তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মৃত্যুর পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কতকাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়, বরং তুমি তো একশ' বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে — সে গুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল — আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।[৮২]

পার্থিব জীবনে রূহের সাথে দেহের একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকে। পাপ-পুণ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আত্মার সাথে দেহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। পরকালীন জীবনে শাস্তি বা সুখ ভোগের ক্ষেত্রেও আত্মার সাথে দেহের জড়িত থাকা জরুরী। তা না হলে শাস্তিভোগ বা সুখভোগ একতরফা হয়ে যাবে। পার্থিব দেহের যদি উত্থান না হয় তাহলে যে দেহ পাপ-পুণ্যের সাথে জড়িত ছিল সে দেহ হয় শাস্তিভোগ থেকে বিনা বিচারে নিস্তার পেয়ে গেল অথবা সুখভোগ থেকে বঞ্চিত হল। এটা অযৌক্তিক। কেননা, পাপের সাথে যে জড়িত শাস্তিভোগ তার জন্য প্রাপ্য, আর পুণ্যের সাথে যে জড়িত সুখ ভোগ করা তার অধিকার। সুতরাং দৈহিক পুনরুত্থানকে যুক্তি-বুদ্ধি অসমর্থন করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

১০৪৫ । পাপ-পুণ্যের বিচার ঃ

পুনরুত্থানের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করা । পাপ-পুণ্যের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর পয়গম্বরের নির্দেশিত মত ও পথ । যারা পার্থিব জীবনে এ নির্দেশিত মত ও পথের অনুসরণ করেছে মরণোত্তর অনন্ত জীবনে তারা সুখভোগ করবে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত আরাম ভোগের স্থায়ী আবাস স্থল জান্নাত । আর যারা এ নির্দেশিত মত ও পথ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবে মরণোত্তর জীবনে তারা বেদনাক্লিষ্ট শাস্তিতে নিপতিত হবে, তাদের জন্য রয়েছে সার্বক্ষণিক নিষ্ঠুর, নির্মম কষ্ট ভোগের আবাস স্থল জাহান্নাম । পুনরুত্থানের পর বিচারের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে কে জান্নাতের অধিবাসী হবে আর কে জাহান্নামের অধিবাসী হবে । আল কুরআন এ দিবসকে বিচার দিবস (ইয়াওমুল ফাছলি) বলে অভিহিত করেছে ।

এ বিচার দিবসে মানুষ তটস্থ হয়ে পড়বে । জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকৃত অবস্থা তার নিকট প্রকাশিত হবে । স্বীয় পরিণতির চিন্তায় প্রত্যেকে বিভোর থাকবে । হাদীস মতে, প্রত্যেকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে ইয়া নফসী ! ইয়া নফসী ! অর্থাৎ আমার কী হবে ! আমার কী হবে ! নিজেকে রক্ষা করা এবং নিজের স্বার্থই সেদিন বড় হয়ে দেখা দিবে । বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না । সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-ভ্রাতা তথা সব কিছু পণ দিয়ে মানুষ নিজেকে রক্ষা করার প্রয়াস পাবে ।[৮৩] কিন্তু বিচার-ফয়সালাই তার পরিণতি নির্ধারণ করবে ।

বিচার মানে পাপী ও পুণ্যবানকে শনাক্ত করা । কিন্তু পার্থিব জীবনে কে পাপ বা পুণ্য করেছে তা নিরূপণ করা যাবে কীভাবে ? কী মানদণ্ডের ভিত্তিতে পাপীকে পুণ্যবান থেকে পৃথক করা যাবে ? যথার্থ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকা আবশ্যক । তা না হলে বিচার-কার্য অসমাপ্ত, ত্রুটিযুক্ত ও পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক । তাই সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে কোথায় ? ইসলাম এ সব ব্যবস্থাই রেখেছে বলে কুরআন ও হাদীস দাবী করে । পার্থিব জীবনে মানুষ প্রতিক্ষণে যা বলে, যা করে তা দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা লিপিবদ্ধ করেন । "যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে । সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে ।"[৮৪] এই ফেরেশতাদ্বয়ের লিপিবদ্ধ নথীই বিচারের দিবসে কর্তার সামনে উপস্থাপন করা হবে । ব্যক্তির স্বীয় হাতের লেখা নথী বিচার দিবসে উপস্থাপন করা হবে বলেও একটি মত আছে । হাদীসে আছে — মুনকীর-নাকীরেরর কবরে আগমনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ফেরেশতা কবরে আসেন । তিনি কবরের ব্যক্তিকে তার পার্থিব আমল লিখে দিতে বলেন । সমাধিস্থ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে তার কর্মসমূহ লিখে দেয় । ফেরেশতা এ লিপিকে তার গ্রীবাদেশে

Dhaka University Institutional Repository

লটকায়ে দিয়ে চলে যান। এটি সর্বাবস্থায় লটকানো থাকে এবং এ অবস্থায়ই সে পুনরুত্থিত হয়। কুরআনেও এ মতটি সমর্থিত হয়েছে। ''আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট।''[৮৫] এভাবে মানুষের কর্মের রেকর্ড রাখার ব্যবস্থাটি হলো তার লিপির মাধ্যমে এবং ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের লিখনীর মাধ্যমে। তার কর্মলিপি বা আমলনামা বিচার দিবসে তার সামনে উপস্থাপন করা হবে। সে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ কর্মকেও প্রত্যক্ষ করবে। ''অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।''[৮৬] এখন ঐ কর্মলিপি যে তার এরই বা প্রমাণ কী? হাদীসে আছে পাপী, কাফির ও অসৎ লোকেরা কর্মলিপিকে অস্বীকার করবে। এ অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষী হিসেবে স্থাপন করা হবে। আল্লাহ বলেন, ''আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃত কর্মের সাক্ষ্য দেবে।''[৮৭] চক্ষু, কান, ত্বক সবকিছুই তখন সাক্ষ্য দিবে। এর দ্বারা আমলনামা বা কৃতকর্ম প্রমাণিত হয়ে যাবে।

কৃতকর্ম প্রমাণিত হওয়ার পর ফয়সালা বা রায় প্রদানের বিষয়টি বাকী থাকে। আল্লাহ রায় ঘোষণা করবেন। একটা মানদণ্ডের ভিত্তিতে আল্লাহ সেদিন রায় ঘোষণা করবেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ ''আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়-বিচারের মানদণ্ড (মাওয়াজিন) স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না।''[৮৮] আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত 'মাওয়াজিন' শব্দটির একবচন 'মিজান' শব্দটিকে অনেকে দাঁড়িপাল্লা অর্থে ব্যবহার করেন। এবং তারা মনে করেন দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে পাপ-পুণ্য ওজন করা হবে। যাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে তারা সফলকাম হবে এবং যাদের পুণ্যের পাল্লা হালকা হবে, পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা আযাবে নিপতিত হবে। প্রকৃতপক্ষে পাপ-পুণ্য দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করার বিষয় নয়। পার্থিব জগতেও দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে সব বিষয়ের ওজন করা যায় না। বিজ্ঞান বায়ু, রক্তচাপ, তাপমাত্রা আবিষ্কারের যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এ কারণে বিজ্ঞানের নিকট কৃতজ্ঞতা জানানো অনিবার্য হয়ে পড়ে। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিষয়কে ওজন করা যায় না। আবার কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়েও পরিমাপ করা যায় না। এ সবের মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন মানদণ্ড রয়েছে। মরণোত্তর জীবনেও পার্থিব কর্মের তথা পাপ-পুণ্যের উচিত-অনুচিতের মূল্যায়নের জন্য কোন মানদণ্ড থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সে মানদণ্ড দাঁড়িপাল্লা হবে তা যুক্তি স্বীকার করে না। এ কারণে 'মিজান' শব্দটির অর্থ দাঁড়িপাল্লা না করে মানদণ্ড (Standard) করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ বিচার দিবসে কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে পুণ্যবান ও পাপী ব্যক্তিদের পার্থিব কর্মের মূল্যায়ন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

এবং এরূপ মূল্যায়নের ভিত্তিতে আল্লাহ সে দিন কারো আমলনামা ডান হাতে দিবেন আর কারো আমলনামা বাম হাতে দিবেন। যাঁরা ডান হাতে আমলনামা পাবেন তাঁরা সৌভাগ্যবান আর যারা বাম হাতে পাবে তাদের দুর্ভাগ্য। প্রথমোক্তদের পরিণতি হবে সুখকর আর শেষোক্তদের পরিণতি হবে দুঃখকর ও কষ্টদায়ক। এ সম্পর্কে কুরআন বলে ঃ

> সে দিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, [স্ফূর্তিতে] সে বলবে ঃ নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে, সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ হায় আমায় যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো ! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব ! হায় ! আমার মৃত্যুই যদি শেষ হতো। আমার ধন সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গল। ফেরেশ্‌তাদেরকে বলা হবে ঃ ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না। এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না।[৮৯]

১০ঃ৬। পুলসিরাত ঃ

বিচারকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর প্রত্যেকের উপর পুলসিরাত বা সেতু অতিক্রমের নির্দেশ হবে। আল্লাহ বলেন ঃ ''তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে জাহান্নাম বা পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে না। তোমাদের প্রভু অবশ্যই উহা অতিক্রম করাবেন। অতঃপর আমরা ধর্মভীরুদিগকে রক্ষা করব। আর অত্যাচারীদিগকে উহাতে [জাহান্নামে] উপুড় করে নিক্ষেপ করব।''[৯০] যারা জাহান্নামী হবে তারা পুলসিরাত অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। তারা এ সেতু অতিক্রম করতে গিয়ে জাহান্নামে নিপতিত হবে। এবং যারা জান্নাতী হবে তারা মর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন গতিতে এ সেতু অতিক্রম করবে।

১০ঃ৭। জান্নাত ও জাহান্নাম ঃ

১০ঃ৭ঃ১। জান্নাত ঃ

আরবী জান্নাত শব্দটি 'জান্না' শব্দ থেকে এসেছে। 'জান্না' শব্দের অর্থ ঢেকে দিয়েছে, গোপন রয়েছে, ছায়া দিয়েছে ইত্যাদি। এ থেকে 'জান্নাত' শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃক্ষের ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত স্থান, মনোরম বৃক্ষরাজিপূর্ণ বাগান। কুরআন ও হাদীসে জান্নাত বা বেহেশতকে পরম সুখকর স্থান বলে অভিহিত করা হয়েছে। সাধারণ মুসলিম ও ধর্মতাত্ত্বিকদের নিকট এ জান্নাত অর্জন হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ (Summum Bonum)। কিন্তু সূফীদের মতে জীবনের পরম লক্ষ জান্নাতের চেয়েও মহত্তর কিছু আর তা হচ্ছে আল্লাহর সান্নিধ্য বা লিকায়াল্লাহ লাভকরা।[৯১]

Dhaka University Institutional Repository

জান্নাত সৌষ্ঠব ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ । স্বর্ণ ও রূপার ইট দিয়ে ইহা তৈরী । এর গাঁথুনির উপাদান হল তীব্র সুগন্ধযুক্ত মেশক । মূল্যবান মনিমুক্তা হলো তার পাথর । জাফরান হল এর মাটি । ''এক একটা জান্নাত আকাশ ও পৃথিবী সম প্রশস্ত ।''[৯২] এরকম আটটি জান্নাত রয়েছে । এ জান্নাতগুলো হল ঃ (১) আদন, (২) খুলদ, (৩) নায়ীম, (৪) মাওয়া, (৫) দারুস সালাম, (৬) দারুল কারার, (৭) মাকামাহ্ এবং (৮) ফেরদাউস । এর মধ্যে ফেরদাউস সর্বোত্তম জান্নাত । এ জান্নাতসমূহ আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে । এর অধিবাসীরা উপভোগের তাবৎ উপাদান এখানে বিদ্যমান পাবে । কুরআনে বলছে ঃ

> তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর — যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর । তথায় তাদের জন্য আছে রকমারী ফল-মূল, . . . স্বর্ণখচিত সিংহাসনে তারা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে । তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা, পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না, আর তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে এবং রুচিসম্মত পাখির মাংস নিয়ে । তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায় । তারা যা কিছু করত তার পুরস্কারস্বরূপ । তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না, তারা সেখানে যা ইচ্ছা করবে তাই পাবে ।[৯৩]

সর্বোপরি আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে নিরাপদ ও শান্তির সাথে জান্নাতীরা সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করবে।

১০ঃ৭ঃ২ । জাহান্নাম ঃ

জাহান্নাম বা দোযখকে কুরআনে 'নার' বলেও অভিহিত করা হয়েছে । নার অর্থ হচ্ছে আগুন । আগুনের গৃহ ও সরঞ্জামাদিসহ অন্যান্য শাস্তিতে জাহান্নমীরা নিমজ্জিত থাকবে । জাহান্নামে অতি তাপ দেয়ার ফলে আগুন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করবে । এবং ইহা হবে কালো আঁধারে আচ্ছন্ন । এরূপ জাহান্নাম রয়েছে ৭টি । এ গুলো হলোঃ (১) হাবিয়া (২) জাহীম (৩) সাকার (৪)লাযা (৫) হুতামা (৬) সায়ীর এবং (৭) জাহান্নাম । কৃতকর্মের জঘন্যতা অনুসারে মানুষ এ সব দোযখে শাস্তি ভোগ করবে । যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণকে অস্বীকার করবে এবং বিভিন্ন অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হবে তারা জাহান্নামে নিপতিত হবে । জাহান্নামের শাস্তি প্রচণ্ড ভয়াবহ হবে । পাপের মাত্রা অনুসারে শাস্তিতেও তারতম্য হবে । কুরআন ও হাদীসে এ শাস্তির কঠোরতা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে । কুরআন বলছে ঃ ''তার পেছনে রয়েছে দোযখ । তাতে পুঁজ মিলানো পানি পান করানো হবে । ঢোক গিলে তা পান করবে এবং তা গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না । প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না । তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব ।''[৯৪] আযাব কেবল দৈহিক হবে না, মানসিকও হবে । ''সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে । আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কী ? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে । এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হবে, লম্বা লম্বা খুঁটিতে ।''[৯৫] এ ছাড়া হাদীসে লোহার মুগুরের আঘাত, সর্প দংশন, আগুনের বেড়ী, আগুনের পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি মাধ্যমে শাস্তি দেয়ার বর্ণনা রয়েছে ।

দোযখ বাস স্থায়ী হবে, না ক্ষণস্থায়ী হবে এ নিয়ে মতবিরোধ আছে । আল্লামা ইকবাল মনে করেন যে, স্থায়ী দোযখ বলে কিছু নেই । দোযখ হবে ক্ষণস্থায়ী । এবং দোযখ নির্যাতনমূলক কোন কারাগার নয় । বরং দোযখ হলো একটি শোধনমূলক অভিজ্ঞতা বিশেষ ।[৯৬] প্রকৃতপক্ষে দোযখবাস স্থায়ী ও ক্ষণকালের উভয়ই । যারা আল্লাহ ও তাঁর একত্বে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য দোযখ ও তার আযাব স্থায়ী হবে । কেননা, আল্লাহ বলেন ঃ ''আল্লাহ যাকে খুশী ক্ষমা করবেন, কিন্তু যারা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে তাদের ক্ষমা করবেন না । অন্যদিকে যাদের আল্লাহ ও রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস আছে তারা অন্যায় ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নির্দিষ্টকাল দোযখে বাস করবে ।''[৯৭]

১০ঃ৭ঃ৩ । জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে অস্তিত্বশীল কি-না ঃ

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে অস্তিত্বশীল আছে, না পুনরুত্থান দিবসে নতুন করে ইহা সৃষ্টি করা হবে ? এ দু'টি মতই মুসলিম মনীষীদের মধ্যে প্রচলিত আছে । একটি মত অনুসারে জান্নাত ও জাহান্নাম পুনরুত্থান দিবসে সৃষ্টি করা হবে । অপর মত অনুসারে, জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ব থেকে অস্তিত্বশীল রয়েছে । এবং পুনরুত্থান দিবসে নতুন করে জান্নাত বা জাহান্নাম সৃষ্টি করা হবে না ।

প্রথমোক্তদের মতে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান । আল্লাহর পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব । তাঁর শক্তিমত্তার দ্বারা তিনি পুনরুত্থান দিবসে বেহেশ্‌ত-দোযখ সৃষ্টি করবেন । তারা তাদের মতের সপক্ষে ''এ পৃথিবী ও আকাশকে অন্য পৃথিবী ও আকাশে পরিবর্তন করা হবে'' (২০ঃ৪৮) কুরআনের এ জাতীয় আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করেন ।

প্রথম মতটির চেয়ে দ্বিতীয় মতটির যুক্তি জোরালো । দ্বিতীয় মতের সমর্থকেরাও তাদের মতের সপক্ষে কুরআনের আয়াতসমূহ দলিল হিসেবে পেশ করেন । যেমন আল্লাহ বলেন ঃ ''তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত (উ'য়িদ্দাত) করা হয়েছে . . . তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য ।''[৯৮] আবার মুহাম্মাদ (সঃ) এর মি'রাজে প্রত্যক্ষিত ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন ঃ ''তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে ? নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত । যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল । তার দৃষ্টিভ্রম হয়নি এবং সীমা লঙ্ঘনও করেনি । নিশ্চয় সে তার পালন কর্তার

Dhaka University Institutional Repository

মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে ।''[৯৯] প্রথমোক্ত আয়াতে প্রস্তুত করা হয়েছে (উ'রিদ্দাত) শব্দটি পুরাঘটিত বর্তমান কাল বুঝায় । এবং 'প্রস্তুত করা হয়েছে' এর দ্বারা সকল সরঞ্জাম এবং উপকরণসহ সৃষ্টি করা বুঝায় । এবং পরবর্তী আয়াতে মুহাম্মাদ (সঃ) মি'রাজ রজনীতে জান্নাত-জাহান্নামসহ যে সব ঘটনাবলী প্রত্যক্ষণ করেছেন তা দৃঢ়তার সাথে সত্যায়ণ করা হয়েছে । এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, জাহান্নাম বা জান্নাত যদি বর্তমানে অস্তিত্বশীল থাকে তাহলে সাধারণ লোকদের নিকট না হলেও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায়তো তা প্রমাণিত হবে । কিন্তু অদ্যাবধি কোন বিজ্ঞান জান্নাত বা জাহান্নামের অস্তিত্বের কোন সন্ধান দিতে পারেনি । হতে পারে এত বিশাল জগতের অনেক কিছুইতো বিজ্ঞান এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি । যেমন সম্প্রতি মহাকাশের গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মহাকাশের অনেক বিষয়ই এখনো বিজ্ঞানীদের আয়ত্তের বাইরে রয়েছে । এরূপ হয়তো জান্নাত-জাহান্নামের অস্তিত্ব তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কারের বাইরে রয়েছে । অদূর ভবিষ্যতে হয়ত তাঁরা এদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে । কিন্তু ইসলাম এ সম্ভাবনা বাতিল করে দেয় । কেননা, ইসলাম অদৃশ্যে বিশ্বাসের তাগিদ দেয় । ঈমান বিল গায়ব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় । পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়, এবং এ সবে বিশ্বাস করা আবশ্যিক শর্ত । কখনো পার্থিব জগতে ইহা দৃষ্টিগোচর হলে ঈমান বিল গায়বের বিষয়টি থাকত না । তাই জান্নাত, জাহান্নামের অস্তিত্ব কখনো বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত হবার নয় । শুধু এটাই বলা যায় যে, এদের অস্তিত্ব আল্লাহর জ্ঞানে বিদ্যমান আছে ।

১০৪৮ । আল্লাহর সাথে মিলন ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সূফীদের নিকট জীবনের পরম লক্ষ হচ্ছে আল্লাহর সাথে মিলন বা একীভূত হওয়া । এ লক্ষ অর্জনের জন্য সূফী সাধক কঠোর সাধনা করে থাকে । সূফীদের মতে, আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে প্রেমের সম্পর্ক । মানুষ হচ্ছে প্রেমিক আর আল্লাহ হচ্ছেন প্রেমাস্পদ । প্রেমাস্পদের নিকট পৌঁছতে প্রেমিকের কষ্ট হয় । কুরআনও বলে ঃ ''আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে মানুষদেরকে কষ্ট স্বীকার করতে হবে । অতঃপর তারা আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পারবে ।''[১০০] কঠোর সাধনা দ্বারা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সূফী সাধক ঐশী জ্ঞান বা মা'রিফাত অর্জন করে । এরপর আল্লাহর সাথে মিলনের জন্য সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে । তখন মৃত্যু এ মিলনের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় । মৃত্যু হলেই প্রেমিক প্রেমাস্পদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমাস্পদ আল্লাহর হাকীকত উপলব্ধির জন্য সাধককে পাঁচটি মোকাম বা আলমের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এ আলমগুলো হচ্ছে ঃ (১) আলম-ই-নাসুত (২) আলম-ই-মালাকুত (৩) আলম-ই-জাবারুত (৪) আলম-ই-লাহুত এবং (৫) আলম-ই-হাহুত[১০১]

(১) আলম-ই-নাসুত ঃ

এ পার্থিব জগতকে আলম-ই-নাসুত বলা হয়। আলম-ই-আজসাম বা জড় জগৎ ও আলম-ই হাইওয়ান বা জীব জগৎ নিয়ে আলম-ই-নাসুত। এ স্তর সৃষ্টির সর্ব নিম্ন স্তর। আল্লাহর আনুগত্যের প্রকৃত পরিচয় এ স্তরে ঘটে। সাধকের লক্ষে পৌছানোর জন্য এ জগতের স্বরূপ ও মর্যাদা উপলব্ধি করা আবশ্যক।

(২) আলম-ই-মালাকুত ঃ

এটা সূক্ষ্ম দেহধারী সত্তার জগৎ। এটা রূহ ও ফেরেশতাদের জগৎ। একে 'আলম-ই-আরওয়াহ' বলা হয়। তাছাড়া জগতে যত বস্তু রয়েছে তার প্রতিটির সূক্ষ্ম আকার এ জগতে রয়েছে। এটাকে প্লেটোর 'ধারণার জগতের' সাথে তুলনা করা যায়। সূফী পরিভাষায় একে আলমে মিসাল বলা হয়। সুতরাং আলম-ই-মালাকুত 'আলম-ই-আরওয়াহ' ও 'আলম-ই-মিসাল' নিয়ে গঠিত। সাধক মিকির, ফিকির, মুরাকাবা ও মুশাহিদার মাধ্যমে এ স্তরে উপনীত হয়।

(৩) আলম-ই-জাবারুত ঃ

এটা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জগৎ। এ স্তরে সাধকের নিকট আল্লাহর গুণাবলী বা সিফাতের হাকীকত পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। সে আল্লাহর অসীম শক্তি, গৌরব, ঐশ্বর্য ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে। সে আল্লাহর রবুবিয়াত বা প্রভুত্বকে বুঝতে পারে। সাথে সাথে সে স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব ও সীমাবদ্ধতাকে অনুভব করতে পেরে অধিকতর সাধনায় লিপ্ত হয়।

(৪) আলম-ই-লাহুত ঃ

এ স্তরে সাধকের নিকট আল্লাহর সমষ্টিগত গুণাবলী প্রকাশিত হয়। এ স্তরে সাধক জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে আল্লাহর জাত বা সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। সে নিজেকেও ঐশী অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত বা নিমজ্জিত বলে উপলব্ধি করে।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) আলম-ই-হাহুত ঃ

এ স্তরে সাধকের উপলব্ধির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ স্তরে সাধক স্থান ও কালের উর্ধ্বে উঠে যায়। এখানে সে সৃষ্টি, প্রকৃতি, সিফাত বা গুণাবলী সবকিছুর অস্তিত্ব ভুলে যায়। তার উপলব্ধিতে কেবল আল্লাহর একত্ব বা ওয়াহদানিয়াতই থাকে। এ অবস্থায় সে আল্লাহর সত্তায় স্থিতি লাভ করে। সে আল্লাহময় হয়ে যায়। তার চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভব ও কর্মে রূপান্তরিত হয়। এ অবস্থা সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে, "যখন আমার বান্দা অতিরিক্ত আমল দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তাকে বন্ধু বলে জানি। এ অবস্থায় আমি তার কর্ণ হই, যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তাঁর চক্ষু হই, যদ্দ্বারা সে ধারণ করে এবং আমি তার পদযুগল হই যদ্দ্বারা সে চলে।"[১০২] এ ধরনের বন্ধু মৃত্যুর পর আল্লাহর সত্তায় মিলিত হয়। এবং শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করে।

আলম-ই-লাহুত ও আলম-ই-হাহুত স্তরে সাধক 'ফানা' ও 'বাকা' প্রাপ্ত হয়। 'ফানা' হচ্ছে স্বীয় অস্তিত্ববোধকে ভুলে যাওয়া। অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, রিয়া, লোভ-লালসা, কামনা, নিন্দা, দুনিয়ার মোহ ইত্যাদি আত্মকেন্দ্রিক, গুণ ও কার্যাবলীকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর গুণাবলী প্রতিষ্ঠা রূপে আত্মবোধকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে ফানা। এ প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী বলেন ঃ

> When the worshipper thinks no longer of his worship or himself, but is altogether absorbed in Him Whom he worships, that state is called fana, when a man has so passed away from himself that he feels nothing of his bodily members, nor of what is passing without, nor of what passes within his own mind.[১০৩]

'বাকা' হচ্ছে স্থিতি লাভ করা। আল্লাহর সত্তার স্থিতি লাভ করাকে বাকা বলে অভিহিত করা হয়। ফানা অবস্থায় সাধক সব কিছু ভুলে যায়, স্বীয় অস্তিত্ববোধকেও বিলীন করে দেয়, তখন সাধকের নিকট আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর বোধ থাকে না। সে আল্লাহময় হয়ে যায়। তার সকল কিছু জুড়ে কেবলই আল্লাহ। আল্লাহর অস্তিত্বই তার নিকট একমাত্র অস্তিত্ব। আল্লাহর গুণাবলীই তার গুণাবলী, আল্লাহর সত্তাই যেন তার সত্তা। এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে আবার ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে। এ অবস্থায়ই বিখ্যাত সূফী মনসুর হাল্লাজ উচ্চারণ করেছেন ঃ 'আনা আল হক' — আমিই সত্য বা আমিই আল্লাহ, বায়েজীদ বোস্তামী উচ্চারণ করেছেন, "সমস্ত প্রশংসা আমার, আমি কি গৌরবের অধিকারী," আবু বকর শিবলী উচ্চারণ করেছেন, "এ জগতে আমি ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ নেই।" মোট কথা বাকা অবস্থায় ব্যক্তি সত্তা আল্লাহর করুণায় আল্লাহর সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে Nicholson একটি চমৎকার

Dhaka University Institutional Repository

মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন ঃ "He who has attained to this station journeys in the Real, by the Real, to the Real, and he then is a reality (haqq)."[১০৪]

এ পার্থিব জীবনেই আল্লাহর সত্তায় স্থিতি লাভ সম্ভব হয়। মনসুর হাল্লাজ, বায়েজীদ বোস্তামী প্রমুখ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পার্থিব জীবনে যারা আল্লাহর সত্তায় স্থিতি লাভ করল বা মিলিত হল তারা মরণোত্তর জীবনে আল্লাহর সত্তায় মিলিত হবে এটা অসম্ভব নয় বা অযৌক্তিকও নয়। সূফীরা পার্থিব জীবনে আল্লাহর সত্তায় স্থিতি লাভের তুলনায় মরণোত্তর জীবনে আল্লাহর সাথে একীভূত হওয়া বা মিলনকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়। তারা মরণোত্তর জীবনে জান্নাত লাভের চেয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা বা আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়াকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আল্লাহময় হওয়াতে, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে বা আল্লাহর সাথে মিলনের ফলে ব্যক্তি সত্তার অস্তিত্ব লোপ পায় কি-না ? পরমাত্মার মিলনে ব্যক্তিসত্তা ধ্বংস হয় না বা তার অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে না। আত্মা অমর। পরমাত্মায় গিয়েও ইহা মৃত্যু, বিলোপ ও ধ্বংসের উর্ধ্বে থাকে। ব্যক্তি সত্তা কেবল নিজেকে শাশ্বত আনন্দের অধিকারী করে, স্বীয় জীর্ণতা-শীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে পরমাত্মার গুণাবলীকে আত্মীভূত করে। আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ "ইসলামী সূফীবাদের উচ্চতর স্তরে এই একত্বমূলক অনুভূতি সসীম খুদী নয়, এ খুদী কোনরূপ শোষণ প্রক্রিয়া মারফত অসীম খুদীর মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেলে না ; বরং এ হলো সসীমের প্রেমালিঙ্গনে অসীমের ধরা দেওয়া।"[১০৫] প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে সসীমের অসীমে উত্তরণ। সসীম একরূপ থেকে অন্যরূপে পৌঁছে। এতে অস্তিত্ব বিলীন হয় না। এ হচ্ছে সসীমের চেষ্টা সাধনার বিজয়। কঠোর সাধনার ফলে সে পরমাত্মায় মিলনের সৌভাগ্য অর্জন করে। তার অস্তিত্ব ধ্বংস হলে বিজয়ের স্বাদ গ্রহণের অবকাশ কোথায় ? এ মিলনে সসীম অসীমের মধ্যে অদৃশ্য হয়। বৃহত্তর ব্যাপ্তিতে নিজেকে বিস্তৃত করে।

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১। *গীতা*, ১৫/১৭, *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ২/৫/১, *প্রশ্ন উপনিষদ*, ৩/৩।

২। *তৈত্তিরীয় উনিষদ*, ২/৩/২।

৩। Radhakrishnan, S., *The Hindu View of Life*, London, Unwin Books, 1968, p. 56.

৪। Sidgwick, *The Methods of Eth ics*, (7th ed.), London : Macmillan, 1967. p. 48.

Dhaka University Institutional Repository

৫। Radhakrishnan,S., op. cit., pp. 56-57.

৬। Qd., *The Hindu View of Life*, op. cit., *p.57.*

৭। Aurobindo, Sri, *The life Divine*, India : Sri Aurobindo Ashran Pondicherry, 1973, p. 176.

৮। *গীতা* - ২/২২ ।

৯। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৪/৪/৩৭ অনুবাদ, অতুল চন্দ্র সেন এবং অন্যান্য, হরফ প্রকাশনী, অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮০ ।

১০। *গীতা*, ২/১৩ ।

১১। Narahari, H.G., *Atman in Pre-upanisadic Literature*, India : Madras , Ganesh and Co., 1944, p. 43.

১২। Ibid, p. 3.

১৩। Baladev Raj Sharma, *The Concept of Atman in the Principal Upanisads*, New Delhi; Dinesh Publications, 1972, p. 30.

১৪। *ঋগবেদ*, ২/৩/১৭, *মুণ্ডক উপনিষদ*, ৩/১/১, *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*, ৪/৬ ।

১৫। Azizun Nahar Islam, *The Nature of Self, Suffering and Salvation*, Allahabad ; Vohra Publishers, 1987, pp. 36-38.

১৬। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* - ২/১/৩ ।

১৭। *মাণ্ডুক্য উপনিষদ*, ২-৭ ।

১৮। *গীতা* - ২/২০ ।

১৯। *কঠ উপদিষদ* - ১/৩/৩-৪, অনুবাদ, অতুলচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য, প্রাগুক্ত ।

২০। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ২/২/১-৪ ।

২১। নেমিনাথ সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী, *দ্রব্য সংগ্রহ*, নিউ দিল্লী, ১৯৫৬, সূত্র ২ ।

Dhaka University Institutional Repository

২২। ডেভিড হিউম, *মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা*, অনুবাদ, আবু তাহা হাফিজুর রহমান, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃঃ ২০৩ ।

২৩। *গীতা* - ২/১২, অনুবাদ, শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, ষষ্ঠ বিংশতিতম সংস্করণ, ভারত ঃ কলকাতা ; প্রসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৯৯৬ ।

২৪। *কঠোপনিষদ* - ১/২/১৮ ।

২৫। *গীতা* - ২/২৩-২৪, অনুবাদ প্রাগুক্ত ।

২৬। Radhakrishnan, s., *Indian Phiosophy*, Vol. 1, Indian edition, 1940, p. 250.

২৭। *ছান্দোগ্য উপনিষদ* - ৫/১০/১-২ অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

২৮। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ* - ৬/২/১৫ ।

২৯। *গীতা*, ৮/১৬ ।

৩০। *ছান্দোগ্য উপনিষদ* - ৫/১০/৩-৬

৩১। Walker, benjamin, *Hindu World, an Encyclopedic Survey of Hinduism*, Vol. 2, London, 1968, p. 614.

৩২। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৪/৪/৭ অনুবাদ, প্রাগুক্ত, দ্রষ্টব্য *গীতা* - ৫/২৬, ১৮/৫৪-৫৬ ।

৩৩। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৪/২/৩-৪ ।

৩৪। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৫/১০/৭, কৌষীতকি ১-২ ।

৩৫। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৩/২/১৩ ।

৩৬। *গীতা*, ২/৬২-৬৩, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৩৭। *গীতা*, ৯/৯, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৩৮। Brandon, S. G. F., (ed.,), *A Dictionary of Comparative Religion*, London, 1971, pp. 439-40.

৩৯। স্বামী অভেদানন্দ, *মরণের পারে*, দ্বাদশ সংস্করণ, অনুবাদ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা ১৯৭৫, পৃঃ ৪৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪০। *ঋগবেদ সংহিতা*, ৯/১১/৯-১১ ।

৪১। Radhakrishnan, S., *Indian Philosophy*, op. cit., pp. 114-15.

৪২। *ঋগবেদ সংহিতা*, ৯/৭৩/৯ ।

৪৩। *গীতা*, ৯/১১ ।

৪৪। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৫/১০/৩-৬ ; গীতা, ৮/২৫ ।

৪৫। Benjamin Walker, *Hindu World, an Encyclopedic Survey*, vol. 2, London, 1968, pp. 183-85.

৪৬। Ibid, vol. 1, pp. 434-35.

৪৭। *মুণ্ডক উপনিষদ*, ১/১/৯, *বৃহদারণ্যক* ৪/৪/১৪ ।

৪৮। *গীতা*, ৮/১৬ ।

৪৯। *মুণ্ডক উপনিষদ*, ৩/২/৮ ; *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ২/৪/১২ ।

৫০। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ২/১/২ ।

৫১। ঐ, ৩/১০/৫ ।

৫২। *আল কুরআন*, ৭ ঃ ১৭২ ; ৩২ ঃ ৯ ।

৫৩। ঐ, ২ ঃ ২১ ; ৫১ ঃ ৫৬ ।

৫৪। ঐ, ৯১ঃ৪ ।

৫৫। ঐ, ১০ঃ৪৯ ।

৫৬। ইমাম গাযালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, প্রথম খণ্ড, অনুবাদ, আবদুল খালেক, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৯২-৯৩ ।

৫৭। *আল কুরআন*, ৫১ঃ২১ ।

৫৮। ঐ, ১২ঃ৫৪ ।

৫৯। ঐ, ৬ঃ১২ ।

৬০। ঐ, ৬ঃ৯৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬১। ঐ, ১২ ঃ ৫৩ ।

৬২। মুহাম্মদ শাফী, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, অনুবাদ, মুহিউদ্দীন খান, সউদী আরব ঃ বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৬৭১-৭২ থেকে উদ্ধৃত ।

৬৩। ঐ, ৮৯ ঃ ২৭-৩০ ।

৬৪। ঐ, ১৫ ঃ ২৯, দেখুন ৩৮ ঃ ৭২ ।

৬৫। ঐ, ১৭ ঃ ৮৫ ।

৬৬। মুহাম্মদ শাফী, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২৯ ।

৬৭। Iqbal, M., *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (5th ed.), India : New Delhi ; Kitab Bhavan 1994, p. 103.

৬৮। *আল কুরআন*, ২ঃ২৮ ।

৬৯। ঐ, ৩৯ ঃ ৪২, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ; দ্রষ্টব্য, ১২ ঃ ১৫৬ ; ৫ ঃ ১৮ ; ৩৬ ঃ ৮৩ ।

৭০। আল কুরআন, ৮৩ঃ৭-৯, ১৮-২১ ।

৭১। আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম, *রূহের রহস্য*, অনুবাদ, লোকমান আহমদ আমিমী, ঢাকা ঃ ১৯৯৮, পৃঃ ১৮৫-৮৬ ।

৭২। ঐ, পৃঃ ৮৬ ।

৭৩। আল কুরআন, ১৪ ঃ ৪৮ ।

৭৪। ঐ, ২০ঃ১০৬-৭ ।

৭৫। ঐ, ২০ ঃ ৫৫ ।

৭৬। ঐ, ১৭ ঃ ৯৮, ১৩ ঃ ৫ ।

৭৭। ঐ, ৭৫ ঃ ৩-৪, ৩৬ ঃ ৭৯, ৮১ ।

৭৮। ঐ, ২ ঃ ২৬০ ।

৭৯। Lari, Sayyid Mujtaba Musavi, *Resurrection Judgement and the Hereafter*, tans. Hamid Algar, Iran: Qum ; 1992, p.61.

Dhaka University Institutional Repository

৮০। ইমাম গাযালী, *তহাফুতুল ফালাসিফা*, অনুবাদ, আবুল কাসিম মুহম্মদ আদনুদীন, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃঃ ২৩৫-২৪২ ।

৮১। ঐ, পৃঃ ২৪২ঃ৪৪ ।

৮২। *আল কুরআন*, ৫০ ঃ ৩-৪ ; ১৭ ঃ ৯৭, ৯৯ ; ২ ঃ ২৫৯, অনুবাদ, মুহাম্মদ শাফী, বঙ্গানুবাদ, মহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত ।

৮৩। ঐ, ৭০ ঃ ১০-১৪ ।

৮৪। ঐ, ৫০ ঃ ১৭-১৮ ; অনুবাদ প্রাগুক্ত, দ্রষ্টব্য, ৪৩ ঃ ৮০, ৮২ ঃ ১০-১২ ।

৮৫। ঐ, ১৭ ঃ ১৩-১৪, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৮৬। ঐ, ৯৯ ঃ ৭-৮, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৮৭। ঐ, ৩৬ ঃ ৬৫, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৮৮। ঐ, ২১ ঃ ৪৭, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৮৯। ঐ, ৬৯ ঃ ১৮-৩৪, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৯০। ঐ, ১৯ ঃ ৭১-৭২, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৯১। Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, India : New delhi , S. Chand and Co., p. 300.

৯২। *আল-কুরআন*, ৫৭ ঃ ২১ ।

৯৩। ঐ, ৪৭ ঃ ১৫, ৫৬ ঃ ১৫-২৫, ৩৯ ঃ ৩৪ ; অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৯৪। ঐ, ১৪ ঃ ১৬-১৭ ; অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৯৫। ঐ, ১০৪ঃ৪-৯, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৯৬। Iqbal, M., op. cit., p. 123.

৯৭। *আলকুরআন*, ৭৮ ঃ ২৩ ।

৯৮। ঐ, ৩ ঃ ১৩১, ১৩৩ ; অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৯৯। ঐ, ৫৩ঃ ১২-১৮, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

১০০। ঐ, ৮৪ ঃ ৬ ।

১০১। Nasr, Seyyed Hossein, *Science and Civilization in Islam*, Cambridge ; Massachusetts, 1968, p. 93.

১০২। Arberry, A.J., *Sufism*, London : George Allen & Unwin Ltd., 1950. p. 27.

১০৩। Margaret Smith, *Al-Ghazali the Mystic*, London, 1944. p. 190.

১০৪। Nicholson, R. A., *the Mystics of Islam*, Beirut, Lebanon, 1966, p. 164.

১০৫। Iqbal, M., op. vit., P. 110.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী মতের তুলনা ও বিচারমূলক পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী মতের তুলনা ও বিচারমূলক পর্যালোচনা

হিন্দুধর্ম ও ইসলাম উভয়ের জগৎ-জীবন সম্পর্কে সুসংবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। উভয় ধর্মে আধিবিদ্যক ও দার্শনিক জিজ্ঞাসার উত্তর রয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে পার্থিব ও মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে উভয় ধর্মের মত আলোচনা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের মতের নিকট সম্বন্ধ রয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য প্রকট। এদের কোন কোন মত বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য দর্শন দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, আবার কোন কোন মত বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। এখানে উভয় ধর্ম মতের তুলনামূলক বিচার করা হল।

১। পার্থিব জগৎ প্রসঙ্গে ঃ

মরণোত্তর জীবনের আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে পার্থিব জীবনের আলোচনা এসে যায়, যেমন অধিবিদ্যার আলোচনায় অবভাসের আলোচনা এসে যায়। আর জগতের আলোচনায় তার উৎপত্তি বা সৃষ্টি, প্রকৃতি, পরিণতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ খুবই স্বাভাবিক। এ সব সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী মত ইতঃপূর্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) আলোচনা করা হয়েছে।

জগতের উৎপত্তি, উপাদান, উদ্ভব প্রক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে হিন্দু বিভিন্ন শ্রুতি এবং স্মৃতিতে পার্থক্য থাকলেও হিন্দুধর্ম এ বিষয়ে ঐকমত্য যে, ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা বা ব্রহ্ম থেকে জগতের উদ্ভব হয়েছে।[১] এ প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মের সাথে ইসলামী মতের সাদৃশ্য রয়েছে। ইসলামও মনে করে যে, জগতের স্রষ্টা হচ্ছে আল্লাহ। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এদের মধ্যবর্তী সব কিছুকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।[২] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম জগতের পশ্চাতে কোন আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার করে। হিন্দুধর্মে এ সত্তা হচ্ছে ব্রহ্ম আর ইসলাম ধর্মে এ সত্তা হচ্ছে আল্লাহ। এ সত্তা জগতের উদ্ভব ঘটান। সুতরাং হিন্দু ও ইসলাম উভয়ই (প্রায় সকল ধর্মই) আকস্মিক সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী।* এবং জাগতিক বিবর্তনের যান্ত্রিক তত্ত্বের বিরোধী। তবে হিন্দু ধর্ম যেখানে সাপেক্ষ সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী ইসলাম ধর্ম সেখানে অনপেক্ষ

*হিন্দু সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শন এ মত থেকে ভিন্ন। সাংখ্য ও মীমাংসা মতে জগৎ বিবর্তনের ফল।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী । হিন্দু মতে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ । ব্রহ্মা স্বয়ং জগৎ নির্মাণের বৃক্ষ বা কাঠ ।[৩] মাকড়সার অন্তস্থ উপাদান দিয়ে যেমন তার গৃহ নির্মিত হয় তেমনি ব্রহ্মার* অন্তস্থ উপাদান দিয়ে এ জগৎ নির্মিত হয়েছে । আরেকটি মত অনুসারে, পূর্ব থেকে বিভিন্ন উপাদান বিশৃঙ্খলভাবে বিদ্যমান ছিল । ব্রহ্ম সে সব উপাদানে শৃঙ্খলা এনেছেন, বিক্ষিপ্ত উপাদানকে সুবিন্যস্ত করে এ জগতকে বিনির্মাণ করেছেন ।[৪] পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্ম মতে, আল্লাহ জগতের উপাদান কারণ নয় বা আল্লাহ হতে জগৎ উদ্ভূত হয়নি । এবং বিদ্যমান বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেও তিনি জগতের উদ্ভব ঘটাননি । বরং তিনি শূণ্য হতে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন । তিনি কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করলেই তা অস্তিত্বশীল হয়ে যায় ।[৫] কোন বস্তুকে অস্তিত্বে আনয়নের জন্য তাঁর কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না । এখন 'ব্রহ্মা পূর্বঃস্থিত বস্তু থেকে জগতকে সৃষ্টি করেছেন'— এ মতকে যদি স্বীকার করে নেয়া হয় তাহলে পূর্বঃস্থিত বস্তুগুলোর উদ্ভব কি করে হলো সে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং এটা অব্যাখ্যাত থেকে যায় । অপর দিকে 'আল্লাহ শূণ্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন'— এ মতকে যদি স্বীকার করে নেয়া হয় তাহলে যুক্তিবিদ্যার 'শূণ্য থেকে কেবল শূণ্যের উদ্ভব হয়'—নীতি প্রত্যাখ্যাত হয় । যদি বলা হয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান বলে এটা সম্ভব, তাহলে আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তাকে নির্বিচারে মেনে নিতে হয় । সে ক্ষেত্রে বিচার-বুদ্ধির স্থলে নির্বিচারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় ।

'জগৎ অবিরত পরিবর্তনশীল' বেদের এ মতের সাথে কুরআনের মতের মিল রয়েছে । বেদের ন্যায় কুরআনও মনে করে যে, জগৎ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে ।[৬] জগতের এ প্রকৃতি সম্পর্কে বেদ ও কুরআনের ধারণা বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব', 'আপেক্ষিকতত্ত্ব'এবং মহাকাশ সম্পর্কে 'হাবেলের আইন' দেখিয়েছে যে, জগৎ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ও সম্প্রসারণশীল । আবার 'ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন'— শংকরাচার্যের এ মতের সাথে সূফী দার্শনিক ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহাদাতুল ওয়াজুদ' মতের সাদৃশ্য রয়েছে । ইবনুল আরাবীর মতেও আল্লাহ ও জগৎ অভিন্ন । শংকারাচার্য যেমন বলেন, জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ তেমনি ইবনুল আরাবীও বলেন যে, জগৎ আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর প্রকাশ । জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে হিন্দু বিভিন্ন গ্রন্থ ও দার্শনিকদের মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয় তেমনি মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয় । তবে হিন্দু ও ইসলাম মতে যে বক্তব্যটি অভিন্ন তা হচ্ছে — জগতের স্বয়ম্ভূতা নেই । জগৎ তার অস্তিত্বের জন্য অন্য সত্তার উপর নির্ভরশীল । এবং জগৎ

---

* হিন্দুধর্মে অসংখ্য দেব-দেবীর বিশ্বাস রয়েছে । এঁদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব বা মহেশ্বর প্রধান তিন দেবতা । ব্রহ্মা হচ্ছেন জগতের সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু জগতের রক্ষা কর্তা এবং শিব হচ্ছেন ধ্বংস কর্তা ।

Dhaka University Institutional Repository

চিরন্তন নয়। নির্দিষ্ট কাল পর জগৎ এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে জগতের ধ্বংস ও বিনাশ প্রসঙ্গে হিন্দু ও ইসলামী মতে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। হিন্দু মতে জগতের ধ্বংস হবে, নির্দিষ্ট বিরতির পর আবার জগৎ সৃষ্টি হবে। আবার নির্দিষ্ট কাল অতিক্রমের পর জগতের ধ্বংস হবে। নির্দিষ্ট বিরতির পর জগৎ পুনরায় সৃষ্টি হবে। এভাবে জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস চক্রাকারে অনন্ত কাল ঘটতে থাকবে। এ চক্রের কখনও অন্ত ঘটবে না।[৭] কিন্তু ইসলামী মতে জগৎ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে। জগতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এ জগতের আর কখনো সৃষ্টি হবে না। এরপর মানুষ কখনো পার্থিব জীবনের সম্মুখীন হবে না। অবশ্য মানুষ এ ধ্বংসের পর পুনরুত্থিত হবে এবং পরকালীন সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে। খ্রিস্ট ধর্ম মতেও এ জগৎ ধ্বংসের পর পুনরায় আর সৃষ্ট হবে না।

২। জীবনের তাৎপর্য প্রসঙ্গে ঃ

জগতে জীবনের মূল্য কতটুকু, জীবনের তাৎপর্য কী, এ জগৎ দুঃখময় না সুখময় — এ নিয়ে কবি, সাহিত্যিক এবং দার্শনিকেরা বিভিন্ন মত দিয়েছেন। কেউ কেউ মনে করেন এ জগৎ দুঃখময়। এঁদের মধ্যে হিসিয়ড, ওমর খৈয়াম, বায়রন (Byron), শোপেনহাওয়ার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। শোপেনহাওয়ার তাঁর বিখ্যাত *The World as Will and Idea* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, জগতে কেবল দুঃখই আছে। পরম সত্তা হচ্ছে ইচ্ছা। বেঁচে থাকার ইচ্ছা জগতের সকল সংগ্রাম, দুঃখ ও মন্দের কারণ। ইচ্ছা অভাবের নির্দেশ করে। অভাব থেকে মানুষ কখনো মুক্তি পায় না। ইচ্ছা হচ্ছে অসীম। একটা পূরণ হলে অন্য আরেকটা ইচ্ছার সৃষ্টি হয়। এভাবে ইচ্ছা থেকে অভাব, অভাব থেকে দুঃখ মানব জীবনে লেগেই থাকে। মানুষ কখনো এ দুঃখ থেকে মুক্তির আশা করতে পারে না।[৮] আবার এ মতের বিপরীতে কেউ কেউ মনে করেন যে, এ জগৎ স্বরূপগতভাবে শুভ। জগতে যে অশুভ পরিলক্ষিত হয় তা অবাস্তব অথবা তা শুভ লাভের মাধ্যম। জীবনের প্রকৃত মূল্য ও সুখ রয়েছে। এ জগতে জীবন-যাপন নিরর্থক ও মূল্যহীন নয়, বরং জীবন যাপনের সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে।

এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে জ্যাঁ জাকুইজ রুশো (Jean Jacques Rousseau), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আলেকজান্ডার পোপ প্রমুখ সাহিত্যিক এবং গটফ্রিড উইলহেম লাইবনিজ, জিয়োরদানো ব্রুণো, বিশপ বার্কলে প্রমুখ দার্শনিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। আরেকদল দার্শনিকদের মতে জগৎ সুখময় ও দুঃখময় উভয়ই। তাঁদের এ মত সুখোৎকর্ষবাদ (Meliorism) নামে পরিচিত। এ মতবাদ অনুসারে শুভ এবং অশুভ উভয়ই বাস্তব। তবে শুভের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। মানুষ স্বীয় চেষ্টার দ্বারা জগতকে উৎকৃষ্টতর করতে পারে। জৈবিক এবং সামাজিক বিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

জগতকে উৎকৃষ্টতর করার দিকেই পরিচালিত হয় । এ মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে উইলিয়াম জেমস, এইচ জি ওয়েলস (H.G. Wells) , আর বি পেরি (R.B. Perry) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । এ প্রসঙ্গে প্রায় সকল ধর্ম বিশেষ করে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম দুঃখবাদ ও সুখোৎকর্ষবাদের বিরোধী এবং আশাবাদের সমর্থক ।* হিন্দু ও ইসলাম উভয় মতে এ জগতে দুঃখের প্রকৃত অস্তিত্ব নেই । জগতে যে দুঃখ পরিলক্ষিত হয় তা সুখ লাভের মাধ্যম বা উপায়মাত্র । হিন্দুধর্ম ও দর্শন মতে, জগতে মানুষ যে দুঃখ-দুর্দশা, বেদনা-কষ্ট ভোগ করে, তা তার অতীত কর্মের ফল । দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়ে সে তার অতীত সকাম কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে । কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করলে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ও আসক্তি মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না ।[৯] অনুরূপ ইসলাম ধর্ম অনুসারে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট, প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগ মানুষের কৃত কর্মের কারণে ঘটে থাকে । যেমন, আল্ কুরআন বলে, ''স্থলে ও জলে মানুষের কৃত কর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে ।''[১০] আবার ইসলাম মতে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট, এবং বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষার জন্যও দিয়ে থাকেন । আল কুরআন বলছে ঃ ''অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে । তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের ।''[১১] ''মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে । যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে এবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় । সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত ।''[১২] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম মতে, জাগতিক দুঃখ, কষ্ট, দুর্যোগ-দুর্বিপাক মানুষের কৃত কর্মের দরুন উপস্থিত হয় এবং মানুষ সুখ প্রাপ্তি বা অভিষ্ট লক্ষ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দুঃখ-দুর্দশা ও বেদনা-কষ্ট ভোগ করে । সেহেতু হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম জগৎ সম্পর্কে আশাবাদী এবং উভয় ধর্ম মতে জীবন-যাপনের নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে ।

জীবন মূল্যবান । জীবন-যাপনের সুনির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে । তাই বলে জীবন যথেচ্ছভাবে বিকশিত হতে পারে না । অভীষ্ট লক্ষে পৌছার জন্য জীবন শৃঙ্খলিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন । জমিতে আগাছা জন্মানোর জন্য কোন চাষাবাদ প্রয়োজন হয় না । কিন্তু ফসল ফলানোর জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ ও যত্নের প্রয়োজন হয় । তেমনি জীবনকে অর্থবহ করার জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সাধনার প্রয়োজন হয় । হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্ম জীবনকে অর্থবহ করার জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিভিন্ন অনুশীলন প্রক্রিয়া সরবরাহ করে । হিন্দুধর্মে এ নিয়ম পদ্ধতি

---

* বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে এ অভিযোগ করা হয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম দুঃখবাদী । এ অভিযোগ সত্য নয় । বৌদ্ধ ধর্ম অনুসরেও মানুষ জাগতিক দুঃখকেঅতিক্রম করে সুখ অর্জন করতে পারে । নির্বাণ লাভের মাধ্যমে মানুষ সুখী হতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থ তথা বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে আর ইসলাম ধর্মে এ নিয়ম পদ্ধতি পাওয়া যায় কুরআন ও মুহাম্মাদ (সঃ) এর প্রদর্শিত মত ও পথে। হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম জীবনের জন্য পরম লক্ষও সরবরাহ করে। হিন্দুধর্ম মতে, এ লক্ষ হচ্ছে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সাথে একীভূত হওয়া। আর ইসলাম মতে — এ লক্ষ হচ্ছে মরণোত্তর জীবনে জান্নাতের পরমানন্দ ভোগ করা। অবশ্য সূফীদের মতে এ লক্ষ হচ্ছে আল্লাহর দীদার বা মিলন লাভ করা।

এ লক্ষ অর্জনের জন্য হিন্দু ও ইসলাম, উভয় ধর্ম পার্থিব জগৎ ও জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করে। এ পার্থিব জগৎ হচ্ছে কর্মক্ষেত্র। এ কর্মের মূল্যায়ন হয় মানুষের মৃত্যুর পর। হিন্দুধর্ম অনুসারে কর্ম যদি মোক্ষের জন্য পর্যাপ্ত না হয় তাহলে মৃত্যুর পর মানুষকে পার্থিব কর্মের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রাণী এমনকি কীট পতঙ্গ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করতে হয়। অনুরূপ ইসলাম ধর্ম অনুসারেও মৃত্যুর পর জান্নাতে বাস হবে না জাহান্নামে বাস হবে তা নির্ভর করে মানুষের পার্থিব কর্মের উপর। তাই হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্ম পার্থিব জীবনকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

৩। মৃত্যুর তাৎপর্য প্রসঙ্গে ঃ

জীবন আছে বিধায়ই মৃত্যু আছে। জীবনের মধ্যেই যেন মৃত্যুর বীজ নিহিত থাকে। জীবনের পরম শত্রু হচ্ছে মৃত্যু। তার সময়-ক্ষণ অনুসারে মৃত্যু জীবনের উপর হানা দেয়। এ হানা থেকে জীবন নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। অনিবার্যভাবে তাকে মৃত্যুর কাছে ধরা দিতে হয়। হিন্দু এবং ইসলাম, উভয় ধর্ম মনে করে জীবনেব জন্য মৃত্যু অনিবার্য। গীতা মতে, ''জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ঃ'' — যে জন্মে তার মৃত্যু নিশ্চিত।[১৩] এভাবে কুরআনও বলেঃ ''তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু কিন্তু তোমাদের পাকড়াও করবেই — যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।''[১৪] তবে হিন্দু ও ইসলাম কোন ধর্মই মৃত্যু বলতে জীবনের ধ্বংস বা বিনাশ বোঝে না। এ প্রসঙ্গে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম জড়বাদীদের বিরোধী। জড়বাদীদের মতে, অন্যান্য বস্তু যেমন শেষ পরিণতিতে অস্তিত্ব হারায় মানুষও তেমনি মৃত্যুতে বিনাশ হয়ে যায়। সেহেতু তার পুনর্জন্ম বা মৃত্যুর পর শাস্তি বা শাস্তি ভোগের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু হিন্দু ও ইসলাম মতে মৃত্যুতে মানুষ একটা স্তর থেকে অন্য আরেকটা স্তরে উপনীত হয় মাত্র। তার অবস্থার পরিবর্তন হয়। উভয় ধর্মই মনে করে সারা জীবনব্যাপী মানুষ যে নৈতিক কর্ম করে, মৃত্যুর পর সে কর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয়। এ ফল ভোগ প্রক্রিয়ায় হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম মতে পার্থক্য রয়েছে। হিন্দুধর্ম অনুসারে কর্মফল

Dhaka University Institutional Repository

ভোগের জন্য মানুষকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে এ পার্থিব জীবনে দুঃখ-কষ্ট, বেদনা সহ্য করতে হয়। এবং মোক্ষ লাভ না করা পর্যন্ত তাকে বার বার জন্ম গ্রহণ করতে হয় এবং জাগতিক দুঃখ-কষ্ট, ভোগ করতে হয়। সুতরাং হিন্দুধর্ম মতে, মৃত্যু মানে জীবনের বিনাশ নয়, বরং এর অর্থ এক জীবন ত্যাগ করে আরেক জীবনের মোকাবিলা করা। ইসলাম ধর্ম অনুসারে, মৃত্যুর পর কবরে, জান্নাতে বা জাহান্নামে তাকে পার্থিব নৈতিক কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। জান্নাতে বা জাহান্নামে সে অনন্ত কাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। কর্মের ফল ভোগের জন্য তাকে কখনো আর পার্থিব জীবনের মোকাবিলা করতে হয় না। সুতরাং ইসলাম ধর্ম অনুসারেও, মৃত্যু মানে জীবনের ধ্বংস বা বিনাশ নয়, বরং এর অর্থ ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন ত্যাগ করে পরকালীন স্থায়ী-অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা।

৪। মানুষের সারসত্তা প্রসঙ্গে ঃ

দেহ এবং আত্মা নিয়েই মানুষ। দেহকে আশ্রয় করে আত্মা থাকে। আত্মা দেহকে সচল ও সক্রিয় রাখে। দেহ থেকে আত্মার বিয়োগ ঘটলে দেহ নিষ্ক্রিয় ও অসার হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় দেহকে কেউ মানুষ হিসেবে ভাবে না। এখন আবদুল করীম হয়ে যায় আবদুল করীমের লাশ। এ থেকে ভাবা হয় দেহ মানুষের সারসত্তা নয়। বরং আত্মা হচ্ছে মানুষের সারসত্তা। আত্মা থাকার কারণেই মানুষ 'মানুষ'। এ সত্যটাকে প্রায় সকল প্রধান ধর্ম গ্রহণ করে। প্রায় সব ধর্মই মনে করে মানুষের মধ্যে একটা শাশ্বত আত্মা রয়েছে। এ আত্মা মানুষের চালক ও নিয়ন্ত্রক। হিন্দু ও ইসলাম, উভয় ধর্ম মনে করে এ আত্মা মানুষের সারসত্তা। এ সারসত্তা দেহের বাহির থেকে অর্থাৎ পরমাত্মা থেকে আসে। পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা মানুষের সারসত্তা হিসেবে বাহির থেকে আসা আত্মাকে বোঝে না। যুক্তিবিদ্যা অনুসারে মানুষের সারসত্তা হচ্ছে 'প্রাণীত্ব' এবং 'প্রজ্ঞা'। প্রাণীত্ব হচ্ছে তার জাতি আর প্রজ্ঞা হচ্ছে তার বিভেদক লক্ষণ। এরিস্টটল প্রথম মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'প্রজ্ঞা সম্পন্ন প্রাণী' বলে। মানুষের সারসত্তা সম্পর্কে এরিস্টলের মতের সাথে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মতের তেমন কোন বিরোধ নেই। কারণ এরিস্টলও মনে করেন যে, মানুষের মধ্যে প্রাণীর আত্মার চেয়ে উন্নততর একটা আত্মা আছে। এ আত্মাকে এরিস্টটল 'প্রজ্ঞাসঞ্জাত আত্মা' বলে অভিহিত করেছেন। প্রজ্ঞা হচ্ছে আত্মার একটা উন্নততর শক্তি। এ শক্তির সাহায্যে মানুষ উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি নিরূপণ করতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মানব জীবনে এরিস্টটলের 'প্রজ্ঞাসঞ্জাত আত্মা' এবং হিন্দু ও ইসলামী ধারনায় 'আত্মার' ভূমিকা একই। তবে এরিস্টটল এবং হিন্দু ও ইসলামী মতের পার্থক্য এখানে যে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম যেখানে মনে করে মানব দেহে আত্মা বাহির থেকে আসে সেখানে এরিস্টটল মনে করেন আত্মা বহিরাগত নয়, আত্মা

Dhaka University Institutional Repository

দেহের আকার ও প্রক্রিয়া । মানুষের এ সারসত্তা বা আত্মা মরণোত্তর জীবন ও বিভিন্ন অবস্থার সাথে জড়িত । আত্মা অমর, এটা মানবের মৃত্যুর পর বিভিন্ন অবস্থা ও পরিণতির সম্মুখীন হয় । মরণোত্তর জীবনে আত্মা সুখ বা দুঃখ ভোগ করে । সেহেতু আত্মার স্বরূপ, অমরত্ব, পরিণতি ইত্যাদি সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী মতের তুলনা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে ।

৪ ঃ১ । আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে ঃ

আত্মা একটি রহস্যাপূর্ণ বিষয় । স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার শুরু থেকে এর স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করা হয়েছে । কিন্তু বিষয়গতভাবে আত্মা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয় । আর এ কারণে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে নানা মতের উদ্ভব হয়েছে । বিষয়গতভাবে আত্মাকে জানা যায় না বলে অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক দেহ থেকে ভিন্ন সত্তা হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন । আবার যারা দেহ থেকে ভিন্ন সত্তা হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাদের সিদ্ধান্ত জগৎ জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে । এভাবে আত্মা সম্পর্কে অভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয় না ।

আত্মা একটি বাস্তব সত্তা, একটি দ্রব্য, একটি স্বাধীন নীতি এ রকম একটি মত প্রাচীন গ্রীক দর্শনে প্রথম পাওয়া যায় । এটি 'আত্মা সম্পর্কে দ্রব্য মতবাদ' নামে পরিচিত । এ মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে একদল মনে করেন আত্মা জড়ীয় । এঁদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস ও ডেমোক্রিটাস এর নাম উল্লেখযোগ্য । হিরাক্লিটাসের মতে, আত্মা হচ্ছে অগ্নি শিখা (Firy Vapour) । আর ডেমোক্রিটাসের মতে, আত্মা মসৃণ, বৃত্তাকার ও জড় পরমাণু দিয়ে গঠিত । আরেক দলের মতে আত্মা হচ্ছে একটি সরল দ্রব্য । এঁদের মধ্যে প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো, আধুনিক দার্শনিক দেকার্ত, বার্কলে প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । আবার জন লকের (১৬৩২-১৭০৪) মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের আধার হিসেবে আত্মায় যেমন জড় দ্রব্য রয়েছে তেমনি মানসিক ক্রিয়ার কর্তা হিসেবে আত্মায় আধ্যাত্মিক দ্রব্যও রয়েছে ।

উল্লিখিত মতবাদের বিপরীতে, অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে, আত্মা হচ্ছে অভিজ্ঞতার সমষ্টি । এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে ডেভিড হিউম, জে এস মিল, উইলিয়াম জেমস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । এঁরা শাশ্বত, চিরন্তন সত্তা হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন । এঁদের মতে, আত্মা বলতে যা বুঝায় তা আমার অভিজ্ঞতা যা প্রত্যক্ষণ ব্যতীত কিছু নয় । হিউম বলেন, ''যখন আমি আমার 'আমি' বলতে যা বুঝাই, তার মাঝে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে প্রবেশ করি, তখন আমি কোন-না কোন বিশেষ প্রত্যক্ষণের ওপর, গরম বা ঠাণ্ডার ওপর, আলো বা ছায়ার ওপর, ভালবাসা বা

Dhaka University Institutional Repository

ঘৃণার ওপর, বেদনা বা আনন্দের ওপর হোঁচট খাই । আমি কোন প্রত্যক্ষণ ছাড়া আমিকে ধরতে পারি না । প্রত্যক্ষণ ছাড়া অন্য কিছুকে আমি কখনো লক্ষ্য করি না ।''[১৫] হিউমের ন্যায় জে এস মিলও বলেন যে, আত্মা সংবেদন ও অন্তরানুভূতির ধারা ব্যতীত অন্য কিছু নয় । অনুরূপ উইলিয়াম জেমসও আত্মাকে 'চেতনার প্রবাহ' বলে অভিহিত করেছেন ।

জড়বাদীরাও স্বতন্ত্র ও অভৌত সত্তা হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন । জড়বাদীদের মতে জগতের সব কিছু জড় দিয়ে গঠিত । এবং আত্মাও জড় থেকে রূপান্তরিত হয় । এ মত অনুসারে মানুষ হচ্ছে যন্ত্রবৎ, অন্যান্য বস্তুর ন্যায় মানুষও ভৌত নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় । জড়বাদীদের কেউ আত্মাকে জড়ের সম পর্যায়ের এবং জড়দেহ থেকে বিশোধিত একটি রূপান্তর বলে মনে করেন । এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) এর নাম উল্লেখযোগ্য । আবার কেউ আত্মাকে জড়ের কার্য বলে মনে করেন । এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে হলবাক (Holbach), ক্যাবানিস (Cabanis) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । আবার কারো মতে, আত্মা শারীরবৃত্ত ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত গুণ বা শারীরবৃত্ত ক্রিয়ার উপসত্তা মাত্র । এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে হাক্সলী (Huxley), ক্লিফোর্ড (Cliford), হজসন্ (Hodgson) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য ।[১৬] জড়বাদের আরেকটি রূপ হচ্ছে আচরণবাদ । এ মতবাদ অনুসারে মানুষ হচ্ছে উদ্দীপক-প্রতিক্রয়ার একটি সংগঠন মাত্র । কতিপয় মনোবিজ্ঞানী যেমন জে বি ওয়াটসন, হান্টার, ল্যাশলি (Lashley), টলম্যান, স্কীনার প্রমুখ এ মতবাদের প্রবর্তক । এঁদের মতে আত্মা বা মন স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া- প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছু নয় । আচরণবাদীদের অনুরূপ মত বিংশ শতাব্দীর বৃটিশ দার্শনিক গিলবার্ট রাইল (১৯০০-১৯৭৭),এ জে এয়ার (১৯১০-১৯৮৯) প্রমুখের দর্শনেও পাওয়া যায় ।গিলবার্ট রাইল মানুষের দৈহিক আচরণের অভ্যন্তরে আত্মা বা মানসিক প্রক্রিয়ার ধারণাকে অস্বীকার করেন । তিনি দেহাভ্যন্তরে আত্মার ধারণাকে 'যন্ত্রে ভূতের ধারণা' বলে উড়িয়ে দেন ।[১৭] এয়ারও মানুষকে দেখেছেন দৈহিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে এবং মানুষকে তিনি একটি বস্তু বলেই মনে করেন । একটি কার্পেটকে যেভাবে প্রমাণ করা যায় একজন মানুষকেও সেভাবে প্রমাণ করা যায় বলে তিনি মনে করেন ।[১৮]

অভিজ্ঞতাবাদী ও জড়বাদী মতকে বিভিন্নভাবে খণ্ডন করা হয়েছে । দ্রব্য মতবাদকেও নানাভাবে সমালোচনা করা হয়েছে । আসলে মানুষ কেবল বস্তু নয় । মানুষের যেমন দেহ আছে, তেমন তার চেতনা, কল্পনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ আছে । মানুষের দেহ আছে এ দিক থেকে সে বস্তু । কিন্তু তার চেতনা ও মূল্যবোধ থাকার কারণে বস্তু থেকে ভিন্ন কিছুও তার মধ্যে রয়েছে । তাই কেবল পদার্থিক মানদণ্ডে মানুষকে বিবেচনা করা উচিত নয় । পদার্থিক মানদণ্ডে

Dhaka University Institutional Repository

তার চেতনা, কল্পনা, আদর্শ ও মূল্যবোধকে পরিমাপ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় না বলে তার চেতনা, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে অস্বীকার করা যায় না। ''মানুষ ফুলকপি কিংবা কার্পেটের মতো একটি নিছক বস্তু নয়, কারণ সে যে চেতনা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী পদার্থিক বস্তুর তা নেই। অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব অপ্রতিপাদনযোগ্য, সুতরাং অগ্রাহ্য — এ যুক্তিতে মানুষের অভিজ্ঞতার বাস্তবতা ও স্বকীয়তাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না ; কারণ অভিজ্ঞতা কোন অপ্রতিপাদনযোগ্য কাল্পনিক ব্যাপার নয়। অন্যেরা যেমন তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকে অনুভব করতে পারে, আমি নিজেও তেমনি আমার অভিজ্ঞতাকে সরাসরি অনুভব ও প্রতিপাদন করতে পারি অন্তর্দর্শনের (introspection) মাধ্যমে।''[১৯] দ্রব্য মতবাদে মানুষকে দেহ ও আত্মাকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। এ মতবাদটিরই পরিচয় পাওয়া যায় হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে। হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মে আত্মাকে দেহাতিরিক্ত সত্তা হিসেবে মেনে নেয়া হয়। উভয় ধর্মই দেহ ও আত্মাকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে। আত্মা দেহকে আশ্রয় করে থাকে তাই বলে আত্মা দেহের অংশ বা উপবস্তু বা কোন গুণ নয়, তেমনিভাবে দেহও আত্মার অংশ নয়। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে উভয় ধর্মে পার্থক্য থাকলেও যে বিষয়টিতে ঐকমত্য তা হচ্ছে উভয় ধর্মই মনে করে যে, আত্মা ঐশী সত্তা। এটা জড়াত্মক নয়, বরং আধ্যাত্মিক। আত্মা পরিবর্তন ও ধ্বংসের অধীন নয়, বরং অপরিবর্তনীয় ও অক্ষয়। তবে হিন্দু ও ইসলামী ধারণার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, হিন্দুধর্ম মনে করে মানবাত্মা বা জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ। জীবাত্মা ব্রহ্মের প্রকাশ। ব্রহ্মই জীবাত্মার উৎস।[২০] কিন্তু ইসলাম ধর্ম মতে, আত্মা পরমাত্মা বা আল্লাহর অংশ নয়, বরং আত্মা হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ।[২১] তবে উভয় ধর্মই তাদের জীবন-দৃষ্টি, জগৎ সম্পর্কে ভাবনা, বিশ্বাস ইত্যাদির আলোকে আত্মা সম্পর্কে তাদের মতের অবতারণা করেছে। এ প্রসঙ্গে উভয় ধর্মেই মানবতার জন্য একটি হিতকর নির্দেশনা রয়েছে। উভয় ধর্মেই দেহ ও মনের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা হয়েছে। এতে দৈহিক গুণাবলী ও প্রয়োজন স্বীকারের পাশাপাশি মানষিক চেতনা আদর্শ, মূল্যবোধকে স্বীকার করা হয়েছে। ফলে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়। এ সমন্বয়ের মধ্যে মানবের ব্যাপক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর আমিনুল ইসলামের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

> অধ্যাত্মবাদীদের ন্যায় শুধু আত্মায় কিংবা বস্তুবাদীদের ন্যায় শুধু দেহে মানুষের স্বরূপানুসন্ধান না করে আগামীদিনের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের উচিত হবে দেহ ও মনের স্বতন্ত্র গুণ ও অবস্থান স্বীকার করা এবং তারই আলোকে মানব রহস্যের আবরণ উন্মোচনের প্রয়াস অব্যাহত রাখা। দেহ ও মনের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির ভিত্তিতে রচিত নতুন মানবতত্ত্ব হবে এমন যেখানে বস্তুবাদী বিজ্ঞানের সচল শক্তির সম্মিলন ঘটবে অবিচল আধ্যাত্মিক প্রেমশক্তির সঙ্গে আর তা যখন হবে, তখনই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপরিমেয় শক্তি ও সম্ভাবনাকে প্রয়োগ করা যাবে সমকালীন মানব সঙ্কট নিরসনে, তথা ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী মানব কল্যাণ প্রতিষ্ঠায়।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

৫। আত্মার অমরত্ব প্রসঙ্গে ঃ

অধিবিদ্যা এবং ধর্মতত্ত্বে আত্মার অমরত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। আবার জড়বাদী, প্রকৃতিবাদী ও বিশ্লেষণী দার্শনিকেরা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তথা অমরত্বকে অস্বীকার করেছেন। সম্ভবত প্লেটোর অধিবিদ্যায় সর্বপ্রথম আত্মার অমরত্বের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে এসেছে। প্লেটো তাঁর ফিডো (Phaedo) এবং ফিড্রাস (Phaedrus) সংলাপে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্লেটোর মতে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মা ধ্বংস হয় না। মৃত্যু মানুষকে আরেকটি ধাপে নিয়ে যায় মাত্র। মৃত্যু অর্থ হচ্ছে দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ। দেহ নানা পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। এ সব পদার্থ বিচ্ছিন্ন হলে বা নষ্ট হলে দেহও নষ্ট হয়। কিন্তু আত্মা থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কারণ আত্মা একটি সরল, অমিশ্র ও অচ্ছেদ্য দ্রব্য। তাই মৃত্যুতে বা অন্য কোনভাবে এর ক্ষয় হয় না। এর প্রজ্ঞাংশ পরম শুভের নিকট থেকে আসে আবার পরম শুভের নিকট চলে যায়। প্লেটোর অমরত্বের এ যুক্তিকে ইমানুয়েল কান্ট সমালোচনা করেছেন। কান্ট তাঁর *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, প্লেটো যে ধ্বংস প্রক্রিয়ার সাহায্যে আত্মার অমরত্ব দেখিয়েছেন তা জড়ীয় বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জড়ীয় বস্তুকেই কেবল বিভিন্ন উপকরণে বিচ্ছিন্ন করা যায়। কিন্তু আত্মা আধ্যাত্মিক দ্রব্য। তাই জড়ের বিচ্ছিন্নকরণ পদ্ধতি আত্মার উপর প্রযোজ্য নয়। তবে চেতনার তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। চেতনার তীব্রতা যদি হ্রাস করতে করতে শূণ্যে নামিয়ে আনা যায় তাহলে আত্মার ধ্বংস সম্ভব হতে পারে। প্লেটোর ন্যায় বার্কলে দেখিয়েছেন যে, আত্মা অবিভাজ্য, অদৈহিক ও বিস্তৃতির উর্ধ্বে। এ কারণে আত্মা অক্ষয়। প্রকৃতির কোন ধ্বংসলীলা বা প্রলয় এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাঁর মতে, মানবাত্মা স্বরূপগতভাবেই অমর। লাইবনিজের মতে, আত্মা চিৎপরমাণু (Monad)। আর সকল চিৎপরমাণুই শাশ্বত। মধ্যযুগে টমাস একুইনাসের দর্শনে প্লেটোর মতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। একুইনাসের মতেও আত্মা সরল ও অমিশ্র বলেই আত্মা অমর ও ধ্বংসের উর্ধ্বে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব একুইনাসের এ মতের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে আসছে।

আধুনিক দর্শনে ইমানুয়েল কান্ট, জেমস সেথ, মার্টিনিউ (Martineau) প্রমুখ আত্মার অমরত্বের পক্ষে নৈতিক যুক্তি দিয়েছেন। ইমানুয়েল কান্ট দু'টি যুক্তি দিয়েছেন। (এক), ন্যায়পরায়ণতা দাবী করে যে, পুণ্যবান ব্যক্তি তার পুণ্য অনুসারে পুরস্কার এবং পাপী ব্যক্তি তার পাপ অনুসারে শাস্তি পাবে। তা না হলে জগৎ অন্যায়-অনাচারে পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, এ জগতে পূণ্যবান ব্যক্তি যথাযথ পুরস্কার এবং পাপী ব্যক্তি যথাযথ শাস্তি প্রাপ্ত হয়

Dhaka University Institutional Repository

না। বরং অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় কর্তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিলক্ষিত হয়। এতে ন্যায়পরায়ণতার দাবী বিঘ্নিত হয়। সুতরাং এ জগতে ন্যায়পরায়ণতার দাবী মিটানো সম্ভব নয়। বরং মৃত্যুর পরে আরেকটি জগৎ থাকা প্রয়োজন যেখানে পুণ্যবান ব্যক্তি পুরস্কৃত এবং পাপী ব্যক্তি শাস্তি পাপ্ত হবে। আর পুরস্কার বা শাস্তি ভোগের জন্য আত্মার অমর হওয়া বাঞ্ছনীয়। (দুই), পরম শুভ অর্জনের জন্য নৈতিক জীবন হচ্ছে একটি অন্তহীন সংগ্রাম। কিন্তু এ জগতে নৈতিক আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে অর্জন করা সম্ভব হয় না। যদি নৈতিক আদর্শকে অর্জন করা সম্ভব না হয় তাহলে নৈতিকতার সংগ্রাম ও সাধনা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই এমন একটি অন্তহীন ভবিষ্যৎ জীবন হবে যেখানে মানুষ নৈতিক আদর্শকে অর্জন করবে। এবং সে অমরতা হবে ব্যক্তিগত অমরতা।[২৩] কিন্তু যেখানে এ পরিদৃশ্যমান জগতে একজন পুণ্যবান প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত থাকে সেখানে অদূর ভবিষ্যতে কোন জগতে সে যথাযথ প্রাপ্য পাবে এ আশার বাণী বঞ্চণা, নিপীড়ন, নির্যাতনের প্রতিকার, প্রতিশোধ ও বিচারের ব্যবস্থা না করে একদিকে বঞ্চিতকে সান্ত্বনা দেয়া আর অপরদিকে নির্যাতন নিপীড়নকে প্রশ্রয় দেয়া ও অন্যায়কারীকে নির্বিঘ্নে বেড়ে উঠতে দেয়ার শামিল মাত্র। এখানে কান্ট মরণোত্তর জীবনে ন্যায়বিচারের কথা বলে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন মাত্র। কান্টের এ মত পুণ্যবানকে পুণ্যকর্মে অটল থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে কিন্তু অন্যায় কর্তাকে অন্যায় কর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে না। কারণ অন্যায়কর্তা নগদ প্রাপ্তিকেই প্রাধান্য দেয়। এবং ইহজগতের জীবনকে সুখকর করেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেও অনেকে তার অমরত্বকে অস্বীকার করেছে। যেমন — এপিকিউরীয়রা আত্মাকে একাধিক জড় পরমাণু দিয়ে গঠিত বলে মনে করেন। মৃত্যুতে এ পরমাণুগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আত্মার বিনাশ ঘটে। সমকালীন প্রকৃতিবাদী দার্শনিকেরা আত্মাকে দেহ থেকে ভিন্ন কোন সত্তা বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, আত্মা দেহের তথা মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। মৃত্যুতে দেহের ধ্বংসের সাথে সাথে মস্তিষ্কের ক্রিয়া হিসেবে আত্মারও ধ্বংস হয়। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, মৃত্যুর পর ব্যক্তিসত্তা অবশিষ্ট থাকে, এটা যদি স্বীকার করা হয় তাহলে ধরে নিতে হয় যে, স্মৃতি, অভ্যাস ইত্যাদিও অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু শরীরতত্ত্ব এ কথা বলে যে — স্মৃতি, অভ্যাস ইত্যাদি হচ্ছে শরীর তথা মস্তিষ্কের ক্রিয়া। মৃত্যুর পরে শরীর তথা মস্তিষ্কের ধ্বংসের সাথে তার ক্রিয়ারও বিলোপ ঘটে।[২৪] এ মতের বিপরীতে দার্শনিক মারভিনসহ অনেকে যুক্তি দিয়েছেন যে, আত্মা বা মন তার প্রকাশের জন্য মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে কিন্তু অস্তিত্বের জন্য মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ মস্তিষ্ককে আত্মা তার অস্ত্র বা উপায় হিসেবে ব্যবহার করে মাত্র। প্রকৃতিবাদীরা হয়ত সত্তা ও তার উপায়ের পার্থক্যকে গুরুত্বের সাথে নেননি। প্রকৃতিবাদীদের ন্যায়

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন বিশ্লেষণী দার্শনিকেরাও মানুষকে জড়বস্তুর মতো নিছক একটা বস্তু বলে মনে করে। অন্যান্য বস্তু যেমন একটা নির্দিষ্ট কাল পর অস্তিত্ব হারায় মানুষও মৃত্যুতে স্বীয় অস্তিত্ব হারায়। মৃত্যুর পর ব্যক্তি সত্তা বা চেতনা বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাঁদের মতে, আত্মা বা অধিবিদ্যার এ ধরনের বিষয়ের শাব্দিক তাৎপর্য নেই। আত্মা বা এ ধরনের বিষয়কে পরখ করা যায় না। তাই আত্মা, মন, সত্তা ইত্যাদি শব্দ অর্থহীন। তাঁরা আধিবিদ্যক ধারণাবলীকে জড়বস্তুর মত পদার্থিক উপায়ে বা অভিজ্ঞতাবাদী মানদণ্ডে বিচার করতে চান। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। আত্মা ও শরীর দু'টো ভিন্ন বিষয়। তাই যে মানদণ্ড দিয়ে শরীরকে বিচার করা যায় সে মানদণ্ড দিয়ে আত্মাকে বিচার করা যাবে তা আশা করা যায় না। আর এ প্রয়াস নেয়া হলে তা হবে ফুটবল খেলার নিয়ম দিয়ে ক্রিকেট খেলাকে বিচার করার সামিল। * অধিকন্তু ফুটবলার খেলার নিয়ম-কানুন ক্রিকেট খেলায় প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়ে ক্রিকেট খেলা ও তার নৈপুণ্যকে অস্বীকার করা যেমন নির্বুদ্ধিতা তেমনি শরীরকে বিচারের মানদণ্ড দিয়ে আত্মাকে বিচারের প্রয়াসও এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা।

এ প্রসঙ্গে হীনযান বৌদ্ধধর্ম এবং অধিকাংশ চৈনিক ধর্ম ব্যতীত প্রায় সকল প্রধান ধর্মে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানব প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং এ সব ধর্মের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে আত্মার অমরত্বকে স্বীকার করা হয়। হিন্দু, ইহুদী, খ্রিস্ট ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম অনুসারে, দেহের বিনাশ ঘটে কিন্তু আত্মার কোন বিনাশ নেই। আত্মা অমর থেকে মৃত্যু পরবর্তী বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। হিন্দুধর্ম অনুসারে, আত্মা নিত্য, শাশ্বত এবং চিরবিদ্যমান। দেহ বিনাশ হলেও আত্মার কোন বিনাশ নেই।[২৫] আত্মা কখনও কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। গীতা বলছে ঃ ''শস্ত্রসকল একে ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারে না, জল ভিজাতে পারে না। এ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য।''[২৬] ইসলাম ধর্ম অনুসারেও মৃত্যুতে মানুষের দেহের ধ্বংস হয়, কিন্তু আত্মা অক্ষয় অপরিবর্তনীয় থাকে। কুরআন বলছে ঃ ''আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।''[২৭] তবে হিন্দুধর্ম যেখানে ব্যক্তিগত অমরত্বে বিশ্বাস করে না, ইসলাম ধর্ম সেখানে ব্যক্তিগত অমরত্বে বিশ্বাস করে। ইমাম গাযালীসহ ইসলামের অনেক ব্যাখ্যাতা মনে করেন

---

*প্রফেসর আমিনুল ইসলাম এ ধরনের প্রয়াসকে 'ফুটবল খেলার নিয়ম দিয়ে বাস্কেটবল খেলা বিচারের মতোই অযৌক্তিক' বলে অভিহিত করেছেন। (বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, পৃ তের)

Dhaka University Institutional Repository

যে, মানুষ তার পার্থিব দেহসহ পুনরুত্থিত হবে। এবং পরকালীন সুখ বা দুঃখ পার্থিব দেহেই মানবাত্মা ভোগ করবে। অবশ্য আল-কিন্দি, আল-ফারাবী, ইবনে সিনা প্রমুখ মনে করেন যে, মৃত্যুতে দেহ ত্যাগের পর মানবাত্মা বিশ্ব আত্মায় গিয়ে মিশে যায়। পার্থিব দেহ কখনোই আর আত্মার সাথে যুক্ত হয় না। হিন্দুধর্ম মতে, আত্মা পূর্ব-জীবনের দেহ কখনো গ্রহণ করে না। পুনর্জন্মে সে নতুন দেহ গ্রহণ করে। পূর্ব-জীবনের কর্ম অনুসারে সে দেহ গ্রহণ করে। আর মোক্ষপ্রাপ্ত হলে দেহহীন হয়েই সে ব্রহ্মের সাথে মিলিত হয়। ব্রহ্মের সাথে আত্মার মিলনকে সর্বোত্তম অমরতা বলে মনে করা হয়।

অনেকে আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে অধিবিদ্যার ধারণা ও ধর্মতত্ত্বের মতকে অধিমনোবিজ্ঞান (Parapsychology) এবং 'বস্তু ও শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়মের' সাহায্যে প্রমাণের প্রয়াস পান। অধিমনোবিজ্ঞানে টেলিপ্যাথি, মিডিয়ামের সাহায্যে প্রেতাত্মার যোগাযোগ, প্রেতাত্মার শ্লেট লিখন ইত্যাদির সাহায্যে বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের প্রয়াস নেয়া হয়। কিন্তু টেলিপ্যাথি সার্বিক নয়, এটা ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতা মাত্র। আর মিডিয়াম অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নয়। মিডিয়ামের মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা প্রকৃতই নির্দিষ্ট বিদেহী আত্মার, না এর মধ্যে অন্য কোন কারসাজি থাকে এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তাই অধিমনোবিজ্ঞান আত্মার অমরত্বকে প্রমাণ করতে পারে — এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আর 'বস্তু ও শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়মের' সাহায্যে আত্মার অমরতা প্রমাণের আগে আত্মাকে 'বস্তু' ও 'শক্তি' হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু কোন অভিজ্ঞতামূলক বা পদার্থিক উপায়ে আত্মার অস্তিত্বকে প্রমাণ করা যায় না। আত্মা একটা বস্তু বা শক্তি এটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়া যায় না। কেবল অনুমানের সাহায্যে এর পরোক্ষ জ্ঞান অর্জন করা যায়। কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে মানব প্রকৃতির অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। প্রকৃতিবাদীদের ন্যায় কেবল দেহ অথবা ভাববাদীদের ন্যায় কেবল আত্মা স্বীকার করা হলে মানব প্রকৃতিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না। দেহ ও আত্মাকে স্বতন্ত্র বলে স্বীকার করলেই মানব প্রকৃতিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা হয়। তাই মানব প্রকৃতির ব্যাখ্যায় আত্মা ও তার অমরত্ব সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ অনুমান ও ধর্মের স্বীকার্য সত্যকে মেনে নেয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে।

৬। মরণোত্তর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা প্রসঙ্গে ঃ

মানুষের নিকট মরণোত্তর জীবনের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মৃত্যুর পরে মানুষের পরিণতি কী হবে এ নিয়ে মানুষ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভেবে আসছে। এবং এ সম্পর্কে মানুষ প্রধানত দু'দলে বিভক্ত হয়েছে। একদল

Dhaka University Institutional Repository

কোন প্রায়োগিক পদ্ধতি বা পদার্থিক উপায়ে মরণোত্তর জীবনের পরিণতিকে আবিষ্কার করতে না পেরে মরণোত্তর জীবনকে অস্বীকার করেছে। এদের মতে, মৃত্যুতেই মানব জীবন নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর তার কোন পরিণতি ভোগের অবকাশ নেই। মানুষ প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট আবার প্রকৃতির নিয়মানুসারে সে প্রকৃতি থেকে বিলীন হয়ে যায়। রূপ, রস, গন্ধে ভরা-দু'দিনের এ বসুন্ধরাই তার নিকট মুখ্য। সে স্বীয় বুদ্ধি-বিবেচনা, শ্রম-সাধনা দিয়ে দু'দিনের এ জীবনকে সার্থক করার প্রয়াস পায়। অপরদলের মতে, রূপ, রস, গন্ধে ভরা — দু'দিনের এ বসুন্ধরা মানবের জন্য মুখ্য নয়। মানবের মুখ্য হচ্ছে মরণোত্তর জীবন। মরণোত্তর জীবনে মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে সুখ বা দুঃখ, শান্তি বা শাস্তি। মরণোত্তর জীবনের সুখ বা শান্তি নির্ভর করে ইহ-জীবনের কর্মের উপর। অর্থাৎ মানবের ইহ-জীবন হচ্ছে প্রস্তুতিকাল। সে নিজেকে মরণোত্তর জীবনের জন্য যেভাবে প্রস্তুত করবে, মরণোত্তর জীবনে সে রকম ফল ভোগ করবে। সে জড় প্রকৃতির ক্রীড়নক নয়। জড় প্রকৃতির ইচ্ছায় বা ধারাবাহিকতায় তার জীবনের অবসান ঘটবে—তা নয়। বরং এ প্রকৃতি ও তার জীবনের পশ্চাতে রয়েছে এক বুদ্ধিময় সত্তা। সে বুদ্ধিময় সত্তাই জগৎ ও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এ জগৎ-জীবনের পশ্চাতে সে সত্তার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা রয়েছে। সে সত্তার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা মাফিক জীবন পরিচালনার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। আর সে সত্তার বিধান অনুযায়ী পার্থিব জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হলে মরণোত্তর জীবন সুখময় হবে। তাই মানুষের জন্য সমুচিত হবে পার্থিব জীবনকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ না করে উপায় হিসেবে গ্রহণ করা। প্রায় সকল ধর্ম এ মতের প্রতিনিধিত্ব করে। হিন্দু, ইহুদী, খ্রিস্ট, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মে মরণোত্তর জীবনকে প্রধান মনে করা হয়। আর মরণোত্তর জীবনে শুভ পরিণতির জন্য ইহজীবনকে কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অবশ্য এ সব ধর্মে মরণোত্তর জীবনের বিভিন্ন পরিণতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিশ্বাসের পার্থক্য রয়েছে।

৬ঃ১। আত্মা কোথায় যায় প্রসঙ্গে ঃ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে — মৃত্যুর পর দেহ নষ্ট হয়ে যায়, আত্মা অক্ষয় ও অমর থাকে। হিন্দুধর্মে দেহকে দাহ করা হয়, আর ইসলাম ধর্মে দেহকে সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু অক্ষয় অমর আত্মা কোথায় যায়। এ সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী বিশ্বাসে পার্থক্য রয়েছে। হিন্দু ধর্ম অনুসারে মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মা দেবযানে ব্রহ্মলোকে গমন করে, আর পাপাত্মারা পিতৃযানে চন্দ্রলোকে গমন করে।[১৮] যে সব আত্মা চন্দ্রলোকে গমন করে সে সব আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এ পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং পূর্ব জন্মের কর্ম অনুযায়ী দেহ ধারণ করে। আর যে সব আত্মা ব্রহ্মলোকে গমন করে সে সব আত্মার যারা সেখানে মোক্ষ লাভে সক্ষম তারা এ মর্তে আর কখনো ফিরে আসে না। এবং পুনর্জন্ম গ্রহণ করে

Dhaka University Institutional Repository

না। কিন্তু ব্রহ্মলোকে যে সব আত্মার মোক্ষ ঘটে না, তারা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এ ধরায় ফিরে আসে।[২৯] পক্ষান্তরে, ইসলাম অনুসারে পুণ্যাত্মাদের রূহ মৃত্যুর পর সপ্তম আকাশের উপর ইল্লিয়্যীনে গমন করে এবং পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে, আর পাপাত্মাদের রূহ পৃথিবীর সপ্তম স্তরের নীচে সিজ্জীনে গমন করে এবং সেখানে অবস্থান করে।[৩০] ইল্লিয়্যীন থেকে পুণ্যাত্মাদের আর সিজ্জীন থেকে পাপাত্মাদের স্বীয় দেহের সমাধিতে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

৬ঃ২। কবরে শান্তি বা শাস্তি প্রসঙ্গে ঃ

হিন্দুধর্ম অনুসারে শব দাহ করা হয়। এতে শব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ শবের সাথে আত্মার কখনো কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। কিন্তু ইসলাম ধর্ম অনুসারে শব কবরে দাফন করা হয়। এখানে দেহের সাথে আত্মার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দাফনের অব্যবহিত পরে কবরে মুনকির ও নাকীর নামে দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং মৃত্যু ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করেন। সঠিক উত্তর দাতা কবরে সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত করেন। তার কবর প্রশস্ত হয়ে যায়। জান্নাতে তার নির্ধারিত স্থান দেখানো হয়। তিনি এতে পরমতৃপ্তি উপভোগ করেন। আবার হাদীসে এও আছে যে, পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঘুমিয়ে থাকবেন। আল্লাহ তাকে পুনরুত্থানের দিন জাগ্রত করবেন। তার কাছে মনে হবে স্বামী যেন নববধূকে ঘুম থেকে জাগাতে চলল। কিন্তু পাপী ব্যক্তি কবরে নানা রকম শাস্তিতে নিপতিত হয়। তার কবর তাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, এদিকের হাড় ওদিকে, আর ওদিকের হাড় এদিকে ঢুকে যায়। সর্প দংশন, আঘাতসহ বিভিন্ন শাস্তি পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে। পুণ্য ও পাপের মাত্রাভেদে কবরে শান্তি ও শাস্তিতে তারতম্য হয়ে থাকে।

৬ঃ৩। পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থান প্রসঙ্গে ঃ

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে ইহুদী, খ্রিস্ট, ইসলাম ও জরথুষ্ট্র প্রভৃতি ধর্ম পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে। মানব প্রকৃতির একটা বিরাট অংশ হচ্ছে তার কামনা-বাসনা। এবং এ কামনা-বাসনা তার জীবনব্যাপী কর্মকাণ্ডে পরিচালকের ভূমিকা পালন করে। মানুষের কামনা-বাসনার অন্ত নেই। একটা বাসনা পূরণ হলে তার বাসনা শেষ হয়ে যায় না, তার মধ্যে নতুন নতুন বাসনা সৃষ্টি হয়। স্থান কালভেদে তার কামনা-বাসনায়ও পরিবর্তন আসে। এ কামনা-বাসনা মানুষের মধ্যে নানা লোভ-মোহ সৃষ্টি করে। সে এ লোভ ও মোহকে জয় করতে চায়। কিন্তু তার পথ-পরিক্রমা কণ্টকহীন নয়। সে চায় সকল বাধাকে অতিক্রম করতে। কিন্তু নিমিষেই সে সকল বাধাকে অতিক্রম করতে পারে না। তারপর সে চায় সকল বাধাকে দমিয়ে দিতে। তার অভীষ্ট লক্ষ সে বিজয়ী হবে। তার নিকট

Dhaka University Institutional Repository

পরাজয় শব্দটি যেন অর্থহীন ও অসম্ভব। নিরন্তর সে এক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এ প্রতিযোগিতা হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখ প্রাপ্তির জন্য, মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য, বিষয়বৈভব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য। এ প্রতিযোগিতা তার অজান্তেই তার মধ্যে সৃষ্টি করে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অসৎ গুণাবলী। এভাবে অসংখ্য নানা কামনা-বাসনা, লোভ-মোহ দেহ ও জগৎ সংসারের প্রতি মানুষের বন্ধন সৃষ্টি করে। এ বন্ধন থেকে সে মুক্ত হতে পারে না, মৃত্যু এসে যায়। বিদেহী আত্মায় এ বন্ধন আরো দৃঢ়তার সাথে অনুভূত হয়। এ বন্ধন আত্মাকে পুনরায় দেহ ধারণে বাধ্য করে। একটি জোঁক যেমন তৃণের শীর্ষে গিয়ে অন্য তৃণকে আশ্রয় করে এবং নিজেকে তার উপর তুলে নেয়। তেমনি আত্মা মৃত্যুর পর পিতৃপুরুষ, দেব-দেবী বা অন্য কোন জীবের উপযোগী দেহ গ্রহণ করে।[৩১] মানুষ কি রকম দেহ গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে পূর্বজন্মে পার্থিব জীবনে কর্মের প্রকৃতির উপর। কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, এমনকি কেউ কুকুর, ব্যাঘ্র ইত্যাদি মানবেতর প্রাণীরূপে জন্ম গ্রহণ করবে।[৩২] এখানে প্লেটোর পুনর্জন্মবাদের সাথে হিন্দু পুনর্জন্মবাদের পার্থক্য রয়েছে। প্লেটোর মতে, আত্মা স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী দেহ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু হিন্দু মতে, আত্মা ইচ্ছা করলেই যে কোন দেহ গ্রহণ করতে পারে না। তার কর্ম অনুযায়ী সে দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পার্থিব জীবনে মানুষ পুণ্য-কর্ম বা পাপ-কর্ম যাই করুক তার ফল তাকে ভোগ করতে হয়। তার কোন কর্ম ফল নষ্ট হয় না। একমাত্র প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে তার কর্মফল ক্ষয় হয়। আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করে কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তবে সব ধরনের কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না বা সব ধরনের কর্মের জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। কেবল যে কর্মে আসক্তি থাকে, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা থাকে সে কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় এবং সে কর্মের জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করে জাগতিক দুঃখ, কষ্ট-বেদনা ভোগ করতে হয়। মানুষ যখন নিরাসক্ত কর্ম করতে সক্ষম হয়, তার কর্মে যখন কোন ফলাকাঙ্খা থাকে না, যখন কোন প্রকার কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা দ্বারা তাড়িত না হয়ে মানুষ কর্ম করে তখন তার মোক্ষ লাভ হয়। আর মোক্ষ লাভের পর মৃত্যু হলে তার পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। তখন সে ব্রহ্মের সাথে গিয়ে মিলিত হয় এবং পরম আনন্দ উপভোগ করে।

পক্ষান্তরে, ইসলাম ধর্মে পুনর্জন্মের কোন ধারণা নেই। ইসলাম ধর্ম অনুসারেও পার্থিব নৈতিক কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। তবে সে জন্য তাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় না। পার্থিব কর্মের পুরস্কার বা শাস্তি ভোগের জন্য তাকে পুনরুত্থিত হতে হয়। এ পুনরুত্থান সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। এ পুনরুত্থান মানুষের কর্মের কারণে ঘটে না, যেমন পুনর্জন্ম মানুষের কর্মের কারণে ঘটে। পুনরুত্থান ঘটে আল্লাহর ইচ্ছায়। আল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

হাশরের মাঠ বা একত্রিত হওয়ার মাঠে সকল মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ বর্তমান নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে পরিবর্তন করে পুনরুত্থিত হওয়ার মাঠে পরিণত করবেন।[৩৩] পুনরুত্থান দিবসে সকল মানুষ আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।[৩৪] মানুষ প্রত্যাবর্তিত হবে সশরীরে। পার্থিব জীবনে মানুষ যে দেহের অধিকারী ছিল সে দেহ নিয়েই সে উত্থিত হবে। মৃত্যুর পর তার দেহ ধ্বংস হয়ে যায়। দেহ পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়। এ মাটি থেকে আল্লাহ মানুষদের উত্থিত করবেন।[৩৫] মুসলিম দার্শনিকদের অনেকে যেমন আল-কিন্দি, আল-ফারাবী, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ প্রমুখ মনে করেন যে, পুনরুত্থান দৈহিক হবে না। পুনরুত্থান হবে কেবল আত্মিক। কিন্তু ইমাম গাযালী, ফখরুদ্দিন রাযী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী প্রমুখ মনে করেন যে, পুনরুত্থান হবে দৈহিক। পূর্বের দেহে আত্মা সংস্থাপিত হয়েই মানুষের উত্থান ঘটবে। ইমাম গাযালী তাঁর *তহাফুতুল ফালসিফা* গ্রন্থে দার্শনিকদের মত সবিস্তারে খণ্ডন করেছেন। ইমাম গাযালী প্রমুখের মত কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে[৩৬] দৈহিক পুনরুত্থানের প্রমাণ মেলে। এ উত্থানের পরে আল্লাহ মানুষের বিচার কার্য সম্পন্ন করবেন। এ বিচারে মানুষ তার সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত হবে এবং অসৎ কর্মের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এখানে হিন্দু কর্মবাদের সাথে ইসলামের সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা, ইসলামও মনে করে যে, মরণোত্তর জীবনে সুখ ও দুঃখ, পুরস্কার ও তিরস্কার মানুষের পার্থিব নৈতিক কর্মের ভিত্তিতেই প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, "বিচার দিবসে কারো প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবে না। বরং, তাদের কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান প্রদান করা হবে।"[৩৭] মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী জান্নাতে বিভিন্ন মর্যাদা প্রাপ্ত হবে অথবা জাহান্নামে মাত্রাভেদে শাস্তি প্রাপ্ত হবে। অবশ্য ইসলামে আল্লাহর ক্ষমায় বিশ্বাসও আছে। আল্লাহ অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার রাখেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিয়ে শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন। এবং এটা হবে মানুষের প্রতি কৃপার একটা দৃষ্টান্ত। ঈশ্বরের কৃপার ধারণা হিন্দু ধর্মেও রয়েছে। হিন্দুধর্মেও বিশ্বাস করা হয় যে, ব্রহ্ম কৃপাবশতঃ কারো পার্থিব জীবনে মোক্ষ ঘটিয়ে দিতে পারেন। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত মোক্ষ অর্জন সম্ভব নয়।[৩৮] অর্থাৎ মোক্ষ লাভের জন্য মানুষের ইচ্ছা ও কর্মই পর্যাপ্ত নয়। ব্রহ্ম যার উপর কৃপা করেন তিনিই নিষ্কাম কর্ম তথা মোক্ষ অর্জন করতে সক্ষম হন।

৬ঃ৪। স্বর্গ ও নরক প্রসঙ্গে ঃ

প্রায় সকল ধর্মে স্বর্গ ও নরকের ধারণা আছে। স্বর্গকে নানা রকম সুখ-সম্ভোগের আবাস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং নরককে বেদনাক্লিষ্ট শাস্তি ও কষ্ট ভোগের আবাস স্থল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ স্বর্গের কথা

Dhaka University Institutional Repository

ভেবে প্রশান্তি অনুভব করে আর নরকের শাস্তির ভয়ে নিজেকে সংযত করে। এ জগতে বিভিন্ন পেরেশানি, কষ্ট, দুঃখ, রোগ-শোক, হতাশা, সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতা নিয়ে মানুষের জীবন। বহু কিছুতেই তার সাধ জাগে কিন্তু সাধ্য হয় না। এমবতাবস্থায় স্বর্গ এমন একটি জীবন যেখানে দুঃখ-কষ্ট নেই, পেরেশানি নেই, রোগ-শোক নেই, জোর-জবর দস্তি নেই। ঝগড়া-বিবাদ নেই। আয়-বাণিজ্যের ঝক্কি-ঝামেলা নেই। কোন বিষয়ে এতটুকু অভাববোধ নেই। আছে কেবল শান্তি আর শান্তি। ভোগের সকল উপাদান সেখানে বিদ্যমান। কোন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ ব্যতীত কামনার সকল বস্তু উপস্থিত হবে। মানুষ অনবরত ভোগ করবে অথচ ভোগের আধিক্য ও স্থায়িত্ব কোন অরুচি বা বিরক্তির সৃষ্টি করবে না। প্রায় সব ধর্মে স্বর্গের এমন বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অপরদিকে, নরক হচ্ছে শাস্তি ও কষ্টে পরিপূর্ণ। সেখানে কোন আরাম বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নেই। সেখানে সুস্বাদু খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা নেই। পুঁজ, রক্ত সেখানকার পানীয়। পোশাক-পরিচ্ছদ হবে আগুনের। মানুষগুলো সব সময় আগুনের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। সর্প দংশনসহ নানাভাবে শাস্তি ভোগই হবে সেখানকার জীবনের প্রাপ্য। প্রায় সকল ধর্মে নরকের এমন বর্ণনা দেয়া হয়েছে।স্বর্গ ও নরকের এরূপ বর্ণনা হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মে রয়েছে।

হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম মতে, স্বর্গ সুখ-শান্তি, উপভোগ ও পরিতৃপ্তির স্থল। হিন্দুধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্ম এ সুখভোগ ও প্রাচুর্যকে অত্যন্ত জোরালোভাবে বর্ণনা করেছে। ইসলাম মতে, জান্নাতে বা স্বর্গে মানুষ দাস-দাসী পরিবেষ্টিত থাকবে। ইন্দ্রিয় সুখভোগের সব রকম উপাদান তার সামনে প্রস্তুত থাকবে। স্বর্গ সুখের বর্ণনায় কুরআন বলে ঃ ''স্বর্ণখচিত সিংহাসনে, তারা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা, পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে এবং রুচি সম্মত পাখির মাংস নিয়ে। তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়। তারা যা কিছু করত তার পুরস্কার স্বরূপ। তারা তথায় কোন অবান্তর ও খারাপ কথা শুনবে না।''[৩৯] এবং স্বর্গে বা বেহেশতে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।[৪০] একবার যে বেহেশতে প্রবেশ করবে তার সেখান থেকে আর বিচ্যুতি ঘটবে না, বা মানুষ সেখান থেকে এ ধরায়ও আর কখনো ফিরে আসবে না। তবে নরক বাস সবার জন্য স্থায়ী হবে না। কেউ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যৎসামান্য ঈমান ও আমল ছিল তার বদৌলতে বেহেশতে প্রবেশ করবে।[৪১] এদের নরক বাস হবে ক্ষণস্থায়ী। আর যাদের সামান্যতম ঈমান ছিল না, যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করেছে তারা স্থায়ীভাবে নরকের বেদনাক্লিষ্ট আযাব ভোগ করবে। এখানে ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

মতের সাথে হিন্দু মতের পার্থক্য রয়েছে। হিন্দু ধর্ম অনুসারে, স্বর্গ ও নরক ক্ষণস্থায়ী। সাধু-সন্যাসী বা পুণ্যাত্মাদের জন্য স্বর্গ স্থায়ী হয় না। আবার চরম পাপীর জন্যও নরক স্থায়ী হয়না। পার্থিব জগতে পুণ্য কর্ম করেছে অথচ ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারেনি, পারেনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম কর্ম করতে, এক কথায় মোক্ষ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, এমন লোক পুণ্য-ক্ষয় করতে স্বর্গে গমন করে।[৪২] আর যারা পাপাত্মা, যাদের পুণ্যকর্ম নেই, তারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য নরকে গমন করে। তবে স্বর্গে যাক আর নরকেই যাক সেখান থেকে আত্মা আবার মর্তে ফিরে আসে।[৪৩] অবশ্য ঋগবেদ স্বর্গ ও নরককে স্থায়ী আবাস হিসেবে দেখে। এবং স্বর্গ ও নরক থেকে আত্মাকে কখনো এ ধরায় ফিরে আসতে হয় না। কিন্তু উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে স্বর্গ ও নরকে ক্ষণস্থায়ী আবাস হিসেবে দেখা হয়েছে। এ স্বর্গ ও নরক জীবনের সাথে ইসলামী আলমে বরযখ বা কবর জগতের তুলনা করা যেতে পারে। কবর জীবনেও মৃত ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী সুখ বা কষ্ট ভোগ করে থাকে। তবে নির্ধারিত সময়ের পরে কবর থেকে মৃত ব্যক্তির পুনরুত্থান ঘটে। পক্ষান্তরে, হিন্দু স্বর্গ ও নরক থেকে মৃত ব্যক্তির পুনঃজন্ম ঘটে। মৃত ব্যক্তি তার কর্ম অনুযায়ী দেহ ধারণ করে এ ধরায় প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে পুনঃজন্মের ধারণা নেই। পার্থিব জীবন মোকাবেলার জন্য কখনো সে আর এ ধরায় প্রত্যাবর্তন করে না।

৬ঃ৫। পরমাত্মার সাথে মিলন প্রসঙ্গে ঃ

পার্থিব জীবনে আমরা দেখি যে, যে ব্যক্তি ক্ষমতাবান, যার প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, যে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী, যে সুন্দর, যে নানা নৈপুণ্যের অধিকারী, যে অসাধারণ, তার সাথে মিলিত হয়ে ও নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে মানুষ আনন্দ পায়, গর্ববোধ করে, নিজেকেও মর্যাদাবান মনে করে। পরমাত্মা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি অসীম, তিনি সর্বজ্ঞ, কল্যাণময়, তিনি দয়াময় এবং প্রেমময়। এ পরমাত্মার সাথে ধার্মিক মন মিলিত হতে চায়। তাঁর সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে চায়। তাঁর সাথে মিলিত হওয়া ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা সাধকের পরম লক্ষ। তাঁর মিলনের মধ্যে পরম আনন্দ, পরম তৃপ্তি। হিন্দুধর্মে এ পরমাত্মা হচ্ছেন ব্রহ্ম আর ইসলাম ধর্মে এ পরমাত্মা হচ্ছেন আল্লাহ। ব্রহ্ম হচ্ছেন সর্বেসর্বা। তিনি সর্ব শক্তিমান। তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন। তিনি অকারণিত কারণ। তাঁর থেকে জগতের সকল কিছু উদ্ভূত হয়েছে আবার তাতে বিলীন হয়ে যাবে। মানুষ এ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে নিজেকে মহান করে তোলে।''[৪৪] এ ব্রহ্মের অধীনস্থ বিভিন্ন শক্তি, দেবতা রয়েছে। হিন্দুধর্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব বিখ্যাত দেবতা। এঁদের ছাড়াও হিন্দুধর্মে অসংখ্য দেব-দেবীতে বিশ্বাস রয়েছে। এ সব দেব-দেবী জগতের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার দায়িত্বে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত থাকে । এ সব দেবতা আবার বিভিন্ন যুগে মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন অবতাররূপে মর্তে আবির্ভূত হন । কিন্তু ইসলাম ধর্মে কোন দেবতা বা অবতারে বিশ্বাস নেই । ইসলাম মতে, আল্লাহর শক্তি, গুণ ও কর্মে কোন অংশীদার নেই । কুরআন বলছে ঃ ''বল, আল্লাহ এক ; আল্লাহ অমুখাপেক্ষী । তিনি কারো জনক নন এবং তিনি জাতও নন । তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই ।''[৪৫] আল্লাহ এ জগতকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন । মানুষদেরকে সৎ পথ দেখানোর জন্য তিনি মানুষদের মধ্য থেকেই পয়গম্বর বা নবী মনোনীত করেন । নবীরা আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত ওহী মানুষের মাঝে প্রচার করেন । ইসলাম অনুসারে শেষ নবী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) । কিন্তু হিন্দুধর্মে কোন নবীর ধারণা নেই । ঋষি, মুণি ও দ্রষ্টারা প্রচারের কাজ করে থাকেন ।

হিন্দু জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে — নেতিবাচক দিক থেকেঃ জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পাওয়া আর ইতিবাচক দিক থেকে ঃ ব্রহ্মের সাথে বিলীন হওয়া বা মিলিত হওয়া । জীবন্মুক্তির পর মৃত্যু হলে বা বিদেহ মুক্তিতে আত্মা ব্রহ্মে গিয়ে মিলিত হয় । এ মিলন হচ্ছে মানবাত্মার উৎসের নিকট গিয়ে পৌছা । নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে সমুদ্রের সাথে একীভূত হয় । লবন যে রকম পানির সাথে মিলে যায়, মানবাত্মাও তেমনি ব্রহ্মের সাথে মিলিত হয় ।[৪৬] লবন পানিতে অদৃশ্য হয় কিন্তু পানির মধ্যে তার অস্তিত্ব থাকে । পানি থেকে লবনকে পৃথক করা যায় । ঠিক তেমনি ব্রহ্মের সাথে মানবাত্মা একীভূত হলেও মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য থাকে । মানবাত্মা ব্রহ্মের সাথে একীভূত হয়ে স্বীয় অস্তিত্ব হারায় না ।

পক্ষান্তরে, ইসলাম ধর্মে সংসারের প্রতি বন্ধনের ধারণা নেই, বা তার জাগতিক দুঃখ-কষ্টকে পূর্ব-জীবনেব কর্মের ফল বলেও মনে করা হয় না । এবং ইসলাম ধর্মে পুনর্জন্মেরও কোন ধারণা নেই । তাই মুক্তি বলতে ইসলামে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি বুঝায় না । ইসলামে মুক্তি বলতে নেতিবাচক দিক থেকে ঃ মরণোত্তর জীবনে জাহান্নামের বেদনাক্লিষ্ট আযাব থেকে মুক্তি এবং ইতিবাচক দিক থেকে ঃ জান্নাতের অফুরন্ত সুখ-শান্তি উপভোগকে বুঝায় । অবশ্য ইসলামী মরমীরা আল্লাহর সাথে মিলনকে জীবনের পরম লক্ষ বলে মনে করেন । তবে ইসলামী মরমীরা যেমন জান্নাত-জাহান্নামকে অস্বীকার করে না, তেমনি গোঁড়া মুসলিমেরাও আল্লাহর মিলনকে অস্বীকার করে না । ইসলাম ধর্মও মনে করে যে, পরমাত্মা বা আল্লাহর নিকট থেকে মানবাত্মা এসেছে । এ মানবাত্মা আবার আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে । কঠোর সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ বা আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব । হিন্দুধর্মের ন্যায় ইসলাম ধর্মও মনে করে যে, এ মিলনে আত্মা স্বাতন্ত্র্য হারায় না । আত্মা সসীমতার উর্ধ্বে উঠে অসীমের গুণাবলী

Dhaka University Institutional Repository

অর্জন করে মাত্র । এ মিলনে সসীমের প্রেম ও সাধনার বিজয় ঘটে । এতে সসীমের সাধনা, ত্যাগ ও প্রেমের নিকট অসীম ধরা দেয় । অসীম স্বীয় গুণে সসীমকে আপন করে নেয় ।[৪৭] এখানে আরেকটি বিষয়ে হিন্দুধর্মের সাথে ইসলামী সূফীবাদের সাদৃশ্য রয়েছে । আর তা হচ্ছে, হিন্দু ধর্ম যেমন মনে করে ইহ-জীবনে ব্রহ্ম লাভ সম্ভব তেমনি সূফীবাদও মনে করে যে, ইহ-জীবনে আল্লাহর সত্তায় স্থিতি লাভ সম্ভব । সম্ভব আল্লাহর গুণাবলী অর্জন করা, আল্লাহময় হওয়া । দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনসুর হাল্লাজ, বায়েজীদ বোস্তামী, আবু বকর শিবলী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায় । এঁদের জীবনাচরণে ও জীবনাদর্শে আল্লাহভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ।

৭। এক নজরে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন ঃ

নিম্নের ছকে মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলামী বিশ্বাস ও ধারণাসমূহের তুলনা দেখানো হলো ঃ

হিন্দুধর্মে মরণোত্তর জীবন	ইসলামে মরণোত্তর জীবন
(১) পার্থিব জীবন মরণোত্তর জীবনের ভিত্তি বা প্রস্তুতি কাল ।	(১) পার্থিব জীবন মরণোত্তর জীবনের ভিত্তি বা প্রস্তুতি কাল ।
(২) পার্থিব জগৎ ও জীবন পরিবর্তনশীল ।	(২) পার্থিব জগৎ ও জীবন পরিবর্তনশীল ।
(৩) পার্থিব জগৎ নির্ধারিত সময়কাল পর ধ্বংস হবে । নির্দিষ্ট বিরতির পর আবার সৃষ্টি হবে । লয়, প্রলয়, মহাপ্রলয় ও সৃষ্টি চক্রাকারে চলতে থাকবে ।	(৩) পার্থিব জগৎ ধ্বংসের পর নতুন করে আর পার্থিব জগৎ সৃষ্টি করা হবে না ।
(৪) মানবাত্মাসহ পার্থিব সব কিছুর উৎস পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ।	(৪) মানবাত্মাসহ পার্থিব সব কিছুর উৎস পরমাত্মা বা আল্লাহ ।
(৫) আত্মা অমর	(৫) আত্মা অমর
(৬) পার্থিব কর্মের উপর মরণোত্তর জীবনে আত্মার পরিণতি ঘটে ।	(৬) পার্থিব কর্মের উপর মরণোত্তর জীবনে আত্মার পরিণতি ঘটে ।
(৭) ব্রহ্মের দয়ায় মোক্ষ অর্জন বা নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব হয় ।	(৭) আল্লাহর দয়ায় জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত প্রাপ্তি সম্ভব হয় ।
(৮) হিন্দুধর্মে কবর জগতের কোন ধারণা নেই ।	(৮) কবরে নির্দিষ্ট কাল থাকতে হয় । এবং সেখানে সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয় ।
(৯) মোক্ষ অর্জিত হলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না ।	(৯) পুনর্জন্মের কোন ধারণা ইসলামে নেই ।
(১০) মোক্ষ অর্জিত না হলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়।	(১০) কবর জগতে নির্দিষ্ট কাল থাকার পর প্রত্যেককে বিচারের মাঠে পুনরুত্থিত হতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

(১১) স্বর্গ বা নরক ভোগের পূর্বে বিচারেব ব্যবস্থা আছে। 'যম' যমপুরীতে বিচারের পর আত্মাকে স্বর্গে বা নরকে প্রেরণ করেন।	(১১) আল্লাহ মানুষের পার্থিব কর্মের ভিত্তিতে বিচার করে মানুষকে স্বর্গে বা নরকে প্রেরণ করেন।
(১২) স্বর্গ ও নরক বাস ক্ষণস্থায়ী। স্বর্গ ও নবক ভোগ শেষে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয়।	(১২) স্বর্গ-বাস চিরস্থায়ী। নরক-বাস কারো জন্য ক্ষণস্থায়ী আবার কারো জন্য চিরস্থায়ী। অনেকে পাপের শাস্তি ভোগ শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
(১৩) মুক্তি প্রাপ্ত আত্মা ব্রহ্মের সাথে মিলিত হয়।	(১৩) মুক্তি প্রাপ্ত আত্মা আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। আল্লাহর দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করে।
(১৪) ব্রহ্মেব সাথে মিলিত হয়ে আত্মা পরমানন্দ লাভ করে। ব্রহ্মের গুণে গুণান্বিত হয়।	(১৪) আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে, দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করে মানুষ পরমানন্দ ও পরমতৃপ্তি উপভোগ করে, অসীমের গুণে গুণান্বিত হয়।
(১৫) ব্রহ্মের সাথে একীভূত হয়েও আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে।	(১৫) আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে বা একীভূত হয়েও মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১। *ঋগবেদ সংহিতা*, ১০/৪, *প্রশ্ন উপনিষদ* ১/৪, *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ২/৬/৩, *গীতা*, ৭/৪/৫।

২। *আল-কুরআন*, ২ঃ২৯, ২ঃ১১৭, ৭ঃ৫৪, ২৫ঃ৫৯।

৩। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*, ২/৮/৯/৬।

৪। *ঋগবেদ সংহিতা*, ১০/১২৯।

৫। *আল কুরআন*, ২ঃ১১৭, ৬ঃ৭৩, ১৬ঃ৪০, ৩৬ঃ৮২ প্রভৃতি।

৬। ঐ, ৫১ঃ৪৭।

৭। Benjamin Walker, *Hindu World, An Encyclopedic Survey of Hinduism*, vol. 1, London, 1968, p. 8.

৮। Thilly, F., *A History of Philosophy*, (3rd ed.) New York, 1957, p. 499.

৯। *গীতা*, ৯/৯।

১০। *আল-কুরআন*, ৩০ঃ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

১১। ঐ, ২ঃ১৫৫, অনুবাদ, মুহাম্মদ শাফী, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, বঙ্গানুবাদ, মুহিউদ্দীন খান, সৌদি আরব ঃ বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী ।

১২। ঐ, ২২ঃ১১, অনুবাদ, ঐ ।

১৩। *গীতা*, ২/২৭ ।

১৪। *আল-কুরআন*, ৪ঃ৭৮, অনুবাদ, মুহাম্মদ শাফী, প্রাগুক্ত ।

১৫। ডেভিড হিউম, *মানব প্রকৃতির ধরূপ অন্বেষা*, অনুবাদ, আবু তাহা হাফিজুর রহমান, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃঃ ২০৩ ।

১৬। Matin, A., *An Outline of Philosophy*, Dhaka : Mullick Brothers, 1968, pp. 230-31.

১৭। Ryle, G., *The Concept of Mind*, London : Hutchinson & Co. Ltd., p. 151.

১৮। Ayer, A.J., *The Problem of Knowledge*, London : Mcmillan & Co. Ltd., 1956, p. 189.

১৯। আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, পৃঃ ২১৭ ।

২০। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*, ৪/৩ ।

২১। *আল-কুরআন*, ১৭ঃ৮৫ ।

২২। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৭-১৮ ।

২৩। Matin, A., op. cit., p. 264.

২৪। Russel, B., *Religion and Science*, New York, 1961, pp. 141-142.

২৫। *কঠোপনিষদ*, ১/২/১৮ ।

২৬। *গীতা* ২/২৩-২৪, অনুবাদ, শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, ষষ্ঠবিংশতিতম সংস্করণ, কলকাতা ঃ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৯৯৬ ।

২৭। *আল-কুরআন* ৩৯ঃ৪২, অনুবাদ, মুহাম্মদ শাফী, প্রগুক্ত ।

২৮। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৫/১০/১-৬ ।

২৯। *গীতা*, ৮/১৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। *আল-কুরআন*, ৮৩ঃ৭-৯, ১৮-২১ ।

৩১। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৪/৪/৩-৪ ।

৩২। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৫/১০/৭, *কৌষিতকী* উপনিষদ, ১/২ ।

৩৩। *আল-কুরআন*, ১৪ঃ৪৮ ।

৩৪। ঐ, ২ঃ১৫৬ ।

৩৫। ঐ, ২০ঃ৫৫ ।

৩৬। দ্রষ্টব্য ঃ *আল-কুরআন*, ৫০ঃ৩-৪ ; ১৭ঃ৯৭, ৯৯ ; ২ঃ২৫৯ ইত্যাদি ।

৩৭। *আল-কুরআন*, ৩৬ঃ৫৪ ।

৩৮। Azizun Nahar Islam, *The Nature of Self, Suffering and Salvation*, Allahabad : Vohra Publishers, 1987, p. 147.

৩৯। *আল-কুরআন*, ৫৬ঃ১৫-২৫, অনুবাদ, প্রাগুক্ত ।

৪০। ঐ, ১৯ঃ৬১ ।

৪১। ঐ, ৭৮ঃ২৩ ।

৪২। *গীতা*, ৯/২১ ।

৪৩। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৫/১০/৩-৬, *গীতা* ৮/২৫ ।

৪৪। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ৩/৬/১ ।

৪৫। *আল-কুরআন*, ১১২ঃ১-৪ ।

৪৬। *মুণ্ডক উপনিষদ*, ৩/২/৮, *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ২/৪/১২ ।

৪৭। Iqbal, M., *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (5th ed.), India : New Delhi ; Kitab Bhavan, 1994. p. 110.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার ঃ হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন ; এর প্রায়োগিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার ঃ হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবন ; এর প্রায়োগিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস ও মতবাদ আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে উভয় ধর্মের তুলনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উভয় ধর্ম প্রসঙ্গে কেবল তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। অনুশীলন, সাধনা তথা ব্যবহারিক বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব প্রভৃতিতে ধর্মসমূহের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মৌলিক শিক্ষায় তারা কম বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। মরণোত্তর জীবন প্রসঙ্গে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সাদৃশ্যপূর্ণ ঃ (১) উভয় ধর্ম আত্মার ঐশী উৎসে বিশ্বাস করে। (২) উভয় ধর্ম দেহ ও আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে (৩) উভয় ধর্ম মতে আত্মা অমর (৪) উভয় ধর্ম পার্থিব জীবনকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। (৫) উভয় ধর্ম মতে পার্থিব জীবনেই মানুষের পূর্ণতা অর্জন সম্ভব (৬) উভয় ধর্ম এক ঈশ্বর ও জগতের একক উৎসে বিশ্বাস করে। (৭) উভয় ধর্ম কর্মের নীতিতে বিশ্বাস করে। (৮) উভয় ধর্ম মরণোত্তর জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা উপভোগে বিশ্বাস করে। (৯) উভয় ধর্ম মরণোত্তর জীবনে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়ে পরমানন্দ লাভে বিশ্বাস করে।

(১) মানুষ কেবল ভৌত উপাদানে গঠিত নয়। মানুষের মধ্যে দেহাতিরিক্ত একটি সত্তা রয়েছে। এ সত্তা দেহের উপর কর্তৃত্ব করে। দেহকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এ সত্তাকে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে 'আত্মা' বলে অভিহিত করা হয়। আত্মা কোন মিশ্র উপাদানে সৃষ্ট নয়। আত্মা ঐশী উৎস তথা পরমাত্মা — ব্রহ্ম বা আল্লাহ — থেকে আসে। হিন্দুধর্মে মনে করা হয় যে, আত্মা হচ্ছে ব্রহ্মের অংশ।[১] আর ইসলাম ধর্মে মনে করা হয় যে, আত্মা আল্লাহর নির্দেশ।[২] অতএব, হিন্দু ও ইসলাম উভয় মতে মানবাত্মার উৎস হচ্ছে ঐশী সত্তা বা পরমাত্মা। আবার পরম পরিণতিতে আত্মা এ ঐশী উৎসের নিকট ফিরে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

(২) দেহ ও আত্মা স্বতন্ত্র গুণ বিশিষ্ট। দেহ মাটি, বায়ু, পানি, অগ্নি প্রভৃতি উপাদান দ্বারা সৃষ্ট। আর আত্মা সরল, অবিচ্ছেদ্য, অমিশ্র ও আধ্যাত্মিক দ্রব্য। দেহ ও আত্মার এ পার্থক্য হিন্দু ও ইসলাম, উভয় ধর্ম স্বীকার করে। এ পার্থক্য স্বীকারের মাধ্যমে উভয় ধর্ম মানুষের বৈষয়িক এবং মানসিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের স্বীকৃতি দেয়। মানুষ কেবল দেহ সর্বস্ব নয়, আবার কেবল আত্মা সর্বস্বও নয়। মানুষ দেহ ও আত্মা উভয়ের সমন্বয়। বোধ হয়, দেহ ও আত্মার পার্থক্য ও প্রয়োজন স্বীকারের মাধ্যমে মানব প্রকৃতিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে এ উপলব্ধির প্রয়াস রয়েছে।

(৩) দেহ মিশ্র উপাদানে সৃষ্ট। মৃত্যুতে এ মিশ্র উপাদান বিচ্ছিন্ন হয়ে দেহ ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু আত্মা সরল ও অমিশ্র। আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কিছু নেই। তাই আত্মা কখনো ধ্বংস হয় না। মৃত্যুর পরও আত্মা অমর থাকে। হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মই বিশ্বাস করে যে, আত্মা অমর থেকে মৃত্যু পরবর্তী বিভিন্ন অবস্থা মোকাবিলা করে। রবীন্দ্রনাথ অমর, শেক্সপিয়ার অমর ইত্যাদি বলতে যে অমরত্ব বুঝায় হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে অমরত্বের ব্যঞ্জনা তার থেকে ভিন্ন। প্রথমোক্ত অমরত্ব বলতে রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়ারকে মানুষের স্মৃতিতে ভাস্বর বুঝায়। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের অবদানকে মানুষ স্মরণ করে, ভক্তি করে, তাঁদের দ্বারা মানুষ অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু এতে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের আত্মার কোন অংশ গ্রহণ নেই। শেষোক্ত অমরত্ব মানুষের স্মৃতি ও শ্রদ্ধা ভক্তির অমরত্ব নয়। এ অমরত্ব হচ্ছে মৃত্যুর পর ব্যক্তি আত্মার বিভিন্ন অবস্থা তথা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, শাস্তি বা শাস্তি উপভোগের জন্য বেঁচে থাকা। হিন্দুধর্ম অনুসারে আত্মা অমর থেকে মৃত্যুর পর পূর্ব-জীবনের কর্ম অনুসারে নতুন দেহ গ্রহণ করে পূর্ব-জীবনের কর্মের ফল ভোগ করে অথবা ব্রহ্মে গিয়ে মিলিত হয়। পক্ষান্তরে, ইসলাম ধর্ম অনুসারে আত্মা অমর থেকে পূর্বের দেহে পুনরুত্থিত হয়ে জান্নাত বা জাহান্নামের সুখ বা দুঃখ ভোগ করে।

(৪) পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। একদিন এ পার্থিব জগৎ মানুষকে ত্যাগ করতেই হবে। এ ত্যাগ তার জন্য অনিবার্য। মৃত্যু তাকে এ জগতের মায়া ও সৌন্দর্য, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বিত্ত-বৈভব ত্যাগ করতে বাধ্য করে। মানুষ চায় শান্তি। এ জগতে শান্তি নেই। এ জগৎ ও জীবন দুঃখ, দুর্দশা, হতাশা, পেরেশানি প্রভৃতিতে পূর্ণ। কোন না কোন অপূর্ণতা মানবের জীবনে লেগেই থাকে। দাস-দাসী, অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা-ঐশর্য প্রভৃতির মধ্যে থেকেও মানব তার জীবনে পরম তৃপ্তি পায় না। সীমাবদ্ধতা তাকে ঘিরেই থাকে। তাই সে চায় এমন জীবন যে জীবনে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, কোন পেরেশানি নেই, আছে কেবল শান্তি ও আনন্দ। ধর্ম এমন জীবন মানুষের সামনে উপস্থাপন করে।

Dhaka University Institutional Repository

এমন জীবন হচ্ছে পরকাল বা মরণোত্তর জীবন। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে, মানুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করলে ব্রহ্মের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। ব্রহ্মের সাথে মিলিত হয়ে সে ব্রহ্মের গুণে গুণান্বিত হয়, নিজেকে মহান মর্যাদায় উন্নীত করে।[৩] কিন্তু মোক্ষ অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা করতে হয়। সাধনার স্থান হচ্ছে এ পার্থিব জগৎ ও জীবন। পার্থিব জীবন মানুষের লক্ষ নয়।লক্ষ হচ্ছে মরণোত্তর জীবনে ব্রহ্মের সাথে মিলিত হয়ে পরমানন্দ অর্জন করা। এ লক্ষে উপনীত হওয়ার জন্য হিন্দু ধর্ম পার্থিব জীবনকে উপায় বা প্রস্তুতির ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করে। অনুরূপ, ইসলাম ধর্মও মনে করে যে, এ পার্থিব জীবন প্রকৃত জীবন নয়। প্রকৃত জীবন হচ্ছে 'হায়াতুল আখিরাহ' বা মরণোত্তর জীবন। মরণোত্তর জীবনে মানুষের জন্য রয়েছে জান্নাতের অফুরন্ত ও পরম সুখ অথবা জাহান্নামের সীমাহীন শাস্তি ও দুঃখ-কষ্ট। মানুষ চায় মরণোত্তর জীবনে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের পরম শান্তি উপভোগ করতে। জান্নাতে মানুষের জন্য রয়েছে সুস্বাদু আহার্য ও পানীয়। সেখানে মানুষ পরম বিলাসিতা ও প্রাচুর্যে দিনাতিপাত করবে।[৪] কিন্তু অনায়াসে জান্নাত লাভ করা যায় না। এ জন্য মানুষকে কঠোর সাধনা করতে হয়। সংযত ও শৃঙ্খলিত উপায় জীবন যাপন করতে হয়। কুরআন ও মুহাম্মদ (সঃ) এর সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে হয়। আর এ সাধনা করতে হয় পার্থিব জীবনে। মরণোত্তর জীবনে সাধনার কোন অবকাশ নেই। পার্থিব জীবনেই মানুষকে জান্নাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তাই পার্থিব জীবন মানুষের লক্ষ নয়, লক্ষ লাভের উপায় মাত্র। সুতরাং হিন্দু ও ইসলাম, উভয় ধর্ম পার্থিব জীবনকে লক্ষ অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।

(৫) মানুষের নানাবিধ অপূর্ণতা রয়েছে। মানুষের মধ্যে রয়েছে হিংসা-বিদ্বেষ,লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, পরশ্রীকাতরতা, অর্থ-লিপ্সা, যশ-খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের প্রতিযোগিতাসহ অসংখ্য অসৎ ও মানবতা বিধ্বংসী গুণাবলী। এ সব রিপু ব্যক্তি জীবনকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে, নানা পেরেশানিতে নিমজ্জিত রাখে তেমনি সমাজ জীবনকেও কলুষিত করে, সমাজে হানাহানি, রক্তারক্তি ও সন্ত্রাস ছড়ায়, সামাজিক জীবনকে নিরাপত্তাহীন করে তোলে। ধর্ম চায় মানুষকে এ সব রিপু থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে। সম্ভবত এটা সব ধর্মের মধ্যে মৌলিক ও প্রধান সাদৃশ্য। কোন পরম সত্তা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই এমন ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু আত্মার পবিত্রতা অর্জন বা মানুষকে অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখার প্রয়াস পায় না এমন ধর্ম পাওয়া যাবেনা। হিন্দু ও ইসলাম আত্মার পবিত্রতা অর্জনকে মুক্তি লাভের প্রধান শর্ত বলে মনে করে। হিন্দু ধর্ম অনুসারে, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ফলাকাঙ্খা,

Dhaka University Institutional Repository

মোহ-আসক্তি ইত্যাদি পরিত্যাগ করে মানুষ যখন নিষ্কাম কর্ম করতে সক্ষম হয়, তখন সে মোক্ষ অর্জন করে। ইসলাম ধর্ম অনুসারেও লোভ, মোহ, হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে আত্মার পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। আত্মার পবিত্রতা অর্জনের মধ্যেই মুক্তি নিহিত। কুরআন বলে ঃ ''যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নিষ্কলঙ্ক আত্মা নিয়ে আসবে সে ব্যতীত অপর কেউ মুক্তি পাবে না।''(২৬ঃ৮৯) তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম মুক্তি অর্জনের জন্য আত্মার পবিত্রতা অর্জনকে আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করে। আর এ পবিত্রতা পার্থিব জীবনেই অর্জন করতে হয়।

(৬) বাহ্যতঃ হিন্দু ধর্ম বহু ঈশ্বরবাদী বলে মনে হয়। সাধারণ হিন্দুরা অসংখ্য দেব-দেবী যেমন ঃ ইন্দ্র, বিষ্ণু, গণেশ, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির পূজা-অর্চনা করে থাকে। এ সব দেব-দেবী ও শক্তির পশ্চাতে এক পরম সত্তা রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে এ সত্তাকে প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা এবং উপনিষদে ব্রহ্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রজাপতি/বিশ্বকর্মা সর্বোচ্চ সত্তা। প্রজাপতি বা বিশ্বকর্মা সকল সত্তার স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা। প্রজাপতি বা বিশ্বকর্মা নিজে অসৃষ্ট কিন্তু সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা।[৫] উপনিষদ মতে, সকল প্রকাশ, উদ্ভব বা অস্তিত্বের একক আধ্যাত্মিক উৎস রয়েছে। আর তা হচ্ছে ব্রহ্ম।[৬] ইসলাম ধর্মও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়।[৭] তিনি এ জগতের সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন।[৮] অর্থাৎ আল্লাহ জগতের সব কিছুর উৎস। সুতরাং হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম অনুসারে এক পরমাত্মা এ জগতের উৎস।

(৭) হিন্দু বা ইসলাম ধর্ম ভাবপ্রবণ বা অনুধ্যানমূলক নয়। বরং উভয় ধর্ম অনুসারে কর্ম হচ্ছে মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্ম মানুষের ভবিষ্যৎ শুভ-অশুভ নির্ধারণ করে। হিন্দু ধর্ম অনুসারে কর্মই মানুষকে মুক্তি দেয় অথবা দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে। মানুষ কামনা-বাসনা, লোভ-মোহ ত্যাগ করে যদি নিষ্কাম কর্ম করতে সক্ষম হয়, তাহলে মুক্তি লাভ করে। যদি নিষ্কাম কর্ম করতে সক্ষম না হয় তাহলে তাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে কর্ম-ফল ভোগ করতে হয়। অনুরূপ ইসলাম ধর্মও মনে করে যে, মানুষের পরকালীন সুখ-দুঃখ তার ইহকালীন কর্মের উপর নির্ভর করে। পার্থিব জীবনে যে সৎকর্ম করবে মরণোত্তর জীবনে সে জান্নাতের অফুরন্ত সুখ-শান্তি ভোগ করবে, (অবশ্য ইসলাম ধর্ম সৎ কর্মের সাথে ঈমানকে অপরিহার্য মনে করে।) আর যে অসৎ কর্ম করবে সে মরণোত্তর জীবনে জাহান্নামের বেদনাক্লিষ্ট শাস্তি ভোগ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম অনুসারে মানুষ পার্থিব জীবনে নিয়মনিষ্ঠ, সংযত ও শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করে পরকালীন সুখ-ভোগের জন্য । সে ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে, কামনা-বাসনা বিসর্জন দেয় মরণোত্তর জীবনে স্থায়ী ও পরম তৃপ্তি লাভের জন্য । হিন্দু ও ইসলাম, উভয় ধর্ম মনে করে মানুষ মরণোত্তর জীবনে সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে । হিন্দু ধর্ম অনুসারে মানুষ চেষ্টা সাধনা ও কর্মের দ্বারা যদি মোক্ষ অর্জন করতে না পারে তাহলে সে মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে । আর মোক্ষ অর্জন করতে পারলে মৃত্যুর পর ব্রহ্মের সাথে মিলিত হয়ে পরমানন্দ ও পরম তৃপ্তি উপভোগ করে । ইসলাম ধর্ম অনুসারেও মানুষ মৃত্যুর পর কবরে সুখ বা দুঃখ উপভোগ করে এবং পুনরুত্থানের পর আল্লাহর বিচার অনুযায়ী জান্নাতের অফুরন্ত শান্তি অথবা জাহান্নামের বেদনাক্লিষ্ট আযাবে নিপতিত হবে ।

(৯) হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্ম বিশ্বাস করে যে, মোক্ষ প্রাপ্ত ও পবিত্র আত্মা মৃত্যুর পর পরমাত্মার সাথে মিলিত হবে । হিন্দু ধর্ম মনে করে যে, মোক্ষ লাভের পর মৃত্যু হলে আত্মা ব্রহ্মের সাথে গিয়ে মিলিত হয় । ব্রহ্ম থেকে এ আত্মার কখনো আর বিচ্যুতি ঘটে না । এ অবস্থায় আত্মা অসীমত্ব অর্জন করে এবং ব্রহ্মের গুণে গুণান্বিত হয় । অনুরূপ মুসলিম মরমীরা মনে করে যে, পার্থিব জীবনে যদি আত্মার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তাহলে মৃত্যুর পর আত্মা আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে অসীমতা উপলব্ধি করে । মুসলিম মরমীদের মতে, জান্নাত অর্জন নয়, বরং আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া মানব জীবনের পরম লক্ষ । হিন্দু ও মুসলিম মরমীরা এও মনে করে যে, পার্থিব জীবনেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া বা আল্লাহময় হওয়া সম্ভব ।

মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে অনেকগুলো বিষয়ে পার্থক্যও রয়েছে । হিন্দু ধর্ম যেখানে ক্ষণস্থায়ী স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করে (অবশ্য বেদে স্থায়ী স্বর্গ-নরকের ধারণা রয়েছে) ইসলাম ধর্ম সেখানে চিরস্থায়ী স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করে । হিন্দু ধর্ম অনুসারে পুণ্য-কর্ম ক্ষয়ের জন্য আত্মা স্বর্গে গমন করে । পুণ্যকর্ম ক্ষয় হলে আত্মা আবার মর্তে ফিরে আসে । আত্মা পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে এবং নতুন দেহ ধারণ করে । অনুরূপ পাপাত্মা নরকে গমন করে এবং সেখানে কষ্ট ভোগের পর মর্তে ফিরে আসে এবং নতুন দেহ ধারণ করে । কিন্তু ইসলাম অনুসারে যে ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে সেখান থেকে তার আর বিচ্যুতি ঘটে না । সেখানে সে অনন্ত কাল অতিবাহিত করে । আর যে ব্যক্তি নরকে বা দোযখে গমন করে সেখানে সে তার পার্থিব কৃতকর্মের শাস্তি ভোগের পর পুণ্য কর্মের ফল ভোগের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করে । সেখান থেকে তার আর প্রত্যাবর্তন ঘটে না । তবে যাদের এতটুকু ঈমান ও পুণ্য কর্ম নেই তারা

Dhaka University Institutional Repository

অনন্ত কাল দোযখে অবস্থান করে এবং শাস্তি ভোগ করতে থাকে । আরেকটি বিষয়ে এখানে হিন্দু ধর্মের সাথে ইসলামের পার্থক্য রয়েছে । হিন্দু ধর্ম অনুসারে স্বর্গে ও নরকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে কেবল আত্মা । এখানে স্থূল দেহের কোন সংশ্লিষ্টতা থাকে না । স্থূল দেহ মৃত্যুর পর নষ্ট হয়ে যায় । কিন্তু ইসলাম অনুসারে বিচার দিবসে মানুষের দৈহিক পুনরুত্থান ঘটে । বেহেশত ও দোযখে আত্মা পার্থিব জীবনের দেহে সুখ-সম্ভোগ বা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে ।

মরণোত্তর জীবন ; এর প্রায়োগিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ঃ

প্রায় সকল ধর্মের লক্ষ হচ্ছে মরণোত্তর জীবন । অধিকাংশ ধর্ম মরণোত্তর জীবনে ঈশ্বর কর্তৃক বিচারের সম্মুখীন হওয়া এবং সুখ বা দুঃখ ভোগে বিশ্বাস করে । অধিকাংশ ধর্মে মরণোত্তর জীবনে স্বর্গ ও নরক ভোগে বিশ্বাস রয়েছে। এ সব ধর্মের লক্ষ মরণোত্তর জীবন হলেও এরা পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করে না । মরণোত্তর জীবনে দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে সুখ-শান্তি প্রাপ্তির জন্য পার্থিব জীবনেই চেষ্টা-সাধনা, অনুশীলন ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হয় । তাই ধার্মিকের নিকট পার্থিব জগৎ ও জীবন তাৎপর্যবহ । হীনযান বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম মরণোত্তর জীবনে স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করে না । তা সত্ত্বেও এসব ধর্ম পার্থিব জীবনে সাধনা, অনুশীলন, আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়ম-নীতি পালন করে থাকে । ধর্মের এ বিশ্বাস, অনুশীলন ও সাধনার মধ্যে রয়েছে প্রায়োগিকতা, নৈতিকতা ও মানবতাবাদ । মরণোত্তর জীবন প্রসঙ্গে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সাদৃশ্যের বিষয়সমূহ উপরে আলোচনা করা হয়েছে । সে সব বিষয়ের মধ্যে প্রায়োগিকতা, নৈতিকতা, মানবতা এবং আধ্যাত্মিকতার নিম্নোক্ত দিকসমূহ রয়েছে ।

১। হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম আত্মার ঐশী উৎসে বিশ্বাস করায় মানুষের মধ্যে একটা ঐক্যের মনোভাব সৃষ্টি করে । প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আত্মা রয়েছে আর এ আত্মার স্বভাব-প্রকৃতি হচ্ছে আধ্যাত্মিক । ঐশী উৎসের দিক থেকে আমার মধ্যে যে গুণ রয়েছে অন্যের মধ্যেও সে গুণ রয়েছে । এতএব, নিজেকে বড় ভেবে অহংকার করার আর অন্যকে ছোট ভেবে হেয় করার কোন অবকাশ নেই । সকল মানুষের উৎস এক । সকল মানুষের আত্মা আধ্যাত্মিক । সুতরাং মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই । কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ, ধনী-গরীব প্রভৃতিতে ভেদ করা অবাঞ্ছনীয় । অনুরূপ উচ্চ বর্ণ নিম্নবর্ণের পার্থক্য করাও অবাঞ্ছনীয় । উচ্চবর্ণের ব্যক্তি যে উৎস থেকে এসেছে নিম্নবর্ণের ব্যক্তিও সে একই উৎস থেকে এসেছে । উচ্চবর্ণের ব্যক্তি সাধনায় সার্থক হতে পারে আবার ব্যর্থও

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারে। তাই একে অপরের মধ্যে ভেদাভেদ করা নির্বুদ্ধিতা ও নিজেদের উৎস ও স্বভাব থেকে উদাসীন থাকা।

(২) কেবল মানুষ নয়, জগতের সকল বস্তুর স্রষ্টা হচ্ছে পরমাত্মা। পরমাত্মা তথা ব্রহ্ম বা আল্লাহর সৃষ্ট জীব হিসেবে মানুষ অন্য জীবের প্রতিও সহানুভূতি অনুভব করে। শিক্ষা, ক্ষমতা, ধন ও সৌন্দর্যে যে নিম্নতর তাকে যেমন মানুষ ছোট করে দেখতে পারে না ঠিক তেমনি মানবেতর প্রাণীর প্রতিও সে নির্মম হতে পারে না। কারণ এ মানবেতর প্রাণীগুলোও তার সৃষ্টার সৃষ্টি। যদিও হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস রয়েছে যে, মানুষ তার পূর্ব-জীবনের কর্ম অনুসারে জন্ম গ্রহণ করে, মানবেতর প্রাণীরা হয়তো পূর্ব-জীবনের কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছে, তা সত্ত্বেও এ সব প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর-নির্মম ব্যবহারের অবকাশ নেই। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে ব্রহ্ম অসন্তুষ্ট হন। যে মানবেতর প্রাণীর সেবা করে সে যেন ব্রহ্মেরই সেবা করে। যেমন বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তি — ''জীবে প্রেম করে যে জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'' ইসলাম ধর্মও বিনা প্রয়োজনে গাছের একটি পাতা ছিঁড়তেও নিষেধ করে। আল্লাহর সৃষ্ট জীব হিসেবে প্রতিটা জীবে মুসলিম সহমর্মিতা উপলব্ধি করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একক ঐশী উৎসে বিশ্বাস, স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী ও প্রেমের উপলব্ধি সৃষ্টি করে এবং মানবেতর প্রাণীর প্রতিও সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সেবার উপলব্ধি সৃষ্টি করে। বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে একদল নীতিদার্শনিক মানবেতর প্রাণীর মুক্তি আন্দোলন শুরু করেছেন। এঁদের শীর্ষে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার। জনাব সিঙ্গার তাঁর *Animal Liberation* (১৯৭৫), *Practical Ethics* (১৯৭৯) প্রভৃতি গ্রন্থে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন যে, নির্বিচারে মানবেতর প্রাণী হত্যা, তাদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে দেয়া, যন্ত্রণাদায়ক পরীক্ষণে ব্যবহার করা প্রভৃতি অযৌক্তিক ও অনৈতিক। তিনি ও এ মতের সমর্থকেরা যুক্তি, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের সাহায্যে মানবেতর প্রাণীর স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। আর ধর্ম প্রাচীন কাল থেকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সাহায্যে মানবেতর প্রাণীর স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস পেয়ে আসছে।

(৩) হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম দেহ ও মনের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে। এ স্বীকৃতির মধ্যে মানব প্রকৃতিকে যথার্থভাবে উপলব্ধির প্রয়াস রয়েছে। জড়বাদীদের ন্যায় কেবল দেহের স্বীকৃতির মাধ্যমে আবার অধ্যাত্মবাদীদের ন্যায় কেবল আত্মার স্বীকৃতির মাধ্যমে মানব প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানব জীবনে অন্ন-বস্ত্র ভিটামিনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনকে যেমন অস্বীকার করা যায় না । তেমনি সত্য সুন্দর, কল্যাণ ও আদর্শের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করা যায় না । দেহ ও আত্মার স্বাতন্ত্র্য স্বীকারের মাধ্যমে বস্তুবাদী বিজ্ঞানের সচল শক্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রেমশক্তির সম্মিলন ঘটে ।[৯] এ সম্মিলনে মানব জীবন সার্থক হয়ে ওঠে । বস্তুবাদী বিজ্ঞান মানুষের দৈহিক চাহিদা পূরণ করে আর অধ্যাত্মবাদ আত্মিক চাহিদা পূরণ করে । ডঃ জি সি দেব তাঁর সমন্বয়ী ভাববাদে বস্তুবাদী বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের সমঝোতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন । তিনি তাঁর বিখ্যাত *Idealism and Progress* (১৯৫২), *Aspiration of the Common Man* (১৯৬৩) প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞান আমাদেরকে প্রাণচাঞ্চল্য, কর্মমুখরতা, বিষয়নিষ্ঠতা দান করে, করে বাস্তবমুখী । সভ্যতাকে উন্নততর স্তরে পৌছায় । এর নির্ভরতামুক্ত ব্যক্তি-জীবন, সমাজ এবং রাষ্ট্রকাঠামো চিন্তা করা যায় না । অপরদিকে আদর্শ, মূল্যবোধ, প্রেমবোধ, লোভ-লালসা ও ধনাসক্তিমুক্ত এবং সংযত জীবনের জন্য অধ্যাত্মবাদ বা ধর্মের প্রয়োজন । তাই ইন্দ্রিয়ের যেমন প্রয়োজন তেমন প্রয়োজন স্বজ্ঞার । প্রয়োজন শক্তির সাথে প্রেমের,বাস্তবের সাথে আদর্শের, বিষয়নিষ্ঠতার সাথে মুল্যবোধের, কর্মের সাথে নিষ্কামের, মোহের সাথে পরার্থপরতার, সম্পদের সাথে বৈরাগ্যের সমন্বয় সাধন । এক কথায় ''জড়বস্তুতে আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধির যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি আত্মার জন্যও জড়বস্তুর প্রয়োজন রয়েছে ।''[১০] হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম এ সমন্বয়ের চেষ্টা করে । উভয় ধর্ম দেহ ও আত্মা, বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে মানব প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে ।

(৪) হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাস মানুষকে নৈতিক জীবনাচরণে উদ্বুদ্ধ করে । উভয় ধর্মই বিশ্বাস করে মরণোত্তর জীবনে মানুষের জন্য সুখ-শান্তি বা দুঃখ-কষ্ট রয়েছে । মানুষ তার কর্মের দ্বারা দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করে সুখ-শান্তি অর্জন করতে পারে । এ জন্য মানুষকে পার্থিব জীবনে নৈতিক কর্ম সাধন করতে হয় । এ নৈতিকতার উৎস হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ, নবী-পয়গম্বর, মুনি-ঋষি ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা । মানুষ ইহজীবনে নৈতিকতা অবলম্বন করবে এ কারণে যে, এর বিনিময়ে সে মরণোত্তর জীবনে সুখ-শান্তিতে অনন্ত কাল অতিবাহিত করবে । আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস রয়েছে যে, মানুষ যদি চরম নৈতিক উৎকর্ষ অর্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে মরণোত্তর জীবনে ব্রহ্মের সাথে মিলিত হয়ে পরমানন্দ লাভ করবে । আর যদি সে চরম নৈতিক উৎকর্ষ অর্জন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করে জাগতিক দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করবে । ইসলাম ধর্ম অনুসারেও যারা অসৎ কর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও শাস্তি ভোগের আবাস জাহান্নাম, আর যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত সুখ-শান্তি উপভোগের আবাস জান্নাত ।[১১] মানুষের নৈতিক কর্মের উপরই মরণোত্তর জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভর করে । তাই হিন্দু ও ইসলাম, উভয় ধর্মে মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাস মানুষকে নৈতিক কর্মে পরিচালিত করে ।

(৫) ধর্ম চায় মানুষকে পূর্ণ মানবে পরিণত করতে । নিষ্কলুষ ও পবিত্র মানুষ তৈরী করাই হচ্ছে ধর্মের কাজ । মানুষের অন্তরাত্মা থেকে সকল অসৎ গুণাবলীকে ধর্ম দূরীভূত করার প্রয়াস পায় । হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ, অত্যাচার-অনাচার প্রভৃতিকে ধর্ম সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা করে । এ প্রসঙ্গে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । হিন্দুধর্ম এর প্রতি এতই গুরুত্ব দেয় যে, যতদিন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা থাকে, ততদিন পর্যন্ত মানুষ মুক্তি অর্জন করতে পারে না । কেবল নিষ্কাম কর্ম করতে সক্ষম হলেই মানুষ মুক্তি অর্জন করতে পারে । অর্থাৎ মানুষ কর্ম করবে কিন্তু সে কর্মের মধ্যে কোন কামনা, বাসনা, ফলাকাঙ্খা, মোহ বা আসক্তি থাকবে না এমন কর্মই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে । এমন কর্মই মানুষকে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্ত করে পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটিয়ে দিতে পারে । অর্থাৎ মুক্তি অর্জনের জন্য মানুষকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হতে হবে । এমন মানুষের দ্বারা সঙ্গী, প্রতিবেশী, সমাজ, রাষ্ট্র কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না । ইসলাম ধর্মও হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ, মোহ, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা প্রভৃতি পরিত্যাগের প্রতি জোর দেয় । মুহাম্মাদ (সঃ) প্রবৃত্তি দমনের চেষ্টা সাধনাকে বড় জিহাদ (আসাদুল জিহাদ) বলে অভিহিত করেছেন । ইসলামের বিশ্বাস হচ্ছে যে—অন্যায়, অত্যাচার, অন্যের অধিকার নষ্ট করা, অন্যকে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি এবং সামান্যতম অন্যায় ও গুণাহের কাজ ব্যক্তির আমল নামায় থাকা পর্যন্ত সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না । তাকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে হবে । জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে জান্নাতের শান্তি প্রাপ্তির জন্য মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলিত, সংযত এবং পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে ফেলে । সুতরাং মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাস মানুষকে ইহজগতে পূর্ণমানবে পরিণত করে । এ পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ মানুষ দ্বারা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত উপকৃত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের যে বিশ্বাস রয়েছে তাকে কীভাবে প্রমাণ করা যায় ? মূলত বস্তুগতভাবে মরণোত্তর জীবনের প্রমাণ দেয়া যায় না । এ কারণে অনেক চিন্তাবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, মনস্তত্ত্ববিদ মরণোত্তর জীবনকে অস্বীকার করেছেন । যন্ত্রবাদী, জড়বাদী এবং প্রকৃতিবাদীদের মতে, জগতের সব কিছু জড় ও গতির সমষ্টি । প্রত্যেক ঘটনা তার পূর্ববর্তী ঘটনার পরিণতি । সুতরাং জগতের পশ্চাতে কোন আধ্যাত্মিক সত্তা বা কোন ব্যক্তিক স্রষ্টার প্রয়োজন নেই । এ জগৎ ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয় । ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যর্থতার ফলে বস্তু অস্তিত্ব হারায় । মানুষও ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সংগঠন । ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়া যখন ব্যর্থ হয় তখন মানুষের মৃত্যু ঘটে । মৃত্যুর পর তার আর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না । অতএব মরণোত্তর জীবন, স্বর্গ-নরক ইত্যাদির কোন অবকাশ নেই । অনেক মনস্তত্ত্ববিদ মনে করেন যে, ঈশ্বর, মরণোত্তর জীবন, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি মানব মনের কল্পনা মাত্র । এদের মতে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেনি, বরং মানুষই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে । মানুষ বিস্ময়, ভয়, অসহায়ত্বের অনুভূতি ইত্যাদি থেকে চির মুক্তির জন্য স্বর্গের কল্পনা করেছে । মরণোত্তর জীবন, ঈশ্বর, স্বর্গ-নরক সবই মানুষের কল্পনা । বাস্তবে এ সবের কোন অস্তিত্ব নেই । প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) তাঁর *Critique of pure Reason* (১৭৮১) গ্রন্থে তত্ত্ববিদ্যা তথা ঈশ্বর, আত্মা, আত্মার অমরত্ব ইত্যাদিকে অসম্ভব বলেছেন । অবশ্য মানসিক প্রবণতা হিসেবে তিনি এ সবের সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করেছেন । তিনি দেখিয়েছেন যে, আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংবেদন পাই । সে সংবেদনের উপর বোধশক্তির আকারসমূহ প্রয়োগ করে জ্ঞান লাভ করি । তত্ত্ববিদ্যা তথা ঈশ্বর, আত্মা, অমরত্ব ইত্যাদি বিষয়ের সংবেদন পাওয়া যায় না এবং বোধশক্তির আকারসমূহকেও প্রয়োগ করা যায় না । সুতরাং তত্ত্ববিদ্যা সম্ভব নয় । কান্ট জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তত্ত্ববিদ্যা তথা ঈশ্বর, আত্মা, আত্মার অমরত্ব ইত্যাদিকে অস্বীকার করেছেন । কিন্তু তাঁর *Practical Reason* (১৭৮৮) গ্রন্থে নৈতিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে তত্ত্ববিদ্যা তথা ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ-নরক ইত্যাদিকে স্বীকার করেছেন । যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা মরণোত্তর জীবন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীকে অর্থহীন বলে অভিহিত করেন । যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা ভাষাতাত্ত্বিক তথা শব্দ ও ধারণার বিশ্লেষণের সাহায্যে আধিবিদ্যক ধারণাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেন । তাঁদের মতে, যে সব শর্ত পালন করলে একটা শব্দ বা ধারণা অর্থপূর্ণ হয় সে সব শর্ত আধিবিদ্যক শব্দ বা ধারণা পালন করতে ব্যর্থ । সুতরাং আধিবিদ্যক ধারণাবলী অর্থহীন । তাঁদের মতে, কোন শব্দ বা ধারণাকে অর্থপূর্ণ হতে হলে তা ব্যবহারিক বা নীতিগতভাবে পরখযোগ্য হতে হবে ।[১২] আধিবিদ্যক উক্তিসমূহ ব্যবহারিকভাবেতো নয়ই, নীতিগতভাবেও পরখযোগ্য নয় । এর উক্তিসমূহ ছদ্ম উক্তি মাত্র । 'সত্তা

Dhaka University Institutional Repository

এক দ্রব্য' বা 'বস্তু দ্রব্য' এ ধরনের উক্তিকে কোন সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এদের কোন বাস্তব আধেয় নেই। কেবল বাস্তব আধেয় নেই বলেই যে আধিবিদ্যক উক্তিগুলো অর্থহীন তা নয়। এ উক্তিগুলো পূর্বতঃসিদ্ধ (apriori) উক্তিও নয়। পূর্বতঃসিদ্ধ উক্তিসমূহ টটলজি মাত্র। টটলজি এবং অভিজ্ঞতামূলক উক্তি অর্থপূর্ণ। আধিবিদ্যক উক্তিসমূহ টটলজি বা অভিজ্ঞতামূলক নয়। তাই আধিবিদ্যক উক্তিসমূহ অর্থহীন।[১৩] যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা অবশ্য আধিবিদ্যক উক্তির আবেগাত্মক তাৎপর্য স্বীকার করেন।

প্রত্যক্ষ করা যায় না বা অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না বলে মরণোত্তর জীবনকে অস্বীকার করা যায় না। পার্থিব জগতে বহু বিষয় আছে যা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কিন্তু তার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি। মাতৃস্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কিন্তু এদের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি। তবে আমরা এ সবের অস্তিত্ব অনুভব ও অনুমান করতে পারি। দু'ধরনের ঘটনার মধ্যে আমরা পার্থক্য করতে পারি। একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষিত ঘটনা আরেকটি হচ্ছে অনুমিত ঘটনা। যে সব ঘটনাকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারি তা হচ্ছে প্রত্যক্ষিত ঘটনা (perceived facts)। আর যে সব ঘটনাকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারি না, কেবল অনুমান করতে পারি সে সব ঘটনা হচ্ছে অনুমিত ঘটনা। মরণোত্তর জীবনের বিষয়াবলী হচ্ছে অনুমিত ঘটনা। অনুমানে জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এবং এটি হচ্ছে একটা মানসিক প্রক্রিয়া। অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে মরণোত্তর জীবন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীকে স্বীকার করা যায়। এখানে পার্থিব জগৎ হচ্ছে জ্ঞাত বিষয় আর মরণোত্তর জীবন হচ্ছে অজ্ঞাত বিষয়। পার্থিব ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে সে ঘটনার পশ্চাতে কোন বুদ্ধিময় সত্তা রয়েছে এ অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। এ জগতে অনেক ঘটনা অনির্ধারিতভাবে ঘটে। অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা বিচার-বুদ্ধির অতীত। যেমন মানুষের জন্ম, মৃত্যু। জন্ম ও মৃত্যুতে মানুষের হাত নেই। মানুষ কোন্ কালে, কোন্ স্থানে জন্মাবে এতে মানুষের কোন করণীয় নেই। মানুষ নিজের জন্মের কাল ও স্থান নির্ধারণ করতে সক্ষম হলে সভ্যতার স্বর্ণ যুগে পার্থিব জগতে নিজের আবির্ভাব ঘটাতো। এবং সমৃদ্ধ স্থানের জন্য নিজেকে নির্বাচন করতো। নির্বাচন করতো শিক্ষিত, সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে। নিজের পরিকল্পনা মাফিক ইহজীবন ত্যাগ করতো। কিন্তু মানুষ এ সব কিছুতেই অপারগ। একটি শিশুর কেন বস্তিতে জন্ম হলো। লস এঞ্জেলসে তার জন্ম হল না কেন ? একটি দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে সে সময়ে একটি শিশুর জন্ম হল কেন? হয়তো একশত বছর আগে জন্ম হলে দুর্ভিক্ষ কোনভাবে তাকে স্পর্শ করতে পারত না। মৃত্যুকে মানুষ প্রতিরোধ করতে পারে না। কোন বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

একটা পিঁপড়ার মৃত্যুও ঠেকাতে পারেনি। মানব জীবনের এতটুকু নিশ্চয়তা নেই। সুস্থ, সবল, নিরোগ, সম্ভাবনাময়, সদাচঞ্চল যুবকটি মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। স্ত্রীর ক্রন্দনরোল, অবুঝ শিশুর আহাজারি, বৃদ্ধা মাতার বুকফাটা বিলাপ তার মৃত্যু ঠেকাতে পারে না। কেন এমন হয়? আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাক। এ রকম ঘটনা অহরহ নজরে এসে থাকে। একটি বালক একটি কবিতা একবার-দুইবার পড়েই মুখস্ত করে ফেলতে পারে। মুখস্থ রাখতেও পারে দীর্ঘদিন। আরেকটি বালক পাঁচবার পড়েও সে কবিতাটি মুখস্থ করতে পারে না। বহু কসরতের পর মুখস্থ করলেও তা অল্পদিনের মধ্যে ভুলে যায়। আবার আরেক বালক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না নিয়েও, অশিক্ষিত পরিবারে জন্ম নিয়েও অনায়াসে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানোত্তীর্ণ বহু কবিতা লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে এবং বিখ্যাত হতে পারে। আবার এমনওতো হয় যে, মা জ্ঞানী, গুণী, সুপণ্ডিত ও মেধায় বিখ্যাত মানুষের মেয়ে, পিতা জ্ঞানী, গুণী, সুপণ্ডিত, ধনবান, মেধা ও সৃজনশীলতায় বিখ্যাত কিন্তু সে নিজে নির্বোধ, মেধা, জ্ঞান ও চাতুর্যের সীমারেখার নিম্নে তার অবস্থান। জিনেটিক তত্ত্ব এখানে ব্যর্থ ,বংশ সঞ্চারবাদ এখানে অপারগ। কিন্তু কেন এমন হয়? এখানে ভাবুক, চিন্তাশীল দার্শনিকেরা এ বিশাল জগৎ ও জগতের নানা ঘটনার পশ্চাতে কোন বুদ্ধিময় সত্তাকে খুঁজে পায়। সে বুদ্ধিময় সত্তার নিকট নিজেকে সমর্পণ করে। অবনত চিত্তে সে সত্তার পূজা-অর্চনা করে জীবনভর। ধর্মকে মেনে নেয় আগ্রহের সাথে। পার্থিব জীবনে ধর্মের বিধি-নিষেধ মেনে মরণোত্তর জীবনকে সার্থক করার প্রয়াস পায়।

ধর্মে ব্যবহৃত ধারণা ও ভাষাকে অর্থহীন বলেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। ধর্মে ব্যবহৃত ভাষার সাদৃশ্যমূলক, প্রতীকধর্মী ও নৈতিক অর্থ রয়েছে। সেন্ট একুইনাস তাঁর 'সাদৃশ্যমূলক বিধেয়করণ' তত্ত্বে ধর্মে ব্যবহৃত ভাষার সাদৃশ্যমূলক অর্থ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে 'শুভ' শব্দটি মানুষের বেলায় যা বুঝায় ঈশ্বরের বেলায় ঠিক তা বোঝায় না। শুভ বা গুড শব্দের ব্যবহার ঈশ্বর ও মানুষের বেলায় উপমা বা সাদৃশ্যমূলক অর্থ বহন করে।[১৪] পল টিলিক (Paul Tillic) এর মতে ধর্মে ব্যবহৃত ভাষার প্রতীকী অর্থ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি প্রতীকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'প্রতীক' ও 'চিহ্নের' মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। 'প্রতীক' এবং 'চিহ্ন' উভয়ই অন্য কিছুকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন-রাস্তায় লাল বাতি জ্বলা হচ্ছে একটি চিহ্ন আর পতাকা হচ্ছে একটি দেশের প্রতীক। চিহ্নের সাথে নির্দেশিত বস্তুর সম্পর্ক বাহ্যিক। আর প্রতীকের সাথে তার নির্দেশিত বস্তুর সম্পর্ক হচ্ছে অভ্যন্তরীণ। রাস্তার লালবাতি গাড়ী চালককে শুধু থেমে যেতে বলে। এই লাল বাতি এবং গাড়ীচালক বা যানবাহনের মধ্যে কোন আদর্শ বা জাতিগত সম্পর্ক নেই। কিন্তু একটি দেশের জাতীয় পতাকা সে

Dhaka University Institutional Repository

জাতির সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার প্রতীক। এমনিভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শ, নীতি ও মূল্যবোধ যা মূলত পরমসত্তার বা ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত — তা প্রতীকী অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ।[১৫]

আজকের একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে একটি প্রবণতা হচ্ছে যে, তারা বিষয়নিষ্ঠতা ও বৈষয়িকতার মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে। মানুষ তার বুদ্ধির আবিষ্কার ও উপলব্ধির দ্বারা এতই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে যে, আধ্যাত্মিকতার আবেদন তার জীবনে নেই বললেই চলে। নিজ অন্তরের সাথে তার আজ যোগ নেই। সে নিজের থেকে যেন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে বৈষয়িকতা ও বাহ্যিকতার ক্রীতদাসে পরিণত হতে চলেছে।[১৬] কিন্তু মানুষকে কেবল বৈষয়িক ও বাহ্যিক হলে চলবে না। তাহলে জীবন হয়ে যাবে একপেশে। তাই তার জীবনে বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় প্রয়োজন। ধর্ম মানুষকে বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে জীবন গঠনের শিক্ষা দেয়। আধুনিকতা ও বৈষয়িকতার পাশাপাশি মানুষকে ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে চলতে হবে। সব ধর্মই কিছু সার্বিক মূল্যবোধ ধারণ করে থাকে। যেমন — বড়কে শ্রদ্ধা করা, বিনয়ী ও সহিষ্ণু হওয়া, ত্যাগ স্বীকার করা, চুরি না করা, সত্য কথা বলা, মিথ্যা কথা পরিহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি। বিষয়নিষ্ঠতার সাথে এ সব মূল্যবোধ রক্ষার মধ্যে মানব জীবনের সার্থকতা নিহিত।

আজ ধর্মের নামে রক্তপাত হচ্ছে। মানুষ নির্বিচারে হত্যা করছে মানুষকে। অথচ সব ধর্মেই মানব হত্যাকে জঘন্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আল কুরআন স্পষ্টভাবেই বলছে ঃ "ফাছাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করে না এমন কাউকে যে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।"[১৭] বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের মধ্যে রয়েছে রেষারেষি, হিংসা-বিদ্বেষ এবং ক্ষেত্র বিশেষে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। অথচ প্রত্যেক ধর্মই মানুষকে ভালবাসতে শেখায়। স্বীয় ধর্ম এবং অন্য ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে ধার্মিকেরা পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতায় নিয়োজিত থাকে। অথচ কোন ধর্মই পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ শেখায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ — হিন্দু ধর্ম মতে, "মানুষের উচিত অন্যের প্রতি সেরকম আচরণ করা যে রকম আচরণ সে অন্যের নিকট থেকে প্রত্যাশা করে।"[১৮] ইসলাম ধর্ম মতে, "একজন মুমিন হবে না যদি না সে ভ্রাতার জন্য সে জিনিস পছন্দ করে যে জিনিস সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[১৯] বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন ধর্মানুসারীদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা দূরীভূত করে তাদের মধ্যে নৈকট্য স্থাপন করতে পারে। তুলনামূলক অধ্যয়নের ফলে এক ধর্মের অনুসারী অন্য ধর্মের অনুসারীকে আপন করে নিতে পারে। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে মরণোত্তর জীবনের অধ্যয়ন এ দু'ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে নৈকট্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করতে সহায়ক হবে। আমরা দেখেছি মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে হিন্দু ও

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী মতে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। কিছু সংখ্যক বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। বৈসাদৃশ্যের বিষয়সমূহ তাদের মধ্যে বিভেদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে না। সাদৃশ্যের বিষয়সমূহ তাদের মধ্যে নৈকট্য স্থাপন করে। মূলত উভয়ের উদ্দেশ্য অভিন্ন। পথ বা উপায়ে ভিন্নতা আছে। দু'জন লোকের মধ্যে একজন টি শার্ট পরে আরেকজন পাঞ্জাবী পরে। টি শার্ট ও পাঞ্জাবী তাদের মধ্যে বিভেদের সম্পর্ক স্থাপন করে না। টি শার্ট ও পাঞ্জাবী ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে একই উদ্দেশ্য সাধন করে। হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মের পথ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উভয় একই উদ্দেশ্য সাধন করে। উভয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে মরণোত্তর জীবনে মানুষ পরম শান্তি লাভ করুক। মানুষ দুঃখ-কষ্ট, বেদনা ও শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করুক। উভয় ধর্ম চায় মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার পবিত্রতা অর্জন করুক। অতএব, মরণোত্তর জীবনের আলোচনা, প্রায়োগিক অনুশীলন ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি উভয় ধর্মানুসারীদের মধ্যে সমঝোতা, সহযোগিতা ও ঐক্য সৃষ্টি করবে।

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১) *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*, ৪।৩।

২) *আল কুরআন*, ১৭।ঃ ৮৫।

৩) *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ৩।৬।১।

৪) *আলকুরআন*, ৪৭ঃ১৫ ; ৫৬ঃ১৫-২৫।

৫) Dasgupta S.N., *A History of Indian Philosophy*, vol.1, Cambridge, 1922, pp. 19-20.

৬) Bhattacharrya, H,.*The Foundations of Living faiths*, Calcutta University, 1938, p. 178.

৭) *আল কুরআন*, ২ঃ১৬৩ ; ৩ঃ১৮; ১৭ঃ১১১; ১১২ঃ১-৪ ইত্যাদি।

৮) ঐ, ২ঃ২৯, ৫ঃ১৭।

৯) প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ঃ ১৯৯৪, পৃঃ ২১৮।

১০) Dev, G.C., *Aspirations of the Common Man*, Dhaka University, 1963, p. 34.

১১) *আল কুরআন*, ১৮ঃ১০৫-১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

১১) Ayer, A.J., *Languege, Truth and Logic*, New York : Dover Publications, Inc., 1953, p.36.

১৩) Ibid, p. 41.

১৪) Hick, John, *Philosophy of Religion*, (2nd ed.), Prentice Hall, New Jersey, 1973, pp. 69-70.

১৫) Ibid, pp. 71-72.

১৬) Iqbal, M., *The Reconstruction of Religious Thought in Islam.* (5th ed.), New Delhi : Kitab Bhavan, 1994, pp. 187-88.

১৭) *আল কুরআন*, ৫:৩২ ।

১৮) Sethi, A.S. & Peinhard Pummer, (ed.), *Comparative Religion*, New Delhi : Vikas publishing house, 1979, p. 194.

১৯) Ibid, p. 195.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১। মৌলিক উৎস

ইসলাম ধর্ম ঃ

কুরআন ঃ

The Glorious Koran, trans., Pickthall, M., London : George Allen & Unwin Ltd., 5th ed.,1969.

The Holy Qur'an, trans. & Commentary, 2 vols., Ali, Abdullah Yusuf, Lahore, 1938.

তফসীর মাআরেফুল কোরআন, মুফতী মুহাম্মদ শাফী, বঙ্গানুবাদ, মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মোনাওয়ারা ঃ খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী ।

হাদীস ঃ

Imam Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, 9 vols., trans., Muhammad Muhsin khan, kitab Bhavan, 1984.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, trans. Abdul Hamid Siddiqi, 4 vols., Lahore, Reprint 1987.

ইমাম বুখারী (আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী), *বুখারী শরীফ*, ১০ খণ্ড, অনুবাদ, সিহাহ সিত্তাহ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ।

হিন্দুধর্ম ঃ

The Bhagvad Gita, trans., Radhakrishnan, S., New Delhi : Blackie & Son Ltd., 6th Indian Reprint 1977.

The Principal Upanisads, trans., Radhakrishnan, S., London : George Allen &

Dhaka University Institutional Repository

Unwin Ltd., 1953.

উপনিষদ, অনুবাদ, অতুলচন্দ্র সেন প্রমুখ, কলকাতা ঃ হরফ প্রকাশনী, অখণ্ড সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৬ ।

বেদ, অনুবাদ, রমেশচন্দ্র দত্ত, ৫ খন্ড, কলকাতা ঃ হরফ প্রকাশনী ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা, অনুবাদ, অতুলচন্দ্র সেন, কলকাতা ঃ হরফ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫ ।

----------, অনুবাদ, শ্রী জগদীস চন্দ্র ঘোষ, ষষ্ঠ বিংশতিতম সংস্করণ কলকাতা ঃ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৯৯৬ ।

২। গৌণ উৎস

Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, New Delhi : S. Chand and co., 1950.

Ali, Syeed Amir, *The spirit of Islam*, London: Methuen & Co. Ltd., 1922.

Arberry, A.J., *Sufism, an account of the mystics of Islam*, London: George Allen & Unwin Ltd., 1950.

Archibald, E. Gough, *The Philosophy of Upanisads*, Delhi: Ess Ess Publications, 1975.

Aurobindo, Sri, *The life Divine*, vol.1, India: Sri Aurobindo Ashram Pondicherry, 1973.

Ayer, A. J., *The Problem of Knowledge*, London: Macmillan & Co Ltd.,1956.

----------., *Language, Truth and Logic*, New York: Dover Publications, Inc.,1952.

Bendit, Laurence J., *The Mirror of Life and Death*, India : The Theosophical Publishing House, 1967.

Benjamin Walker, *Hindu World, an Encyclopedic Survey of Hinduism*, 2 Vols. London: George Allen & Unwin Ltd., 1968.

Bharati, Agehananda, *Hindu Views and ways and the Hindu-Muslim Interface, an Anthropological Assessment*, New Delhi, Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1981.

Bhattacharrya, H., *The Foundations of Living Faiths*, Calcutta University, 1938.

Dhaka University Institutional Repository

Boer, T.J. De, *The History of Philosophy in Islam*, trans. Edward R. Jones, London: Luzac & Co., 1933.

Bowker, John, *Problems of Suffering in Religions of the World*, London : Combridge University Press, Reprint-1977.

Brandon, S. G. F., (ed.), *A Dictionary of comparative Religion*, London : Weidenfeld & Nicolson, 2nd impression, 1971.

Brody, Baruch A., (ed.), *Readings in the Philosophy of Religion, an Analytic Approach*, (2nd ed.), New Jersey : Prentice Hall, 1992.

Bucaille, Maurice, *The Bible, The Quran and Science*, Trans. Pannell, Alastair D. and the author, Delhi : Crescent Publishing Co. 1985.

Chatterji, J. C., *The Hindu Realism*, Allahabad : The Indian Press, 1912.

Chatterji, P., *Studies in Comparative Religion*, Calcutta: das Gupta Co. Pvt Ltd., 1971.

Chatterji, S. C., *The Fundamentals of Hinduism*, (7th ed.), Calcutta University, 1970.

Jurji, Edward J., ed., *The Great Religion of the Modern World*, New Jersey : Princeton University Press, Eighth Printing, 1967.

Clark, Stephen R.L., *The Mysteries of Religion*, Oxford: Basil Basil Blackwell Ltd., 1986.

Das, Baghwan, *The Essential Unity of All Religion*, Banres: The Ananda publishing House, (3rd ed.), 1947.

Dasgupta, S. N., *Indian Idealism*, London : Cambridge University Press, 1933.

----------, *History of Indian Philosophy*, vol. I & II, London : Cambridge University Press, 1952.

----------, *Hindu Mysticism*, Chicago : the Open Court Publishing Co., 1927.

Datta, D. M. & Chatterji, S. C., An *Introduction to Indian Philosophy*,(7th ed.), University of Calcutta, 1968.

Dehlavi, Maulana Ahmad Sa'eed, *What Happens After Death*, (Part I & II), Trans., Mohanmad Hanif Khan, Delhi : Dini Book Depo, 1981.

Dhaka University Institutional Repository

Dev, G. C., *Aspirations of the Common Man*, Dhaka: Dhaka University, 1963.

Dhar, Basir Ahmed, *Quranic Ethics*, Lahore : Institute of Islamic Culture, 1960.

Eliot, Sri Charles, *Hinduism and Buddhism*, Bk II, London, 1891.

Ferré Nels F. S., *Reason in Religion*, London : Thomas Nelson and Sons Ltd., 1963.

George Gollup, Jr., *Adventures in Immotality*, New York : Hill Book Co., 1982.

Ghazali Imam, *Tahafut al Falasifa*, Trans., Kemali, S. A., Lahore : Pakistan Philosophical Congress, 1958.

Hick, J., *Philosophy of Religion*, (2nd ed), New Jersey : Prentice Hall, 1973.

Hai, Saiyed Abdul, *Iqbal the Philosopher*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1980.

Hamidullah, Muhammad, *Introduction to Islam*, Iran : Qum ; Ansarian publication, 1982.

Hashim, Abul, *The Creed of Islam*, (4th ed), Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1985.

Hughes, T.P., *Dictionary of Islam*, New Delhi : Cosmo Publications, 3rd reprint 1982.

Iqbal, M., *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (5th ed), New Delhi : Kitab Bhavan, 1994.

Islam, Azizun Nahar, *The Nature of Self, Suffering and Salvation*, Allahabad : Vohra Publishers, 1987.

Islam, Kazi Nurul, *A Critique of Sankara's Philosophy of Appearance*, Allahabad: Vohra Puplishers, 1988.

Joad, C. E. M., *God and Evil*, London : Faber and Faber Ltd., 1942.

---------- , *Return to Philosophy*, London : Faber and Faber, Reprint – 1948.

Khallaf, Abdel Monem, *Islamic Materialism and Its Dimensions*, Trans. Hussein M. El Gayyar, Cairo : The Supreme Council for Islamic Affairs, 1971.

Khuda, M. Manzoor, *Creation and the Cosmos*, Dhaka : Kakali Prokashony,

Dhaka University Institutional Repository

1995.

Kokileswar Sastri, *An introduction to Advaita Philosophy*, India : Calcutta University, 1924.

Lari, S. Mujtaba Musavi, *Resurrection Judgement and the Hereafter*, trans., Hamid Algar, Iran : Qum ; Foundation of Islamic Cultural Propagation in the World, 1992.

Lemaitre, Solange, H*induism*, trans. John Francis Brown, New York : Hawthorn Books, Inc., 1959.

Macdonald, D.B., *Aspects of Islam*, New York : The Macmillan Co., 1911.

----------, *The Religious Attitude and life in Islam*, New York : AMS Press, Reprint – 1970.

Mohadevan, T.M.P., *Gaudapada*, India : Madras University, 1975.

Matin, A., *An outline of Philosophy*, Dhaka : Mullick Brothers, 1968.

Mia, Abdul Jalil, *Concept of Unity*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1980.

Mudgal, S.G., *Advaita of Saikara a Reappraisal*, Delhi : Motilal Banarsidass, 1975.

Mukherji, A.C., *The Nature of the Self*, Allahabad : the Indian Press Ltd., 1943.

Nadwi, S. Abul Hasan Ali, *Islamic Concept of Prophethood*, Trans. Mohiuddin Ahmad, Lucknow : Academy of Islamic Research and Publications, 1976.

Narahari, H.G., *Atman in Pre-Upanisadic Literature*, Madras : Ganesh and Co., 1944.

Nasr, Seyyed Hossein, *Science and Civilization in Islam*, Cambridge : Massachusetts ; Harvard University Press, 1968.

----------, *Ideals and Realities of Islam*, London: George Allen & Unwin Ltd., 1966.

----------, (ed.), *Islamic Spirituality*, London : Routledge & Kegan Paul, 1987.

Nicholson, R.A., *The Mystics of Islam*, Lebanon : Beirut ; khayats, 1966.

Dhaka University Institutional Repository

----------, *Islamic Mysticism*, New Delhi ; Aryan Books International, 1998.

Patrick, G.T.W., *Introduction to Philosophy*, 3rd impression, london : George Allen & Unwin Ltd., 1968.

Penrice, John, *A Dictionary and Glossary of the Koran*, Delhi ; Adam Publishers, 1991.

Qutb, Muhammad, *Islam the Misunderstood Reliigon*, an English Translation from Arabic Dhaka, Adhunic Prokashani, 1978.

Radhakrishnan, S., and Raju, P.T., *The Concept of Man*, London: George & Allend Unwin Ltd., 1966.

Radhakrishnan, S., *Indian Philosophy*, vol. I & II., London : George Allen & Unwin Ltd., Revised ed. 1929.

----------, *The Hindu View of Life*, London: Unwin Books, 1968.

Ramakrishnananda, Swami, *God and Divine Incernations*, Madras : Sri Ramakrishna Math, 1947.

Russell, B., *Religion and Science*, New York : Oxford University Press, 1961.

----------, *History of Western Philosophy*, London : George Allen & Unwin Ltd., 1946.

Ryle, G., *The Concept of Mind*, London : Huchinson & Co. Ltd., 1949.

Sandeela, F.M., *Islam Christianity and Hinduism*,Delhi : Taj Company, 1994.

Sethi, A S. and Reinhard Pummer, (ed.), *Comparative Religion*, New Delhi : Vikas Publishing house, 1979.

Sharma, Baladev Raj, *The Concept of Atman in the Principal Upanisads*, New Delhi : Dinesh Publications, 1972.

Sinha, J.N., *Unity of Living Faiths, Humanism and World Peace*, Part 1, 1st ed., Calcutta : Sinha Publishing House Pvt. Ltd., 1974.

Smith, Jane Idleman & Haddad, Yvonne Y., *The Islamic Understanding of Death and Resurrection*, New York : Suny ; Albany, 1981.

Dhaka University Institutional Repository

Smith, J.E., (ed.), *Philosophy of Religion*, New York : the Macmillan Company, 1965.

Smith, Margaret, *Al Ghazali the Mystics*, London, 1944.

Smith, W.C., *The Meaning and the End of Religion*, A Mentor Book, the American Library, 1963.

Spencer, Sidney, *Mysticism in World Religion*, London : George allen & Unwin Ltd., 1963.

Stace, W.T., *Mysticism and Philosophy*, New york, J.b. Lippingcott Company, 1960.

Thilly, F., *A History of Philosophy*, (3rd ed.), New York ; Holt, Rinehart and Winston, 1957.

Wagner, August H., (ed.), *What Happens When You Die* ?, London : Abelard Schuman Ltd., 1968.

Wallis, H.W., *The Cosmology of the Rigveda, an Essay*, London : Williams and Norgate, 1887.

Younger Paul, *Introduction to Indian Religious Thought*, London : Darton, 1972.

Zaehner, R.C., *Hindu & Muslim Mysticism*, Oxford : Oneworld Publications, 1994.

আমিনুল ইসলামল, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪ ।

আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম, *রূহের রহস্য*, অনুবাদ, লোকমান আহমদ আমিমী, ঢাকা, ১৯৯৮ ।

ইমাম গাযালী, *সৌভাগ্যের পরশমনি*, ৪ খণ্ড, অনুবাদ, আবদুল খালেক, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩।

----------, *তহাফুতুল ফালাসিফা*, অনুবাদ, আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ।

----------, *দাকায়েকুল আখবার*, অনুবাদ, আবদুল জলিল, ঢাকা ঃ হক লাইব্রেরী, ১৯৯৫ ।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, *দাকায়েকুল ইকায়েক*, অনুবাদ, মোহাম্মাদ আবদুস সোবহান, ঢাকা ঃ আল এতহাক প্রকাশনী, ১৯৯৭ ।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী, *হাকীকতে তওহীদ*, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ ।

কাজী জাহান মিয়া, *আল কুরআন দা চ্যালেঞ্জ*, (মহাকাশ পর্ব ১ এবং ২) ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা ঃ মদীনা

Dhaka University Institutional Repository

পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ ।

খলীফা আবদুল হাকীম, *ইসলামী ভাবধারা* (২য় সংস্করণ), অনুবাদ, সাইয়েদ আবদুল হাই, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ ।

গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা-সার*, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৫ ।

----------, *ভাববাদ ও প্রগতি*, অনুবাদ, হোসনে আরা আলম, ঢাকা বাংলা এডেমী, ১৯৮৮ ।

নিগূঢ়ানন্দ, *মৃত্যু ও পরলোক*, কলকাতা ঃ করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৫ ।

----------, *আত্মার রহস্য সন্ধান*, কলকাতা ঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫ ।

প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয়, লৌকিক*, ৪র্থ খন্ড, কলকাতা ঃ দে'জ পাবিলিশিং , ১৯৯৫ ।

বার্ট্রান্ড রাসেল, *সুখ* অনুবাদ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ঢাকা ঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮১ ।

মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ ।

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, *বঙ্গ দেশীয় হিন্দু মুসলমান*, (২য় সংস্করণ), ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ ।

শ্রী ঋর্ণা ভট্টাচার্য, *অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ*, কলকাতা ঃ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৮২ ।

সাইদুর রহমান, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ২য় সংস্করণ, অনুবাদ ও সম্পাদনা, আমিনুল ইসলাম, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১ ।

স্বামী অভেদানন্দ, *মরণের পরে*, দ্বাদশ সংস্করণ, অনুবাদ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, কলকাতা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৭৫ ।

সাইয়েদ মুজতাবা মুসাভী লারী, *আল্লাহকে কেন মানতে হবে*, অনুবাদ, মুন্সী মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, ঢাকা ঃ ডন পাবলিসার্স, ১৯৯৩ ।

হকিং, স্টিফেন ডব্লু, *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, অনুবাদ, শক্রজিৎ দাশগুপ্ত, কলকাতা ঃ বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৩ ।

হিউম, ডেভিড, *মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা*, অনুবাদ, আবু তাহা হাফিজুর রহমান, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮১ ।